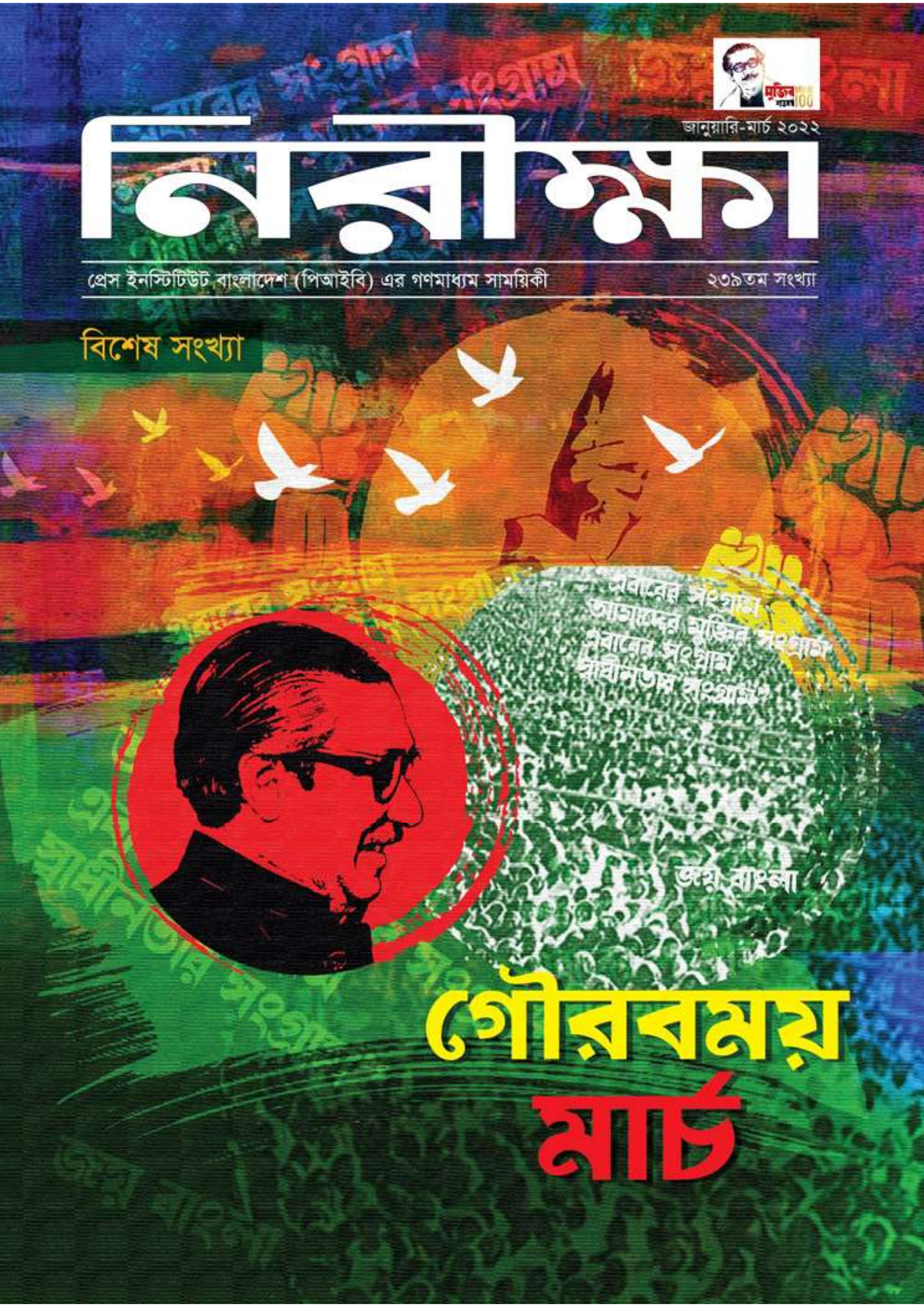

জানুয়ারি-মার্চ ২০২২

নিরীক্ষণ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) এর গণমাধ্যম সাময়িকী

২৩৯তম সংখ্যা

বিশেষ সংখ্যা

গৌরবময় মার্চ

নিরীক্ষা

২৩৯তম সংখ্যা: জানুয়ারি-মার্চ ২০২২ (বিশেষ সংখ্যা)

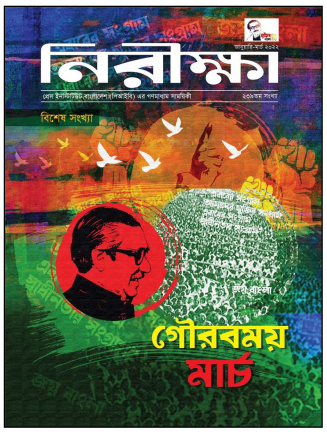

যে কোনো জাতি গর্বিত হয় তার আত্মজ ইতিহাসের জন্য। কারণ আত্মজ ইতিহাসের প্রতিটি অধ্যায় মিশে থাকে সে জাতির অস্তিত্বে। বাঙালির ইতিহাস হাজার বছরের। সেই ইতিহাসের সিঁড়ি বেয়ে ৭, ১৭ ও ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধিকার, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের এক সম্মিলন। এই তিনটি দিবসই বাঙালির আরাধ্য প্রেরণা। বাঙালির জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম, বেড়ে ওঠা পরিবেশ এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের সমন্বয় রয়েছে এই দিবসগুলোকে কেন্দ্র করে।

৭ মার্চ। বাঙালি জাতির ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় দিন। ১৯৭১ সালের এই দিনে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) লাখো জনতার সমাবেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' তাঁর ১৯ মিনিটের ভাষণটি মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনেছিল মানুষ, করেছিল অনুধাবন। বঙ্গবন্ধুর দীর্ঘ সংগ্রামী জীবনের লক্ষ্যই ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা। বিচক্ষণ নেতৃত্বের মাধ্যমে তিনি জাতিকে ক্রমেই এগিয়ে নিয়েছেন সেই পথে। ৭ মার্চের ভাষণে লক্ষ্যে পৌঁছার দিকনির্দেশনাগুলো দূরদর্শিতার সঙ্গে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছিলেন। দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন, 'প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায়, প্রত্যেক ইউনিয়নে, প্রত্যেক সাবডিভিশনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল।...তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাক। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেব; এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাআল্লাহ।' বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ আজ বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ। ইউনেস্কো বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণটিকে বিশ্ব ঐতিহ্যের এক অমূল্য সম্পদ হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। তাদের বিবেচনায় ৭ মার্চের ভাষণ কার্যকর অর্থে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা। এটি ইউনেস্কো স্বীকৃতপ্রাপ্ত ৪২৭টি প্রামাণ্য ঐতিহ্যের মধ্যে অলিখিত ভাষণ। ঐতিহাসিক ৭ মার্চ বাঙালির প্রেরণার উৎস।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ১৭ মার্চ। বাংলা, বাঙালি ও বাংলাদেশের সঙ্গে অভিন্ন সত্তায় পরিণত হওয়া এই মহানায়কের জন্মদিন বাঙালির এক নির্মল আনন্দের দিন। নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এবার পালিত হয়েছে জাতির পিতার ১০২তম জন্মবার্ষিকী। জাতি বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করে তার জাতির পিতাকে। শুধু বাংলাদেশে নয়, পৃথিবীর যেখানেই বাঙালি আছে, সেখানেই নিখাদ ভালোবাসায় উদ্‌যাপন করা হয়েছে এই দিনটি। আমরা আজ বিশ্বে মাথা উঁচু করে কথা বলি। আমাদের পরিচয়-সংকট থেকে রক্ষা করেছেন বঙ্গবন্ধু। পিআইবির পক্ষ থেকে প্রকাশনা বিভাগ এবার বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন নিয়ে 'সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন' শিরোনামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছে। বঙ্গবন্ধু শিশুদের খুবই ভালোবাসতেন। বঙ্গবন্ধুর জীবদ্দশায় তিনি জন্মদিন পালন করেছেন শিশুদের নিয়ে। তাই শিশু সংগঠনগুলোর দাবির মুখে ১৯৯৬ সালে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ১৭ মার্চ জাতীয় শিশু দিবস হিসাবে পালিত হয়ে আসছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষায় বলতে চাই–'আসুন, দেশের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব শিশুদের কল্যাণে আমাদের বর্তমানকে উৎসর্গ করি। সবাই মিলে জাতির পিতার অসাম্প্রদায়িক, ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলি।' বঙ্গবন্ধু আমাদের অস্তিত্বের অংশ। তাঁর আদর্শ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়েই তাঁকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন সম্ভব।

২৬ মার্চ, মহান স্বাধীনতা দিবস। বাঙালি জাতির ইতিহাসে সবচেয়ে গৌরবময় দিন। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে ঘুমন্ত নিরস্ত্র বাঙালির ওপর ট্যাংক, কামান, মেশিনগান নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল পাকিস্তানি হানাদার ও দখলদার সেনাবাহিনী। মুহূর্ত বিলম্ব না করে বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরেই স্বাধীনতার ঘোষণা করেন। সেই রাতেই রাজারবাগ, পিলখানায় থাকা বাঙালি বীর যোদ্ধারা বুকের রক্ত দিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অস্ত্র তুলে নেন বিভিন্ন সেনানিবাসে থাকা বাঙালি সৈনিকরাও। মুক্তির মন্ত্রে উজ্জীবিত জাতি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে ক্রমেই কঠোরতর প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ৯ মাস ধরে চলে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। অবশেষে পরাজয় স্বীকার করে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসররা। জাতির জীবনে এসেছে এবার ৫২তম স্বাধীনতা দিবস। বরাবরের মতো জাতীয় স্মৃতিসৌধে লাখো মানুষের শ্রদ্ধা আর ভালোবাসায় সিক্ত হবে স্বাধীনতাযুদ্ধের বীর শহিদরা। জাতির শুভক্ষণে প্রত্যাশা–সুন্দর ও সমৃদ্ধ হোক আগামী।

এই তিনটি দিবসকে সামনে রেখে গণমাধ্যম সাময়িকী নিরীক্ষা'র এবারের সংখ্যাটি সাজানো হয়েছে। এতে দেশখ্যাত লেখক ও কলামিস্টদের লেখা স্থান পেয়েছে। সংখ্যাটি সংগ্রহে রাখার মতো এবং পাঠক, গবেষক ও শিক্ষার্থীদের পাঠ উপযোগী হবে বলে বিশ্বাস।

সম্পাদক
জাফর ওয়াজেদ

সহকারী সম্পাদক
দুলাল কৃষ্ণ আচার্য

সহ-সম্পাদক
আকিল উজ জামান খান

শিল্প নির্দেশনা
সোহেল আশরাফ খান

প্রকাশনা কর্মকর্তা
সরদার মো. রেজাউল করিম

প্রতিবেদক
নুরুন্নাহার নুরু

সংশোধক
রিয়াজ মো. মনজুরুল হক খান
মো. লুৎফর রহমান

সূ|চি|প|ত্র

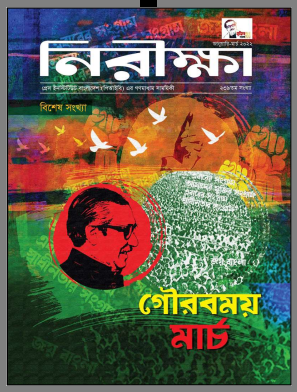

বঙ্গবন্ধুর হৃদয়ে ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা ৩
তোফায়েল আহমেদ

বঙ্গবন্ধুকে জানতে হলে বাহাত্তরের সংবিধান পড়ে দেখতে হবে ৬
— ড. কামাল হোসেন

বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লব স্বনির্ভর বাংলাদেশের মহাসড়ক ১৬
মুহম্মদ শফিকুর রহমান

পাকিস্তানের ক্ষমা চাওয়া আর ক্ষমা পাওয়া ১৯
রেজা সেলিম

নিরস্ত্র হাতে এক সশস্ত্র লড়াইয়ের কথা ২১
মেজর জেনারেল (অব.) সুবিদ আলী ভূঁইয়া

স্বাধীন বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির পটভূমি ২৪
ড. কামরুল হক

স্বাধিকার-স্বাধীনতাসংগ্রামে 'দ্য পিপল' এক অবিস্মরণীয় অধ্যায় ৩৯
শাহ শেখ মজলিশ ফুয়াদ

একাত্তরের ইতিহাস বাঙালির ইতিহাস ৪২
ডা. কামরুল হাসান খান

৪৫ **কেবল ভালোবাসারই পুনর্জন্ম হয়**
ফজলুর রহমান

৪৭ **মুক্তিযুদ্ধে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের স্মারক বধ্যভূমি সংরক্ষণ জরুরি**
রাজন ভট্টাচার্য

৫১ **বঙ্গবন্ধুর জন্যই ত্যাগ এবং মানুষকে ভালোবাসার জন্য**
নিরঞ্জন রায়

৫৫ **বিস্মৃতপ্রায় এক গণহত্যা**
মোহাম্মদ এনায়েত হোসেন

৫৮ **মুক্তিযুদ্ধে নারী**
কামনা আক্তার

৬৩ **আমাদের বিজ্ঞআন কি বলছে মুক্তিযুদ্ধের কথা**
আকিল উজ জামান খান

৬৬ **৭ মার্চের ভাষণ: সংবাদপত্রের বিশ্লেষণ**
জাফর ওয়াজেদ

ই-মেইল : pibnirikkha@gmail.com ■ ওয়েবসাইট : www.pib.gov.bd
পিআইবি'র সকল প্রকাশনা অনলাইনে পেতে হলে : www.rokomari.com
এবং বাতিঘর ঢাকা ও চট্টগ্রাম

মূল্য ৪০ টাকা

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত এবং এসোসিয়েট প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত
ফোন : ৯৩৩৩৪০৩, ৯৩৩০০৮১-৮৪, ফ্যাক্স : ৮৮০-০২-৮৩১৭৪৫৮
ই-মেইল : pibnirikkha@gmail.com • ওয়েবসাইট : www.pib.gov.bd

বঙ্গবন্ধুর হৃদয়ে ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা

তোফায়েল আহমেদ

ছাব্বিশে মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবসের ঐতিহাসিক এই দিনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কথা শ্রদ্ধাবনত মস্তকে স্মরণ করি। তিনি শুধু বাংলাদেশের নন, আন্তর্জাতিক বিশ্বের মহান নেতা ছিলেন। তিনি প্রথমে নিজকে, পরে আওয়ামী লীগকে, তারপরে বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার লক্ষ্যে তৈরি করেছেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তিনি উপলব্ধি করেন এই পাকিস্তান বাঙালিদের জন্য হয়নি। একদিন বাংলার ভাগ্যনিয়ন্তা বাঙালিদেরই হতে হবে। সেই লক্ষ্য সামনে নিয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে ১৩টি মূল্যবান বছর কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে কাটিয়েছেন। মহান ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের একপর্যায়ে স্বাধিকারের দাবিতে ছয়দফা কর্মসূচি প্রণয়ন করলে তাঁর কণ্ঠ চিরতরে স্তব্ধ করে দেওয়ার লক্ষ্যে 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব ও অন্যান্য' অর্থাৎ আগরতলা মামলার আসামি হিসাবে ফাঁসি দেওয়ার চেষ্টা করে স্বৈরশাসক আইয়ুব খান। তখন বাংলার জাগ্রত ছাত্রসমাজ ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেশব্যাপী গণ-আন্দোলন গড়ে তুলে সর্বাত্মক গণ-অভ্যুত্থান সৃষ্টি করে আসাদ-মতিউর-মকবুল-রুস্তম-আলমগীর-সার্জেন্ট জহুরুল হক-ড. সামসুজ্জোহাসহ অসংখ্য শহিদের রক্তের বিনিময়ে ১৯৬৯-এর ২২ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধুকে কারামুক্ত করে ২৩ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ১০ লক্ষাধিক লোকের সামনে কৃতজ্ঞ বাঙালি জাতি কৃতজ্ঞচিত্তে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করে। ১৯৭১-এর ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে দীর্ঘকাল ধরে স্বার্থান্বেষী মহল কুতর্ক জারি রেখেছে। সত্তরের নির্বাচনে যদি বঙ্গবন্ধু অংশগ্রহণ না করতেন বা যদি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেতেন, তাহলে স্বাধীনতা ঘোষণা করার সুযোগ পেতেন না অথবা হয়তো পেতেন তবে অনেক পরে।

বঙ্গবন্ধুকে অনেকেই বলেছিলেন, 'এলএফও'-এর (লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার) অধীনে নির্বাচনে গিয়ে কোনো লাভ হবে না।' তাদের উদ্দেশে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'এলএফও! এই নির্বাচনকে গণভোট হিসাবে আখ্যায়িত করে আমি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করব এবং প্রমাণ করব কে এই দেশের নেতা। আর নির্বাচনের পর আমি এলএফও টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলব।' জেনারেল নিয়াজির জনসংযোগ কর্মকর্তা সিদ্দিক সালিক তার 'উইটনেস টু সারেন্ডার' গ্রন্থে লিখেছেন: 'The Legal Framework Order irked Mujib sorely. He was particularly irritated at Sections 25 and 27 which vested powers of authentication of the future constitution in the President. It implied that Mujib would not be free to implement his six points, even if he obtained majority seats in the National Assembly (Parliament) unless his Constitution Bill received the President's approval. It is on the issue that Mujib said, I shall tear the LFO in the pieces after the election.' (পৃ. ১৬-১৭)। এলএফও-তে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার এবং জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব মেনে নেওয়া হয়। জাতীয় পরিষদে ৩১৩টি আসনের মধ্যে জনসংখ্যার অনুপাতে আমরা পেলাম ১৬৯টি। কিন্তু ইয়াহিয়া খান ভবিষ্যতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েও যাতে বঙ্গবন্ধু ছয়দফা ও ১১ দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে না পারেন, সেজন্য এলএফও-তে বিতর্কিত ২৫ ও ২৭নং দুটি অনুচ্ছেদ সন্নিবেশিত করেন। এলএফও-তে সন্নিবেশিত দুটি ধারাই ছিল আসন্ন নির্বাচনে বিজয়ী দলকে ঠেকানোর অপপ্রয়াস। কিন্তু বঙ্গবন্ধু সত্যিকার অর্থেই নির্বাচনকে গণভোটে রূপান্তরিত করে বিজয়ী হন। নির্বাচনের পরপরই ১৯৭১-এর ৩ জানুয়ারি তিনি আওয়ামী লীগের নবনির্বাচিত ১৬৭ জন এমএনএ ও ২৮৮ জন এমপিএকে নিয়ে শপথ অনুষ্ঠান করে বলেছিলেন, 'এই গণভোটের মাধ্যমে ছয়দফা আজ আমার না, আমার দলেরও না, ছয়দফা আজ জনগণের সম্পত্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। যদি কেউ ছয়দফার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে তবে তাকে জ্যান্ত কবর দেওয়া হবে। এমনকি আমি যদি করি আমাকেও।' এভাবে তিনি ছয়দফাকে আপসহীন অবস্থায় নিয়ে গিয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধু জানতেন ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না এবং তাঁকে বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসাবে চিহ্নিত করবে। সেজন্য বঙ্গবন্ধু নিয়মতান্ত্রিকভাবে এগিয়েছেন। এই নির্বাচনে সারা দেশ সফর করে তিনি বাংলার মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করেন। পয়লা মার্চ যখন ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করেন, মানুষ রাজপথে নেমে আসে। সাতই মার্চ বঙ্গবন্ধু জীবনের শ্রেষ্ঠ ভাষণের মধ্য দিয়ে বাংলার মানুষকে স্বাধীনতার এক মোহনায় দাঁড় করিয়ে নিরস্ত্র বাঙালি জাতিকে সশস্ত্র বাঙালি জাতিতে রূপান্তরিত করেন। নির্বাচনের পরপরই ১৮ ফেব্রুয়ারি ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে ডেকে চার জাতীয় নেতার সামনে আমাদের চারজনকে-মণি ভাই, সিরাজ ভাই, রাজ্জাক ভাই ও আমাকে–একটি ঠিকানা মুখস্থ করিয়েছিলেন। ভারতে গেলে আমরা কোথায় আশ্রয় পাব, থাকব, সেজন্য আমাদের চার টুকরা কাগজ দিয়ে বলেছিলেন, 'মুখস্থ করো'। কাগজে ঠিকানা লেখা ছিল, 'সানি ভিলা, ২১নং রাজেন্দ্র রোড, নর্দার্ন পার্ক, ভবানীপুর, কলকাতা'। মুক্তিযুদ্ধ শুরুর পর এই ঠিকানায় আমরা আশ্রয় গ্রহণ করি। অর্থাৎ বহু আগে থেকেই বঙ্গবন্ধু দেশ স্বাধীনের পরিকল্পনা করেন। সেই ১৯৬২ সালে তিনি দেশ স্বাধীনের পরিকল্পনা নিয়ে আগরতলা গিয়েছিলেন। আগরতলা মামলা তো মিথ্যা ছিল না। কিন্তু পরিকল্পনামতো কাজ হয়নি। আগরতলা মামলায় যারা অভিযুক্ত, তারা তো আসলেই স্বাধীনতার জন্য একটি সশস্ত্র পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। এটা সত্য। যেজন্য 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' বললে যারা অভিযুক্ত, তারা অসন্তুষ্ট হন। তারা বলেন, 'আমরা তো ষড়যন্ত্র করিনি। আমরা তো দেশের স্বাধীনতার জন্যই একটি পরিকল্পনা করেছিলাম।'

বঙ্গবন্ধুর হৃদয়ের মধ্যেই ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা। এর বড়ো প্রমাণ ছয়দফা। তিনি বিচক্ষণ নেতা ছিলেন। ঘূর্ণিঝড়-জলোচ্ছ্বাসের কারণে উপকূলীয় অঞ্চলে নির্বাচন পেছালে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে থাকার সুযোগ পাই। নির্বাচনের দিন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ছিলাম। সেদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, 'আপনি কয়টি আসন পাবেন?' বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'আমি অবাক হব যদি আমি দুটি আসন হারাই।' বিস্ময়ের ব্যাপার দুটি আসনই আমরা হারিয়েছিলাম। একটিতে নুরুল আমিন, অন্যটিতে রাজা ত্রিদিব রায় জয়ী হন। নির্বাচনের পরই তিনি পূর্ণ স্বাধীনতার পরিকল্পনা করেন। এই পরিকল্পনার ছক এঁকেছিলেন যখন তিনি উনসত্তরের অক্টোবরে লন্ডন সফরে যান। সেখানে ভারতীয় প্রতিনিধি ফনীন্দ্র নাথ মুখার্জি, তথা পিএন মুখার্জি–যাকে আমরা মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে 'মিস্টার নাথ' বলে সম্বোধন করতাম–বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে লন্ডনে দেখা করে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ভারত সরকারের ভূমিকা বঙ্গবন্ধুকে অবহিত করেন। যেগুলো পরবর্তী সময়ে বাস্তবায়িত হয়। বঙ্গবন্ধু একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে তবেই স্বাধীনতা ঘোষণা করার রাজনৈতিক বৈধতা অর্জন করেন। সাতই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণেও তিনি বিচক্ষণতার সঙ্গে বক্তব্য পেশ করেছেন। বঙ্গবন্ধু সবসময় চেয়েছেন তিনি আক্রান্ত হবেন; কিন্তু আক্রমণকারী হবেন না। তাই তো ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে যেটা সিদ্দিক সালিক তার বইয়ে লিখেছেন: "When the first shot had been fired, 'the voice of Sheikh Mujibur Rahman came faintly through on a wavelength close to that of the official Pakistan Radio. In what must have been, and sounded like, a pre-recorded message, the Sheikh proclaimed East Pakistan to be the 'People's Republic of Bangladesh.' It said, 'This may be my last message. From today Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh, wherever you are and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved." (প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫)। প্রিয় মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য এরকম একটি চূড়ান্ত ঘোষণায় পৌঁছতে বঙ্গবন্ধুকে দীর্ঘ ২৪টি বছর বাঙালি জাতিকে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচির ভিত্তিতে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে লক্ষ্য স্থির করে, ধাপে ধাপে জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম পরিচালনা করে, জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে, শাসকগোষ্ঠীর সব ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে, জেল-জুলুম-হুলিয়া-ফাঁসির মঞ্চকে উপেক্ষা করে মৃত্যুঞ্জয়ী শক্তি নিয়ে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হয়েছে। একদিনে হয়নি। বহু বছর ধরে, অগণিত মানুষের আত্মদানের মধ্য দিয়ে সমগ্র বাঙালি জাতি প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের স্বাধীনতার ঘোষণাকে শিরোধার্য জ্ঞান করেছে। বঙ্গবন্ধু ঘোষিত এই ঘোষণাটিই একাত্তরের ১০ এপ্রিল মুজিবনগরে প্রতিষ্ঠিত 'বাংলাদেশ গণপরিষদ' কর্তৃক গৃহীত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের ৬নং প্যারায় অনুমোদিত হয়ে সাংবিধানিক বৈধতা অর্জন করেছে। বঙ্গবন্ধুর এই স্বাধীনতার ঘোষণাই ২৬ মার্চ দুপুর দেড়টায় চট্টগ্রাম বেতার থেকে এমএ হান্নানের কণ্ঠে বারবার প্রচারিত হয়েছে। ২৬ মার্চ জিয়াউর রহমানের ঘোষণার কোনো রেকর্ড নেই। এমনকি জিয়াউর রহমানের শাসনামলে 'প্রামাণ্যকরণ কমিটি'র চেয়ারম্যান মফিজউল্লাহ কবীর ও হাসান হাফিজুর রহমানের সম্পাদনায় ১৫ খণ্ডে প্রকাশিত 'বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের দলিলপত্র' সংকলনের ৩নং খণ্ডে আছে, 'জিয়াউর রহমান মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে ২৭ মার্চ ঘোষণা দেন।'

কিন্তু ২৬ তারিখ তো যুদ্ধ শুরু হয়েছে। জেনারেল সফিউল্লাহ, খালেদ মোশাররফ, মেজর রফিক ইতোমধ্যে ডিফেক্ট করে যুদ্ধ শুরু করেছেন। সুতরাং ২৬ মার্চ জিয়াউর রহমানের ঘোষণার কথা মোটেও সত্য না। যারা ২৬ মার্চ জিয়ার ঘোষণার কথা বলে, তারা অসত্য কথা বলে। বাস্তবের সঙ্গে যার কোনো মিল নেই। ইয়াহিয়া খান ২৬ মার্চের ভাষণে রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ করে একজন ব্যক্তির কথা উল্লেখ করে বলেছেন, 'সপ্তাহ খানেক আগেই আমার উচিত ছিল শেখ মুজিবুর রহমান ও তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা....কেননা কয়েকটি শর্ত দিয়ে সে আমাকে ট্র্যাপে ফেলতে চেয়েছিল। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে সে আক্রমণ করেছে–এই অপরাধ বিনা শাস্তিতে যেতে দেওয়া হবে না।' এবং এই একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধেই রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ এনে সামরিক আদালতে বিচার হয়। সামরিক শাসক কতটা প্রতিহিংসাপরায়ণ ছিল যে, আমার মতো একজন ক্ষুদ্রকর্মীকেও আমার অনুপস্থিতিতে সামরিক আদালতে বিচার করল। ১৯৭১-এর ২০ এপ্রিল সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, আবদুল মান্নান, আবিদুর রহমান ও আমাকে মার্শাল ল' কোর্টে হাজির হওয়ার নির্দেশ জারি করা হয়। পরে ২৭ এপ্রিল আমাদের অনুপস্থিতিতে ১৪ বছর সশ্রম কারাদণ্ড, অর্ধেক সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। আজকাল বিভিন্নজন বিভিন্নরকম দাবি করেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ ছাড়া আমরা ছাত্রলীগের কেউ কিছু করতে পারিনি। বঙ্গবন্ধু জাতীয় নেতা হিসাবে যা করতে পারতেন না, আওয়ামী লীগের অগ্রগামী সংগঠন হিসাবে ছাত্রলীগ বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে তা পালন করত। কোনোটাই বঙ্গবন্ধুর অনুমোদন ছাড়া হয়নি।

বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার জন্য আওয়ামী লীগকে প্রস্তুত করেন। একাত্তরের শহিদ দিবস ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এদিন মধ্য রাতে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'এই বাংলার স্বাধিকার–বাংলার ন্যায্য দাবিকে বানচাল করার ষড়যন্ত্র চলছে। এখনো চলছে, ভবিষ্যতেও চলবে। কিন্তু বাংলার সাত কোটি মানুষ আর বঞ্চিত হতে রাজি নয়। আমরা আমাদের অধিকার আদায়ের জন্য প্রয়োজন হলে আরও রক্ত দেব। আর শহিদ নয়, এবার গাজি হয়ে ঘরে ফিরব। বাংলার ঘরে ঘরে আজ দুর্গ গড়ে তুলতে হবে। ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে হবে আমাদের সংগ্রাম। মানুষ জন্ম নেয় মৃত্যুর জন্য; আমি আপনাদের কাছে বলছি এই বাংলার মানুষ রক্ত দিয়ে আমাকে আগরতলা মামলা থেকে মুক্ত করে এনেছে, আমিও আপনাদের জন্য নিজের রক্ত দিতে দ্বিধা করব না। বাংলার সম্পদ আর লুট হতে দিব না।' ২২ ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান তার মন্ত্রিসভা বাতিল করেন এবং পিন্ডিতে গভর্নর ও সামরিক প্রশাসকদের নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন। ওই বৈঠকে লারকানা ও রাওয়ালপিন্ডি বৈঠকে গৃহীত গণহত্যার নীলনকশা 'অপারেশন সার্চলাইট' বাস্তবায়নের ব্যবস্থাদি চূড়ান্ত করা হয়। এসবের পরিপ্রেক্ষিতে ২৪ ফেব্রুয়ারি এক জনাকীর্ণ সংবাদ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু বলেন, '...গত সপ্তাহে জাতি যে ধরনের নাট্যাভিনয় প্রত্যক্ষ করেছে, তা বন্ধ হওয়া দরকার। জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ও তাদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর বানচালের উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করা হচ্ছে।...পাকিস্তানে যখনই জনসাধারণ গণতান্ত্রিক পন্থায় ক্ষমতা গ্রহণে উদ্যত হয়েছে, তখনই এই তামস শক্তি সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই গণবিরোধী শক্তি ১৯৫৪ সনে পূর্ববাংলার নির্বাচিত শক্তিকে ক্ষমতাচ্যুত করে, ১৯৬৬ সনের আইন পরিষদ ভেঙে দেয়, ১৯৫৮ সনে দেশে সামরিক আইন জারি করে এবং তারপর প্রতিটি গণ-আন্দোলন ব্যর্থ করার জন্য হস্তক্ষেপ করে। এই ষড়যন্ত্রকারী শক্তি যে আবার আঘাত হানার জন্য তৈরি হচ্ছে, জাতীয় পরিষদের তারিখ ঘোষণার পর যেসব ঘটনা ঘটছে, সেগুলো থেকেই এটা প্রতীয়মান হয়। জনাব জেড এ ভুট্টো ও পিপলস পার্টি আকস্মিকভাবে এমন সব ভঙ্গিমা ও উক্তি করতে শুরু করেছে, যা জাতীয় পরিষদের স্বাভাবিক কাজে বাধা সৃষ্টি করে শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতি বানচালের প্রবণতাই উদ্‌ঘাটন করে। এভাবে জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর বানচালেরও চেষ্টা করা হচ্ছে।...বাংলাদেশের জাগ্রত জনতাকে, কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র ও জনগণকে বিজয় বানচালের ষড়যন্ত্র প্রতিরোধ করার জন্য প্রস্তুত হতে হবে।...আমরা যে ক্ষমতাকে স্বীকার করি, তা হচ্ছে জনগণের ক্ষমতা। জনগণ সকল স্বৈরাচারীকেই নতি স্বীকারে বাধ্য করেছে। কারণ স্বৈরাচারীর ক্ষমতার দম্ভ জাগ্রত জনগণের সংকল্পবদ্ধ আঘাতের কাছে টিকে থাকতে পারেনি।...আমরা আজ প্রয়োজন হলে আমাদের জীবন বিসর্জন করারও প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি-যাতে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের একটি কলোনিতে বাস করতে না হয়। যাতে তারা একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে সম্মানের সাথে মুক্ত জীবনযাপন করতে পারে, সে প্রচেষ্টাই আমরা চালাব।' এই দীর্ঘ ও তাৎপর্যপূর্ণ বিবৃতিতে বঙ্গবন্ধু ভবিষ্যৎ বংশধরদের যাতে একটি কলোনিতে তথা উপনিবেশে বসবাস করতে না হয়, এর অংশ হিসাবে 'স্বাধীন দেশের' কথা বলছেন।

একাত্তরের ১ মার্চ দুপুর ১টা ৫ মিনিটে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বেতার ভাষণে ৩ মার্চ ঢাকায় আহূত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। পূর্ব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা বক্তব্যে ক্ষোভ-বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠে ঢাকা নগরী। এদিন হোটেল পূর্বাণীতে আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির সভায় ছয়দফাভিত্তিক শাসনতন্ত্রের খসড়া প্রণয়নের কাজ চলছিল। অধিবেশন স্থগিত ঘোষণায় বিক্ষুব্ধ মানুষ হোটেল পূর্বাণীর সামনে এসে সমবেত হয় এবং স্লোগানে স্লোগানে চারদিক প্রকম্পিত করে তোলে। বঙ্গবন্ধু হোটেলের সামনে এসে সবাইকে শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, 'অধিবেশন বন্ধ করার ঘোষণায় সারা দেশের জনগণ ক্ষুব্ধ। আমি মর্মাহত। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া তার ওয়াদা ভঙ্গ করেছেন। আমি সংগ্রাম করে এ পর্যন্ত এসেছি। সংগ্রাম করেই মুক্তি আনব। আপনারা ঐক্যবদ্ধ থাকুন।' এরপর আসে বাঙালির ইতিহাসের পরম কাঙ্ক্ষিত দিন সাতই মার্চ। সেদিন ছিল রোববার। সংগ্রামী বাংলা সেদিন অগ্নিগর্ভ, দুর্বিনীত। বঙ্গবন্ধু যখন 'ভাইয়েরা আমার' বলে বক্তৃতা শুরু করেন, জনসমুদ্র পিনপতন নিস্তব্ধতার মধ্যে ডুবে যায়। সেদিন নেতার বক্তৃতার শেষাংশ 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' বস্তুত এটাই ছিল বীর বাঙালির জন্য স্বাধীনতার ঘোষণা।

আজ সেই ঐতিহাসিক ভাষণ জাতিসংঘের ইউনেস্কো ঘোষিত 'বিশ্ব ঐতিহ্যের প্রামাণ্য দলিল' হিসাবে বিশ্বসভায় স্বীকৃত। দেশকে স্বাধীন করে জাতির পিতা তাঁর জীবনের প্রথম লক্ষ্য পূরণ করেছেন। কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় লক্ষ্য বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন, যা তিনি সমাপ্ত করে যেতে পারেননি। সেই লক্ষ্য পূরণে বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ আন্তর্জাতিক বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত হয়েছে। যে বাংলাদেশকে একদিন হেনরি কিসিঞ্জারসহ পৃথিবীর অনেকেই হাস্যাস্পদ মন্তব্য করে বলেছিল, 'বাংলাদেশ হবে তলাবিহীন ঝুড়ি, বাংলাদেশ হবে দরিদ্র দেশের মডেল।' আজ তাদের বক্তব্য ভুল প্রমাণিত হয়েছে। বাংলাদেশ পঁচাত্তরে ছিল স্বল্পোন্নত আর আজ আমরা উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হয়েছি। আমি সর্বান্তঃকরণে কামনা করি, জাতির পিতার আরাধ্য স্বপ্নের বাংলাদেশকে ক্ষুধামুক্ত-দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলায় রূপান্তরিত করতে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সমগ্র জাতি ঐক্যবদ্ধভাবে স্বপ্নপূরণের পথে এগিয়ে যাওয়ার মহতী যাত্রা অব্যাহত রাখবে।

লেখক: আওয়ামী লীগ নেতা; সংসদ সদস্য;
সভাপতি, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি

সাক্ষাৎকার

বঙ্গবন্ধুকে জানতে হলে বাহাত্তরের সংবিধান পড়ে দেখতে হবে

——— ড. কামাল হোসেন

ড. কামাল হোসেন দেশের খ্যাতনামা আইনজীবী, আন্তর্জাতিক সালিশ নিষ্পত্তিকারকদের অন্যতম একজন। প্রবীণ রাজনীতিবিদ। রাজনৈতিক জীবনের সূচনা বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাত ধরে। বঙ্গবন্ধুর স্নেহধন্য এই রাজনীতিক বঙ্গবন্ধু সরকারের আইন ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসাবে বিজয়ী হয়েছিলেন। ১৯৭২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান রচনা কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভার আইনমন্ত্রী হন। ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দ বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৩ সালের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসাবে ঢাকার একটি আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। বর্তমানে রাজনৈতিক দল গণফোরামের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। বঙ্গবন্ধুকে কাছ থেকে দেখা, নানা স্মৃতি ও দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রাম নিয়ে সম্প্রতি কথা বলেন **বনশ্রী ডলি**র সঙ্গে। আলোচনায় উঠে আসে বাংলাদেশের স্বাধিকার, স্বাধীনতা আন্দোলনের নানা প্রেক্ষাপটও। নিরীক্ষা'র পাঠকদের জন্য তা তুলে ধরা হলো:

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আপনার পরিচয়?

ড. কামাল হোসেন: বঙ্গবন্ধুকে প্রথম দেখেছি ১৯৫৯ সালে, ইত্তেফাক পত্রিকার মালিক-সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার বাসায়। সেই বাসায় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে দেখা করতে যেতেন বঙ্গবন্ধু। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর বন্ধু ছিলেন বাবা। বাবা প্রায়ই

সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে নিতে যেতেন, বাবার সঙ্গে আমিও সেই বাসায় যেতাম বা গিয়েছি। অনেকবার তাদের আলোচনাও শুনেছি। তখন দেখেছি তরুণ শেখ মুজিব আসতেন এবং সোহরাওয়ার্দী সাহেবের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতেন, সব খবরাখবর দিতেন। তখনকার রাজনীতি এবং ভবিষ্যৎ রাজনীতি নিয়ে তাদের মধ্যে আলোচনা হতো। সেই বাড়িতেই মুজিব ভাইয়ের সঙ্গে আমার পরিচয়। তাঁকে মুজিব ভাই বলতাম। পরিচিত হয়ে খুব ভালো লেগেছিল, কারণ লন্ডনে থাকার সময় মুজিব ভাইয়ের কথা অনেক শুনেছি। এই তরুণ নেতা কীভাবে ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে বিজয় অর্জনে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন। যুক্তফ্রন্টের জয়ের মাধ্যমে মুসলিম লীগকে চিরদিনের জন্য বিদায় করতে পেরেছেন। তখন আতাউর রহমান, সালাম খানসহ সিনিয়র আরও বড়ো বড়ো নেতা ছিলেন; কিন্তু কৃতিত্ব দেওয়া হলো শেখ মুজিবকে।

এই নির্বাচনের রেজাল্টে পাকিস্তানিরা অবাক হয়েছে, বাঙালিরাও ভাবতে পারেনি মুসলিম লীগের এমন ভরাডুবি হবে। সবাই বুঝতে পেরেছিল বয়সে তরুণ হলেও শেখ মুজিবের সাংগঠনিক শক্তি ও তৎপরতার জন্যই জয়লাভ সম্ভব হয়েছে। এভাবেই সেই সময়ের রাজনীতিতে শেখ মুজিবের নেতৃত্ব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। আমি তখন আওয়ামী লীগের সক্রিয় কর্মী না হলেও রাজনৈতিক ঘটনাগুলোর কাছাকাছি ছিলাম। আমাদের চেনাজানাটা এভাবে বাড়ছিল।

১৯৭২-এর ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে স্বাধীন দেশে এলেন। কীভাবে কোথা থেকে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গী হলেন?

ড. কামাল হোসেন: ১৯৭১-এর ৩ এপ্রিল আমাকে ঢাকা থেকে ধরে নিয়ে যায় পাকিস্তান আর্মিরা। এরপর রাওয়ালপিন্ডি হয়ে এবোটাবাদের সীমান্ত প্রদেশে হরিপুর জেলে আমাকে অন্তরিন করে রেখেছিল। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন পাকিস্তানের জেলেই ছিলাম। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর একাত্তরের ২৪ ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আমার দেখা হয়। তখন পাকিস্তানে শিয়ালা এলাকায় একটা বাড়িতে বঙ্গবন্ধুকে রাখা হয়েছিল। আমাকেও সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়। এটা আমার জন্য ছিল বড়ো সারপ্রাইজ। তাও সম্ভব হয়েছে বঙ্গবন্ধুর জন্যই। কী করে হলো!

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগে জুলাই-আগস্টে পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুকে আইনজীবী নেওয়ার কথা বলার পর বঙ্গবন্ধু তাঁর আইনজীবী হিসাবে আমাকে চাইলেন। নাম শুনেই ওরা বলল, ড. কামালকে দেওয়া সম্ভব নয়; কিন্তু ভালো ল' ইয়ার ইলাহিকে দিচ্ছি। এরপর একদিন আলোচনার একপর্যায়ে ইলাহির জুনিয়রকে বলতে শোনেন যে, এখানের কাজ শেষে তাকে ড. কামাল হোসেনের মামলার কাজে যেতে হবে। আইনজীবীর সেকথা শুনে বঙ্গবন্ধু বুঝতে পারেন ড. কামালকেও মানে আমাকেও ওরা বন্দি করেছে।

বঙ্গবন্ধুর ফাঁসির আদেশ হয়, তখন কবর খুঁড়েও পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুকে ফাঁসি দিতে পারেনি–এটা সবার জানা ইতিহাস। দেখা হওয়ার পর অনেক কথাই হয়েছে আমাদের। সেসময় বঙ্গবন্ধুর কাছে শুনেছি, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর সেই সময়ের পাকিস্তান রাষ্ট্রপতি জেনারেল ভুট্টো একদিন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যান। বলেন, আমি তো পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হয়েছি। বঙ্গবন্ধু হেসে বললেন, 'তুমি কী করে প্রেসিডেন্ট হও? সত্তরের নির্বাচনে তো আমি সবচেয়ে বেশি সিট পেয়েছি।' এ কথা শুনে ভুট্টো খুব লজ্জা পেয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু তাকে বললেন, 'এসব কথা রাখো, এখন আমাকে বাংলাদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করো।' আলোচনার একপর্যায়ে ভুট্টোর কাছে আমার কথা জানতে চাইলেন এবং আমাকে তাঁর কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে বলেন ভুট্টোকে। আমাকে বঙ্গবন্ধুর কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন বলে আশ্বস্ত করেন ভুট্টো। এরপরই আমাকে একদিন বলা হলো ব্যাগপত্র গুছিয়ে নিতে। কোথায় যাব, কিছুই বলেনি। জেল থেকে বের করে নিয়ে গাড়িতে উঠিয়ে নেয়। মরুভূমির পথে গাড়ি ছুটছে তো ছুটছেই। যাচ্ছি তো যাচ্ছিই, রাস্তাঘাট নির্জন। রাওয়ালপিন্ডি পার হয়ে আবারও হাইওয়েতে। কিছুটা ভয়ও করছে, মেরে ফেলবে নাকি! কোথায় কেন নিচ্ছে জানতে চাইলে বলছে, যেখানে যাচ্ছ 'ইউ উইল

লাইক ইট'। কয়েক ঘণ্টা পর কাঁচা রাস্তার সরু পথ ধরে একটা বাড়ির আঙিনার সামনে গাড়ি থেমে যায়। তখনও বলে না ওই একতলা বাড়িটি আসলে কী, সেখানে কে বা কারা আছে। দুই পাশে মেশিনগান নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর্মির লোকজন। আমাকে নামিয়ে দিয়ে গাড়িটি চলে গেল। বাড়িটিতে কয়েকটা একই রকম ঘর রয়েছে। বোর্ডিং হাউসের মতো একটা হোস্টেল টাইপের বাড়ি। ওরা আমায় বলে, তুমি এক নম্বর ঘরে যেতে পার। কিছুটা অনিশ্চয়তা আর ভয় নিয়ে ঘরে ঢুকে দেখি বঙ্গবন্ধু দাঁড়িয়ে আছেন। একটা অসাধারণ আনন্দের মুহূর্ত!

জেল থেকে মুক্ত হওয়ার দুই ঘণ্টা পরই বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা! অথচ আমাকে কোনো আভাসই দেয়নি যে বঙ্গবন্ধুর কাছে নিয়ে যাচ্ছে। ওইদিন থেকে দুজন পাশাপাশি দুই ঘরে থেকেছি বেশ কয়েকদিন। পাকিস্তান থেকে আসার আগে পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুকে প্রথমে ইরাক নিয়ে যাওয়ার কথা বললে বঙ্গবন্ধু তাতে রাজি হননি। যে দেশ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের নয় এবং বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি, সেসব দেশে যাওয়া সম্ভব নয় বলে জানিয়ে দিলেন। তাই প্রথমে লন্ডনে, পরে ভারত হয়ে বাংলাদেশে ফিরেছি।

রাজনীতি করার মূল নীতিগুলো সম্পর্কে কিছু কিছু ব্যাখ্যা করতেন। জনগণের সমর্থন, জনপ্রতিনিধিত্ব করা, অন্য কোনোভাবে প্রভাবান্বিত না হওয়া যেমন: টাকাপয়সা ও অস্ত্র দিয়ে শাসনক্ষমতা দখল এবং প্রভাব খাটানো, সেসব থেকে দূরে থাকা

২৪ ডিসেম্বর থেকে ৮ জানুয়ারি একই বাড়িতে ছিলেন? কেমন দেখেছেন বঙ্গবন্ধুকে তখন?

ড. কামাল হোসেন: না, দেখা হওয়ার আগ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুও জানতেন না। প্রথম দেখা হওয়ার সেই মুহূর্তটি অবিশ্বাস্য, অপূর্ব। এরপর থেকে এক বাড়িতে শিয়ালায় পাশাপাশি রুমে থেকেছি। একই টেবিলে খেতাম। কখন ফিরবেন দেশে, এ নিয়ে ছিল চিন্তা। তখন ওনাকে রেডিয়ো দেওয়া হয়েছে, পত্রিকাও আসত। আমাকে বললেন, তুমি রেডিয়ো শোনো আর আমাকে খবর দিতে থাক। এতদিন পর আমি রেডিয়ো শোনার সুযোগ পেয়েছি, পত্রিকা পড়তে পারছি। এটা আমার কাছে অনেক কিছু ছিল। আমি খবরের পেছনে লেগে থাকতাম। আমার এখনো মনে আছে, তাজউদ্দীন সম্পর্কে ওনার মন্তব্যটি: 'দেখ কামাল, তাজউদ্দীনকে দায়িত্ব দিয়ে আমি কি সঠিক কাজ করেছিলাম না? ও তো পেরেছে!' আরও বললেন, 'পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি করার সময় অনেকেই বিষয়টি সমর্থন করেনি, পছন্দ করেনি। অনেকেই বলেছে তাজউদ্দীন তো সিনিয়র না।' অথচ সে-ই তো পেরেছে।

এছাড়া বঙ্গবন্ধু তাঁর স্মৃতি কথাগুলো বলতেন। তাঁর নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কথা বলতেন। কীভাবে তিনি সোহরাওয়ার্দীর অনুগত হলেন। কেমন করে নেতার সাহস তাকে অনুপ্রাণিত করেছে। কেন সোহরাওয়ার্দীকে তিনি সমর্থন দিয়ে এসেছেন সারা জীবন। রাজনীতি করার মূল নীতিগুলো সম্পর্কে কিছু কিছু ব্যাখ্যা করতেন। জনগণের সমর্থন, জনপ্রতিনিধিত্ব করা, অন্য কোনোভাবে প্রভাবান্বিত না হওয়া যেমন: টাকাপয়সা ও অস্ত্র দিয়ে শাসনক্ষমতা দখল এবং প্রভাব খাটানো, সেসব থেকে দূরে থাকা। জনগণের প্রতিনিধি হলে জনগণের স্বার্থে কাজ করতে হবে। আপসহীনভাবে জনগণের স্বার্থরক্ষা করতে হবে, এটা তিনি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন। যেন ক্ষমতার প্রভাব কোনোভাবেই চলে না আসে কোনো কাজে। যেমন ব্যবসায়ীর অর্থের প্রভাব, অস্ত্রের প্রভাব এবং বড়ো বড়ো বিদেশি রাষ্ট্রের প্রভাব পড়ে।

জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে পৃথিবীর কোনো শক্তিই তাঁকে প্রভাবিত করতে পারেনি, তা তিনি যেমন বলতেন, এর প্রমাণ তিনি দিয়ে গেছেন আজীবন প্রতিটি কাজে। বিশেষ করে যারা বলত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ভারতের কথা শুনে কাজ করেন; কিন্তু বঙ্গবন্ধু কখনোই তা করেননি, ভারতও কখনো এমনটা মনে করেনি। এর প্রমাণ দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভারতের সেনাবাহিনীকে ফেরত নেওয়ার কথা তিনি অকপটে বলতে পেরেছেন এবং ভারত তা মেনেও নেয় এবং দ্রুতই তাদের বাহিনীকে দেশে ফেরত নিয়ে যায়।

পাকিস্তানের শিয়ালায় একসঙ্গে থাকা, বঙ্গবন্ধুর আলোচনা, স্মৃতিকথা শোনার মধ্য দিয়ে আপনার একধরনের রাজনৈতিক পাঠ হয়েছে বলে মনে করেন?

ড. কামাল হোসেন: তা তো বটেই। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ। ওখানেই তিনি আমাকে আওয়ামী লীগের পার্টিতে জয়েন করতে বললেন। দলে জয়েন করতে হবে কেন, আপনার কর্মী হয়ে কাজ করব। তিনি বললেন, না, সংবিধান প্রণয়ন করতে হলে সদস্য হতে হবে। ১০ জানুয়ারি ফিরে এসে পার্টির সদস্য হলাম। এর কিছুদিন পর লন্ডনে গেলাম দিনকয়েকের জন্য। সেখানে শুনলাম বঙ্গবন্ধু আমাকে খুঁজছেন। পরদিনই ফিরে আসি। আসার পর তিনি বললেন, কোথায় হারিয়ে গেলে তুমি, তোমাকে খুঁজছি। বললাম, কোথাও হারাইনি, কয়েকদিনের জন্য লন্ডনে গিয়েছিলাম। হাসতে হাসতে বললেন, তোমার জন্য ইলেকশনের ফরমে আমি সই করতে তো পারি? তোমাকে ইলেকশন করতে হবে। মনোনয়ন দিলাম, যাও মিরপুর, মোহাম্মদপুর ও ধানমন্ডিতে নির্বাচন করো।' আপনি বললে তো

করতেই হবে তবে আমার তো টাকা নেই, কেমন করে ইলেকশন করব! একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের আগে আমার ব্যাংকে সেভিংসে ছিল ৪০ হাজার টাকা, তা-ও শেষ হয়ে আসছে। তখন তিনি প্রায় ২০ হাজার টাকা হাতে দিয়ে বললেন, এই দিয়ে ইলেকশন করো। সাত থেকে দশ হাজার টাকা খরচ করে বাকিটা ফেরত দিয়েছিলাম মনে আছে। চিন্তা করা যায় কী সমাজ ছিল, বাকি টাকা ফেরত দিতে পেরেছিলাম! স্বাধীনতার পর তাঁর জনপ্রিয়তা ও জনস্রোত এমন ছিল–খুব সহজেই আমরা ১৯৭৩-এর নির্বাচনে জয় পেয়ে গেলাম। মজার ব্যাপার হলো, নির্বাচিত হওয়ার পর বললেন, তুমি কি পোর্টফোলিও চাও, কোন মন্ত্রী হতে চাও। অবাক হয়ে বললাম, কোনো মন্ত্রী হতে চাই না।

আইনমন্ত্রী করেছেন, এই জীবনে আমার তো আর কিছু চাওয়ার নেই, আর কী পাওয়ার থাকতে পারে। আমি না বলার পরও আমাকে আইনমন্ত্রী করলেন। হেসে চলে গেলেন। আমি তো অবাক! ওইদিনই সন্ধ্যায় হঠাৎ ফোন পেলাম, আমি তাজউদ্দীন আহমদ বলছি, কংগ্রাচ্যুলেশন্স ফরেন মিনিস্টার কামাল,' কী বলছেন!, হ্যাঁ, তোমাকে আমরা ফরেন মিনিস্টার হিসাবে নিয়োগ দিয়েছি। শুনে বিস্মিত হয়েছিলাম সেদিন!

স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান রচনার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে জানতে চাচ্ছি?

ড. কামাল হোসেন: বাহাত্তরের সংবিধানের আলোচনা ১৯৬৯ সালে, সত্তরের নির্বাচনের আগেই শুরু হয়েছে। ১৯৭০-এর নির্বাচনের আগে বঙ্গবন্ধু বলতেন, ১৯৫৬ সালে পাকিস্তান সরকারের সংবিধান বাঙালির জন্য একেবারেই অচল ও অগ্রহণযোগ্য। এতে সংশোধনী আনতে হবে।

আলোচনাটা ছিল এমন যে, পাকিস্তান প্রণীত সংবিধানের আগাগোড়া বদলাতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারকে দেওয়া সব ক্ষমতার গুণগত পরিবর্তন করা দরকার। নতুন সংবিধানে কেন্দ্রের হাতে সীমিত ক্ষমতা থাকবে। কেবল আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক যাতায়াতব্যবস্থার ক্ষমতা কেন্দ্রে থাকবে। বাকি সব ক্ষমতা থাকবে পূর্ববাংলার আইন পরিষদের হাতে। একাত্তরের আগের আলোচনাটা এমনই ছিল; বাংলাদেশের সংবিধান রচনার মূল কাজটি তখন থেকেই সেভাবেই করে এসেছি। ১৯৭১-এ বিরাট অগ্রগতি হলো। বাঙালিরা স্বায়ত্তশাসনের পরিবর্তে অর্জন করল স্বাধীনতা, স্বাধীন দেশ এবং পেল রাষ্ট্র। এক্ষেত্রে বলি, বঙ্গবন্ধু স্বায়ত্তশাসন চাওয়ার আড়ালে মূলত স্বাধীনতার কথাই বলেছেন। তখন অনেকে বিশেষ করে তরুণরা বলত, আপনারা তো স্বাধীনতার কথা বলেন না। বঙ্গবন্ধু তখন বুঝিয়েছেন, কৌশলগত কারণে স্বায়ত্তশাসনের কথা বলা হচ্ছে। কারণ স্বাধীনতার কথা বললে পশ্চিম পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় সরকার বিচ্ছিন্নতাবাদী বলবে, গুলি করবে, রাষ্ট্রবিরোধী চিহ্নিত করবে। তাই আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের কথা বলা হচ্ছে। যেখানে মূল ক্ষমতা গণপরিষদ, আইন পরিষদের কাছে থাকতে পারে আর সীমিত ক্ষমতা থাকবে কেন্দ্রের কাছে। এভাবে বাঙালিরা যখন একটা ভালো পর্যায়ে যাবে, তখন ওরা এমনিই বুঝে যাবে পূর্ববাংলায় তাদের শোষণ আর চলবে না। শোষণ করতে না পারলে পশ্চিমারা আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার আগ্রহ কেন দেখাবে। তখন স্বাভাবিকভাবেই পশ্চিমাদের শাসন-শোষণের দিন শেষ হবে।' বঙ্গবন্ধুর কথা বুঝেছিলাম এবং অন্যদের বোঝাতে চেষ্টা করেছি।

সংবিধানের গুণগত পরিবর্তনের কথা বঙ্গবন্ধু বলতেন, কারণ পশ্চিম পাকিস্তানিরা পূর্ব পকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার কথা বললেও মূলত সব শুষে নিত। এই অঞ্চলের সারপ্লাস রিসোর্সের সবটাই তারা নিয়ে যেত। গোটা পাকিস্তানের আয়ের সিংহভাগ উপার্জন করত পূর্ব পাকিস্তান বা পূর্ববাংলা, যার প্রায় সবটাই পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে ব্যয় করা হতো। যে কারণে পশ্চিম পাকিস্তানে উন্নয়ন হয়েছে; কিন্তু এখানে কোনো উন্নয়ন তারা করেনি।

বঙ্গবন্ধু বাঙালির অধিকার আদায়ের রাজনীতিকে জনমানুষের কাছে নিয়ে গেছেন, মানুষকে বুঝিয়েছেন যে, 'দেখ তোমরা পরিশ্রম করে উৎপাদন কর, এসব পণ্য রপ্তানি করে অনেক আয় হয়; কিন্তু এই অর্থ এখানে ব্যয় হচ্ছে? হচ্ছে না, সব অর্থব্যয় হয় পশ্চিম পাকিস্তানে।'

১৯৫৮ সাল থেকে অর্থনীতিবিদরা এ অঞ্চলের আয়ের বিষয়টি অঙ্ক কষে দেখিয়ে দিলেন দুই অঞ্চলের বৈষম্য কীভাবে হচ্ছে। পশ্চিম পাকিস্তানিরা সব সময় নিজেদের উন্নত আর ধনী দাবি করত। তাদের মতে, পূর্ববাংলা ব্রিটিশ আমলেও গরিব ছিল, তেমনই থাক। এত অর্থ কেন দেওয়া হবে। এভাবে বৈষম্য বাড়তে বাড়তে তা অসহ্য পর্যায়ে চলে গেল, যা সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি করে। এভাবে চলার পর বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন, ছেষট্টিতে বঙ্গবন্ধুর ছয়দফা প্রস্তাব সাধারণ মানুষকে আন্দোলনমুখী করেছে।

স্বাভাবিকভাবেই সংবিধানে চারটি মূলনীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই বৈষম্যটাই সবচেয়ে বড়ো ইস্যু ছিল। মূলত সাতচল্লিশের পর থেকে প্রতিনিয়ত বঞ্চিত হচ্ছিল বাঙালিরা।

বঙ্গবন্ধু জানতেন স্বাধীন না হলে পূর্ব পাকিস্তানে উন্নয়ন হবে না, বাঙালির সুখ হবে না। তাই কৌশলগত কারণে ছয়দফায় স্বায়ত্তশাসনের কথা বলা হলেও তা ছিল মূলত স্বাধীনতার দাবি। বঙ্গবন্ধুর এই কৌশল ছিল পাকিস্তানিরা যাতে বাঙালির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে না পারে। এই কৌশলে কাজ হয়েছে, ওরা তখন ঝাঁপিয়ে পড়ার কথা ভাবেনি। কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে জেলে আটকে রাখে। সাধারণ মানুষও তা বুঝেছিল! এই কৌশল পাকিস্তানিরা তখন বুঝতে পারেনি বলে কিছুদিন পর বঙ্গবন্ধুকে জেল থেকে ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল। স্বাধীন বাংলাদেশের কথা মাথায় রেখেই সংবিধানে কী কী থাকবে, সেগুলোই বলতেন। বাঙালির স্বার্থরক্ষার বিষয়গুলোই প্রধান্য পেয়েছে।

তখন আপনি তরুণ আইনজীবী, একটা স্বাধীন দেশের সংবিধান রচনার মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিলেন বঙ্গবন্ধু, আপনার প্রতি ভরসার জায়গাটা কেমন করে হলো?

ড. কামাল হোসেন : হ্যাঁ, বয়সটা কমই ছিল, কত আর হবে! ৩২ বা ৩৩ বছর, ১৯৩৭ সালে জন্ম হলে তো তা-ই হয়। সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সদস্য ছিলাম ৩৪ জন।

১৯৭২ সালের শুরুর দিকে, আমাকে স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন কমিটির চেয়ারম্যান নিয়োগ করেন বঙ্গবন্ধু নিজে। বললাম, সিনিয়র সব মেম্বার আছেন, সেখানে আমাকে চেয়ারম্যান করবেন? বললেন, 'তুমি আইনবিশেষজ্ঞ হিসাবে এই কমিটির চেয়ারম্যান আর অন্যরা কমিটির সদস্য থাকবে। অসুবিধা হবে না।' পরে কাজ করার ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর কথাই সত্য প্রমাণ হলো। সবার জুনিয়র ছিলাম; কিন্তু সিনিয়ররা সবাই সহযোগিতা করেছেন।

সেসময় নেতাদের মধ্যে ছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা তাজউদ্দীন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী ও কামারুজ্জামান ছাড়াও কজন। তাঁর বিশ্বাস ছিল আমি এ কাজটি করতে পারব। এই আস্থা ও ভরসা তৈরি হওয়ার কারণ হয়তো বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আগে কাজ করেছি। কিছুটা আগের কথা বলতে হয়।

বঙ্গবন্ধু যখন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় কারাগারে। একদিন তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন। তখনও আইনজীবী হিসাবে বঙ্গবন্ধুর কাছাকাছি ছিলেন আতাউর রহমান খান, সালাম সাহেব ছাড়াও কয়েকজন। জেলখানায় দেখা করার পর তিনি বললেন, তুমি মাঝে মাঝে এসে আমার সঙ্গে মামলা বিষয়ে আলোচনা করবে। তখন

থেকেই আমার সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতেন। একপর্যায়ে আন্দোলন ও জনমতের চাপে বঙ্গবন্ধুকে জেল থেকে ছাড়তে বাধ্য হয় পাকিস্তান সরকার। জেল থেকে যেদিন তিনি মুক্ত হন। সেদিন তিনি আমাকে বললেন, তুমি আমাদের পার্টিতে জয়েন কর। আমি আওয়ামী লীগ পার্টির হয়ে কাজ করে যাব বলার পর তিনি আবারও বললেন, এভাবে নয়, পার্টিতে জয়েন করতে হবে।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রসঙ্গটি বলবেন?

ড. কামাল হোসেন : এ প্রসঙ্গেই আসছি–আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বঙ্গবন্ধু কারাগারে। একদিন এক সিনিয়র কর্মকর্তা জেলখানার সামনে গাড়ি নিয়ে এসে বঙ্গবন্ধুকে বললেন, আপনাকে জামিন দেওয়া হচ্ছে। এখান থেকে এয়ারপোর্টে নিয়ে যাওয়া হবে আপনাকে, ক্যাপ্টেন নূর খান প্লেন চালিয়ে আপনাকে পাকিস্তান নিয়ে যাবেন। পাকিস্তানে গিয়ে কথা বলবেন। এ কথা শুনে বঙ্গবন্ধু সেদিন হেসে দিয়ে বলেছিলেন, তা কী করে সম্ভব? আমি তো মামলার আসামি, আসামিকে তো আর নিয়ে যেতে পারেন না এভাবে। আমার তো একটা উপলব্ধি আছে।' সেদিন তিনি আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে ওদেরকে বললেন, এ আমার আইনজীবী, তাকে বলেছি আপনাদের বলতে, আগে বিনাশর্তে মুক্তি দিয়ে মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। মুক্ত হব, তারপর স্বাধীন নাগরিক হিসাবে আমার দল ও জনগণের সঙ্গে আলোচনা করে আলাপ করতে পাকিস্তানে যেতে পারি। বিচারাধীন বন্দি হিসাবে তো ওখানে আলোচনায় যাওয়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়।' বঙ্গবন্ধুর কথা শুনেও না বোঝার ভান করে চলে গেল। বিরক্ত হয়ে অফিসার বলতে থাকে চেষ্টা করলাম আপনি শুনলেন না। বঙ্গবন্ধুকে তো মিলিটারি কাস্টডিতে রাখা হয়েছিল। পরে কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্ট জেলখানায় স্থানান্তর করা হয়। ওই জেলখানায় কেন? এটাও খুব উল্লেখযোগ্য, কারণ যতবার বঙ্গবন্ধুকে ধরা হতো, প্রতিবার তিনি জামিন নিয়ে নিতেন। ম্যাজিস্ট্রেট জামিন না দিলেও জেলা জজের কাছ থেকে জামিন নিয়ে বের হয়ে আসতেন।

জেল থেকে বের হয়েই তিনি একই কথা বলতে থাকেন তাতে মানুষ আকৃষ্ট হতে থাকে। তখন শাসকরা দেখে যে এ তো মহা মুশকিল, শেখ মুজিব তো জেলজুলুম কিছুই ভয় পান না, তাঁকে আটকেও রাখা যায় না। শাসকরা শেখ মুজিবকে আটকাতেই একটা ষড়যন্ত্র মামলা সাজায়, এক নম্বর আসামি করে শেখ মুজিবুর রহমানকে। কিছুদিন পর ওরা এটাকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা হিসাবে ঘোষণা করে। তখন আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে ওরা বোঝাতে চেষ্টা করছে শেখ মুজিবুর রহমান ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে, পাকিস্তান ভাঙতে চাইছে। ততদিনে শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তা আরও বাড়তে থাকে। জেল থেকে বেরিয়ে আমাকে পার্টিতে জয়েন করার কথা বলার পর বলেছিলাম, কর্মী হিসাবে আপনার দলের কাজ করব। তিনি বললেন, তোমাকে জয়েন করতে হবে। বললাম, আপনি বললে আমাকে তো জয়েন করতেই হবে। এরপর ঘটনা দ্রুত ঘটতে লাগল। উনসত্তরে ১১ দফার দাবিতে গণ-অভ্যুত্থান। এর পরপরই নির্বাচনে যাবেন, এ নিয়ে প্রস্তুতি। সত্তরের নির্বাচনের কথা বলছি, স্বাধীনতার কথা সরাসরি না বললেও ১১ দফার পক্ষে জনমত গঠন করার কৃতিত্ব বঙ্গবন্ধুর। এখানেই তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় মেলে। ফলে সত্তরের নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পেল আওয়ামী লীগ।

> পররাষ্ট্রমন্ত্রী হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু প্রথমেই দায়িত্ব দিলেন, তা ছিল আমার জন্য এক বড়ো চ্যালেঞ্জ। এটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তখন পর্যন্ত লাখের ওপরে বাঙালি পাকিস্তানে আটকে আছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাদের ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা

সত্তরের নির্বাচনে সংবিধান নিয়ে যা আলোচনা ছিল, বাহাত্তরের সংবিধানের মধ্যে বিশেষ কী পরিবর্তন চেয়েছেন বঙ্গবন্ধু?

ড. কামাল হোসেন : উনসত্তর সালেই তিনি বলেছিলেন, পাকিস্তানের সংবিধানে গুণগত পরিবর্তন আনতে হবে। অনেক কথাই বলেছেন তখন। এর মধ্যে বিশেষভাবে আমাকে বললেন, দেখ আগের সংবিধানের নিয়ম একটা বিষয় ক্ষতি করেছে, অনেক কষ্ট করে আমাদের দলের মেম্বারদের ইলেক্ট/নির্বাচিত করানো গেল; কিন্তু মন্ত্রিত্বের গন্ধ পেয়ে অনেকে অন্য দলে চলে যায়, সেটা এবার বন্ধ করতে হবে।

বঙ্গবন্ধুর চাওয়া অনুযায়ী বাহাত্তরে প্রণীত সংবিধানে ৭০ অনুচ্ছেদ যুক্ত করা হলো। যে জায়গাটাতে বলা আছে, কেউ যদি দল থেকে মনোয়ন নিয়ে নির্বাচিত হয়ে পরে মন্ত্রিত্ব পেয়ে বা দলের আদেশ অমান্য করে তাহলে তিনি দলের সদস্য পদ হারাবেন, সেই সঙ্গে সংসদের আসনও বাতিল হয়ে যাবে তাঁর। এই নিয়ে আলোচনার একপর্যায়ে তখন বলেছিলাম, এটা কি গণতান্ত্রিক হবে? দল থেকে নির্বাচিত হলেও জনপ্রতিনিধি হিসাবে তো ভিন্নমত দিতেই পারে। তখন

বঙ্গবন্ধুর বক্তব্য ছিল, 'এ ব্যাপারে আমি খুবই ভুক্তভোগী। এই তিক্ত অভিজ্ঞতা তো তোমাদের নেই। তাই এটা সংবিধানে থাকতে হবে। যেমন '৫৪-এর নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের মনোনয়নে অনেক কষ্টে নির্বাচিত হয়ে এলো। হওয়ার পর সরকারের পক্ষ থেকে মন্ত্রী হওয়ার অফার পেয়ে তাদের অনেকেই রাতারাতি মন্ত্রী হয়েছে। তাই এমনটা যাতে ভবিষ্যতে না হয়, এর জন্যই সংবিধানে এমন নির্দেশনা থাকা চাই।' এ ব্যাপারে তিনি ছিলেন খুবই আবেগপ্রবণ।

চারটি মৌলিক নীতিনির্ধারণে বঙ্গবন্ধুর ভাবনা কী ছিল?

ড. কামাল হোসেন: হ্যাঁ, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার এক বছরের মধ্যে সংবিধান পেয়েছে জাতি। ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর তা কার্যকর হলো।

পাকিস্তান শব্দটি আমরা তখন মুখে আনতাম না। তিনি বলতেন, আমরা বাঙালি, বাঙালির কমিউনিটির একটি রাষ্ট্র হবে। তার নাম হবে বাংলাদেশ। বাঙালিরাই দেশটি নিয়ন্ত্রণ করবে, শাসন করবে। বিষয়টি তো তখন ফিকস্ড হয়ে গিয়েছিল। পাকিস্তান সংবিধান, শাসনব্যবস্থা, গণতন্ত্র, অর্থনীতি কোনো বিষয়েই বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান শব্দটাই উচ্চারণ করতেন না। বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে তিনি চেয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদ হবে বাঙালির আত্মপরিচয়। বাংলাদেশে নির্ভেজাল গণতন্ত্র থাকবে, ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা পার্লামেন্ট গঠন করবে।

হ্যাঁ, সংবিধানের মূল নীতির একটি সমাজতন্ত্র। এ প্রসঙ্গে বলি, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাঙালিদের অভিযোগ ছিল অর্থনৈতিক বৈষম্য। এই অঞ্চলের স্বায়ত্তশাসন চাওয়ার মূল কারণ ছিল বৈষম্য। দুই পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য এতটাই ছিল যে পশ্চিম পাকিস্তান ধনী হচ্ছিল আর দরিদ্র অতি দরিদ্র হয়ে যাচ্ছিল পূর্ব পাকিস্তান। দুই অঞ্চলে অর্থনৈতিক বৈষম্য বেড়ে অবস্থাটা এমন দাঁড়িয়েছিল, তা কমানোই ছিল নতুন বাংলাদেশের জন্য জরুরি। সেকারণেই বঙ্গবন্ধু বললেন, এখন প্ল্যান ইকোনমি যাকে বলে, সেটাই করতে হবে। বাংলাদেশে অর্থনীতিকে পরিকল্পনার ভিত্তিতে সাজাতে হবে, যে ব্যবস্থায় মানুষে মানুষে বৈষম্য না থাকে, নারী-পুরুষে বৈষম্য থাকবে না, এলাকা ও এলাকার মধ্যে কোনো বৈষম্য না হয়। সমতা–এই পলিসিকে মূল নীতি হিসাবে চিহ্নিত করা হলো। সব ধরনের বৈষম্যমুক্ত সমাজ ও রাষ্ট্র গড়তে চেয়েছেন তিনি। কারণ পাকিস্তান আমলে সব পর্যায়ে বৈষম্যের শিকার হয়েছে বাঙালি।

সংবিধানের অন্য মৌলিক বিষয়গুলোয় তিনি খুবই গুরুত্ব দিয়েছেন। যেমন: নির্ভেজাল গণতন্ত্র, শক্তিশালী সংসদ, ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু হবে সংসদ।

বঙ্গবন্ধুর চাওয়াগুলোর প্রতিফলন কি ঘটেছে?

ড. কামাল হোসেন : আমার তো মনে হয় সবগুলোর প্রতিফলন সংবিধানে দেখা গেছে। বঙ্গবন্ধু চাইতেন সংসদ সদস্যরাই হবেন শক্তিশালী। তবে তাঁর একটা চাওয়া শেষ পর্যন্ত যুক্ত রাখা সম্ভব হয়নি। সেটা হলো, প্রেসিডেন্ট ইচ্ছা করলে পার্লামেন্ট ভেঙে দিতে পারেন–সংবিধানের এমন ধারাটি বঙ্গবন্ধু বাতিল করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পরে একটা সময়ের বাস্তবতায় বঙ্গবন্ধু যখন প্রেসিডেন্ট হলেন, তখন সেই ধারাটি আর বাতিল করতে গিয়েও তা করা সম্ভব হয়নি।

পূর্ববাংলার স্বার্থে সংবিধান কেমন হবে বা কী কী থাকবে, তা নিয়ে ১৯৬৮ সাল থেকেই আলোচনা হয়েছে। এরপর স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানে বঙ্গবন্ধুর চাওয়াগুলোর আমার মনে হয় সবকিছুই যুক্ত হয়েছে। তাছাড়া সংবিধানের সবই তো বঙ্গবন্ধুর অনুমোদিত, এতে তাঁর দল ছাড়াও জনসমর্থন ছিল শতভাগ। সবাই তাঁর অনুগতই ছিল। অনেক আগে থেকেই বাংলার জনগণ তাঁকে শতভাগ সমর্থন দিয়েছে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী করার পর বঙ্গবন্ধু আপনাকে কোন বিষয়গুলো গুরুত্ব দিতে বলেছিলেন?

ড. কামাল হোসেন : মন্ত্রী করার পরদিন বঙ্গবন্ধু বললেন, 'তোমাকে তো ফরেন মিনিস্টার করা হলো, যাও সামাদ সাহেবের সঙ্গে দেখা করো।'

আমার আগের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন আবদুস সামাদ আজাদ। হয়তো ব্যাপারটাকে তিনি কীভাবে নিয়েছেন জানি না, কারণ আমি তো জুনিয়র। আইনমন্ত্রী হয়েছি কিছুদিন হলো, বয়সেও ছোটো; সবদিক থেকেই ছিলাম জুনিয়র। আমার ডানে তাজউদ্দীন আহমদ, বাঁয়ে নজরুল ইসলাম, ক্যাপ্টেন মনসুর আলীর মতো সিনিয়ররা। বিশেষ পদ চাওয়ার কোনো ব্যাপারই ছিল না। আমার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে অনেকবারই এমনই করেছেন বঙ্গবন্ধু।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু প্রথমেই দায়িত্ব দিলেন, তা ছিল আমার জন্য এক বড়ো চ্যালেঞ্জ। এটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তখন পর্যন্ত লাখের ওপরে বাঙালি পাকিস্তানে আটকে আছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাদের ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা। আর এখানকার লক্ষাধিক আটকে পড়া পাকিস্তানিকে পাকিস্তানে ফেরত পাঠানো। এটা তখন আমাদের জন্য বড়ো সমস্যা ছিল। আমরা শুনেছি, বাঙালিরা পাকিস্তানে এক ধরনের বন্দি অবস্থায় ছিল; কিন্তু তাদেরকে ফিরিয়ে আনার আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না। পাকিস্তান স্বীকৃতি দেয়নি তাই আলোচনায় বসা যাচ্ছে না। বঙ্গবন্ধু বললেন, একটা বুদ্ধি তো বের করতে হবে, কীভাবে তাড়াতাড়ি ওখানে থাকা বাংলাদেশের মানুষদের ফিরিয়ে আনা যায়, একটা ব্যবস্থা তো করা দরকার।

তখন ভারতে মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত পাকিস্তানিদের প্রায় ৯৩ হাজার যুদ্ধবন্দি ছিল, যাদের খাওয়া-পরা চালাতে হচ্ছে ভারত সরকারের। তারা কতদিন যুদ্ধবন্দিদের খাওয়াবে। এসব বিষয়েও যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটা সমাধান বের করে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বললেন তিনি। বঙ্গবন্ধুর পরামর্শ ছিল, পাকিস্তান আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি না দিলেও বাংলাদেশের দাবিগুলো তো ওদেরকে জানাতে পারি। এটা একটা চ্যালেঞ্জ ছিল আমার জন্য। কারণ, তখন পর্যন্ত পাকিস্তানের সঙ্গে কথাবার্তা বলা সম্ভব নয়। ওরা তখনও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি। চিন্তাভাবনা করে একটা ফর্মুলা বের করা হলো, যদিও স্বীকৃতি দেওয়ার আগে আনুষ্ঠানিকভাবে কথা বলব না, তবুও একটা দাবি ওদেরকে জানানো হলো–'যদি তোমরা আমাদের আটকে পড়া বাঙালিদের পাঠাতে সম্মত হও এবং পাঠাও, তাহলে বাংলাদেশে থাকা পাকিস্তানিসহ যুদ্ধবন্দিদের ফেরত পাঠাব। তবে যুদ্ধাপরাধী হিসাবে চিহ্নিতদের ফেরত পাঠানো হবে না।'

ভারত ও বাংলাদেশের স্বাক্ষর করা একটা যুক্ত ঘোষণা পাকিস্তানকে পাঠানো হয়। পররাষ্ট্রমন্ত্রী হওয়ার পরপরই এটা ছিল আমার বড়ো এবং উল্লেখযোগ্য কাজ। এই উদ্যোগকে বিশ্বের অনেক দেশ স্বাগত জানিয়েছিল। পাকিস্তানে বন্দি বাঙালিদের ফিরিয়ে আনার বিষয়টি বঙ্গবন্ধুর কাছে ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও বড়ো কাজ। তিনি বলতেন, এখানে আটকে পড়া পাকিস্তানি আর যুদ্ধবন্দিদের বেশিদিন সহ্য করা আমাদের সম্ভব নয়, উচিত হবে না। এখানে তিনি অসাধারণ মানবিক রাষ্ট্রনায়ক।

যুদ্ধাপরাধীদের বঙ্গবন্ধু ক্ষমা করে দিয়েছেন–এমন একটা কথা বলার চেষ্টা করা হয়। বিষয়টি কি অপব্যাখ্যা?

ড. কামাল হোসেন: কাদের ক্ষমা করেছিলেন বঙ্গবন্ধু? এটা নিয়ে অপব্যাখ্যা দেওয়া হয়। বঙ্গবন্ধুর বক্তব্য ছিল, যারা গুরুতর অপরাধ

করেছে, ধর্ষণ করেছে, গণহত্যা করেছে, তাদেরকে তো ক্ষমা করছি না। যারা পাকিস্তানের নাগরিক এদেশে আছেন, যারা যুদ্ধে সৈনিক হিসাবে যুদ্ধ করেছে, অন্য কোনো অপরাধের সঙ্গে যুক্ত নয়, কেবল তারা চলে যেতে পারে। কিন্তু অপরাধীদের ফেরত পাঠাব না, তারা থাকবে।

বঙ্গবন্ধুর এই ঘোষণাকে সারা পৃথিবী স্বাগত জানিয়েছিল। আমি পররাষ্ট্রমন্ত্রী হওয়ার পরপরই ভারতের বিশেষ দূত পিএন হাকসা এলেন বাংলাদেশে। যিনি মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর ঘনিষ্ঠজন ছিলেন। উনি এলেন '৭৩-এর আগস্টে। ফরেন মিনিস্টার হিসাবে প্রথম এবং বলব একটা বড়ো ও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার সুযোগ হলো। তাঁকে জানালাম প্রথমেই আমরা যে বিষয়গুলোর সমাধান চাই তা হলো, পাকিস্তান থেকে আমাদের বাঙালিদের ফিরিয়ে আনতে চাই, পশ্চিম পাকিস্তানি যারা যেতে চায়, তাদের ফেরত পাঠানো, যুদ্ধাপরাধী যারা চিহ্নিত হয়েছে তাদেরকে ফেরত না পাঠানো, তাদেরকে ছাড়ব না। এক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর অবস্থান ছিল, ১৯৫ যুদ্ধাপরাধীকে আমরা বিচার করব; কিন্তু একজন বাঙালিকেও পাকিস্তানে তথাকথিত বিচার করতে পারবে না পাকিস্তান সরকার। যদি একজন বাঙালিকেও তথাকথিত বিচার করা হয়, তাহলে কোনো আলোচনা চলবে না।

বাংলাদেশকে স্বীকৃতি আদায় বা সেসব দেশের সঙ্গে পররাষ্ট্রনীতি কী হবে–বিষয়গুলোকে কীভাবে গুরুত্ব দিয়েছিলেন?

ড. কামাল হোসেন: এ বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর স্পষ্ট বক্তব্য ও যুক্তি এমন ছিল, সারা পৃথিবীকে জানাতে হবে, সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসাবে বাঙালির যা ন্যায্য

> সেই স্বপ্ন বুঝতে হলে বলব, বাহাত্তরের সংবিধান খুলে দেখতে হবে। যে সংবিধানে বঙ্গবন্ধু স্বাক্ষর করেছেন। তাঁর স্বাক্ষরিত সেই দলিল জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। সেখানে লেখা আছে যে, শহিদদের স্বপ্নের ভিত্তিতে আমরা আমাদের সংবিধান প্রণয়ন করছি। এদেশে থাকবে গণতন্ত্র, থাকবে সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ এবং ধর্মনিরপেক্ষতা–এই চার মূলনীতি

পাকিস্তান সেটা বিবেচনা করবে বলে জানায়। সেই থেকে শুরু হলো প্রক্রিয়া। তখন কিছু গুরুতর অপরাধীকে চিহ্নিত করা হলো, যারা যেতে পারবে না। ১৯৫ অপরাধীর একটি তালিকা করা হলো বিচারের জন্য। এদের ছাড় দেওয়া হবে না, এটা ঠিক ছিল।

এই সিদ্ধান্ত নেওয়ায় অল্প সময়ের মধ্যে কাজের বড়ো অগ্রগতি হয়েছিল, ৯৩ হাজারের মধ্যে ১৯৫ জন– যা দুই শরও কম। যাদের বিচার বাংলাদেশেই করা হবে। এটা নিয়ে যখন পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনা শুরু হলো, তখন পাকিস্তান সরকার থেকে বলা হলো, বাংলাদেশের এই সিদ্ধান্ত পাকিস্তান সরকার মেনে নিচ্ছে। যানবাহনের ব্যবস্থা করে বাংলাদেশিদের ফেরত পাঠানো হবে। তবে বাংলাদেশে থাকা অন্য নাগরিকদের সঙ্গে যুদ্ধাপরাধী হিসাবে তালিকাভুক্ত ১৯৫ জনকেও পাকিস্তানে পাঠাতে হবে। তাদের অপরাধের সাক্ষী থাকলে পাকিস্তানেই তাদের বিচার করা হবে। পাকিস্তানের এই প্রস্তাবে দ্বিধা ছিল আমাদের। বঙ্গবন্ধুকে তা বলার পর তিনি বললেন, কী করা যাবে! বাংলাদেশের এত মানুষ সেখানে আটকে আছে, তাদের আমরা ফিরে পাব।' এর কারণ, যারা পাকিস্তান থেকে পালাতে পেরেছিল, তারা বলেছে এখানে আটকে পড়া বাঙালিরা কত কষ্টে দিন কাটাচ্ছে। বঙ্গবন্ধু তা সহ্য করতে পারছিলেন না। বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তা, সিনিয়র আর্মি অফিসাররা এবং তাদের পরিবার বেঁচে ফিরবে। এখানে তাদের আত্মীয়স্বজনরা অস্থির হয়ে আছে, উৎকণ্ঠায় অপেক্ষা করছে। এমনই ছিল পরিস্থিতিটা, এটাও একটা দিক ছিল। তাছাড়া নতুন রাষ্ট্র গঠন করা হচ্ছে, সেখানে নিজেদের সিভিল ও আর্মি অফিসারদের রাষ্ট্র পরিচালনায় প্রয়োজন। অন্যদিকে ভাবনাটা এমন ছিল যে, এই ১৯৩ জনের অপরাধের সাক্ষী বাংলাদেশে ও পাকিস্তানে দুই জায়গায়ই আছে। এ ব্যাপারে একটা আন্ডার টেকেন থাকলে ওরা এসব অপরাধীর বিচার করবে। সব বিবেচনায় নিয়েই একটা অ্যাগ্রিমেন্ট করা হলো। সেই অনুযায়ী কাজও হলো। যদিও পাকিস্তান পরে এদের বিচার করেনি। কিন্তু সেই পরিস্থিতিতে এই জয়েন্ট ডিক্লারেশন বা যুক্ত ঘোষণা ও বিনিময় প্রক্রিয়াকে বিশ্ববাসীও স্বাগত জানিয়েছিল। বঙ্গবন্ধু আমাকে অভিনন্দনও দিলেন।

ও প্রাপ্য ছিল, সেটাই পেয়েছে। পাকিস্তান বলতে চেষ্টা করেছিল, রাষ্ট্র ভাঙার জন্য বাঙালি এই লড়াই করেছে তা নয়, সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করেছে, লড়াইয়ে বাঙালির বিজয় হয়েছে, স্বাধীন দেশ পেয়েছে। বাংলাদেশ সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব চায়, কারও সঙ্গেই বৈরিতা চায় না। কেউ যদি মনে করে আমরা প্রো-রাশিয়া তাও নয়, সোভিয়েত রাশিয়া মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা করেছে, যা অনস্বীকার্য। আর আমেরিকা সমর্থন দেয়নি। হ্যাঁ, তখন পর্যন্ত আমেরিকা, চীনসহ অনেক দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি। বঙ্গবন্ধু এসব ব্যাপারে মেপে কথা বলতেন। তিনি বলতেন, আমরা কখনোই বলব না আমেরিকা বিরোধিতা করেছে। আমেরিকা সরকারের এক অংশ বিরোধিতা করেছে কিন্তু তাদের জনগণ তো বাঙালির স্বাধীনতার লড়াইকে সমর্থন জানিয়ে পথে নেমেছে, অনেক সিনেটর লড়াইয়ের পক্ষে বক্তব্যও রেখেছেন।

সেদেশের বিভিন্ন পেশার মানুষ সহায়তা করেছে, সমর্থন দিয়েছে। যেসব দেশের সরকার বা সংসদ সদস্যরা পারেনি; কিন্তু সেদেশের জনগণ সমর্থন জানিয়েছে। তাদেরও ধন্যবাদ জানাতে হবে। বঙ্গবন্ধুর লন্ডনে দেওয়া প্রথম বক্তৃতায়ও আছে কথাগুলো। এসব বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর

দূরদর্শিতা ছিল অসাধারণ ও শিক্ষণীয়। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস তিনি এখানে ছিলেন না, পাকিস্তানে বন্দি, বঙ্গবন্ধুর ফাঁসির আদেশ হলো। অথচ বন্দি থাকা অবস্থায়ও তিনি এত সুন্দরভাবে বিষয়গুলোকে ভেবেছেন! এমনকি এদেশে পাকিস্তানি উর্দুভাষী যারা থেকে যাবেন, তাদের নিরাপত্তার ভার বাংলাদেশ সরকার নেবে। এসব বিষয়ে বঙ্গবন্ধু খুব পরিষ্কার বক্তব্য ও মানবিক মতামত দিয়েছেন।

বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবার হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে...

ড. কামাল হোসেন : সেসময় আমি দেশে ছিলাম না। এদেশে থাকলে তো আমাকেও অন্যদের সঙ্গে হয়তো হত্যা করে ফেলত। এটা আমার সৌভাগ্য না দুর্ভাগ্য কী বলা যায়! বিদেশে থাকায় আমি বেঁচে গেছি; কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে তো হারিয়ে ফেললাম!

পঁচাত্তরের আগস্টে কয়েকটি দেশে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সফর করার প্রোগ্রাম ঠিক হয়ে গিয়েছিল। জার্মান, ইউরোপসহ বেশ কয়েকটি দেশ। তখন হঠাৎ একটি প্রস্তাব আসে যুগোস্লাভিয়া থেকে, তিন দিনের জন্য সেখান থেকে ঘুরে আসতে পারি কি না। আগে থেকেই মার্শাল টিটো বঙ্গবন্ধুর মধ্যে একটা সুসম্পর্ক ছিল। সেপ্টেম্বরে পেরুতে জোট নিরপেক্ষ সম্মেলন হতে যাচ্ছে। সেখানে যুগোস্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট মার্শাল টিটো যাবেন, বাংলাদেশের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যাবেন; সেখানে তাঁরা দুজনই বক্তব্য দেবেন। যুগোস্লাভিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমাকে জানালেন, সম্মেলনে এই দুজনই নেতৃস্থানীয় ভূমিকা রাখতে পারবেন। সেখানে কী কী বিষয় আলোচনা হতে পারে, তা আগে থেকে ঠিক করে নিতে পারি আমরা দুজনে। পরে আলোচনাগুলো বঙ্গবন্ধুকে আমি দেখাব আর তিনি দেখাবেন মার্শাল টিটোকে। তো এসব আলোচনার জন্যই যুগোস্লাভিয়া গেলাম। ফিরে আসার আগেই বঙ্গবন্ধু হত্যার খবর পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে জার্মানিতে রওয়ানা হলাম, কারণ সেখানে ছিলেন বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা। খবর শোনার পরপরই জার্মানিতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন রশিদ চৌধুরীকে ফোন করে জানলাম শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা ব্রাসেলসে বেড়াতে গেছেন। চৌধুরীকে বললাম, ওদের আনার ব্যবস্থা করেন। কথা বলতে হবে ওদের সঙ্গে। চৌধুরীর সঙ্গে বলছিলাম এখনো মনে পড়ে, এত বড় একটা আঘাত পেলাম। কোথায় ইউরোপ যাব বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে সফরে আর এরই মধ্যে বঙ্গবন্ধুই নেই, এভাবে হত্যা করা হলো তাঁকে!

জার্মানিতে থাকা অবস্থায়ই বাংলাদেশ থেকে আমাকে লন্ডন হয়ে জানানো হলো, আমার জন্য ফরেন মিনিস্ট্রি খালি রেখেছে এবং কবে যাচ্ছি বাংলাদেশে। জানালাম লন্ডনে আসছি, জার্মানি থেকে বাংলাদেশে না এসে তখন লন্ডনে চলে গেলাম। সেখানে যাওয়ার পর বাংলাদেশ হাইকমিশন ও রাষ্ট্রদূত ফারুক আহমেদ চৌধুরীসহ আমাকে সম্মান দেখালেন যথেষ্ট কারণ তখন পর্যন্ত আমি ফরেন মিনিস্টার। কিন্তু ওখানে আমার লাল পাসপোর্ট দিয়ে বললাম এটা রেখে আমাকে সাধারণ নাগরিকের সবুজ পাসপোর্ট দিন। ফারুক চৌধুরী তাই করলেন। তবে ভাগ্য যে বাংলাদেশ সরকার এনিয়ে কোনো ঝামেলা করেনি।

আকস্মিকভাবে ঘটছিল সবকিছু। হাইকমিশনে বসে আছি, এমন সময় অক্সফোর্ড থেকে ফোন এলো, বাংলাদেশের ফরেন মিনিস্টার ড. কামাল তো আমাদের এখান থেকে ফেলোশিপ করে গেছেন, ওনার খবর কী! উনি কি বেঁচে আছেন। হাইকমিশন থেকে বলা হলো, হ্যাঁ, উনি জীবিত আছেন এবং এই মুহূর্তে তিনি লন্ডনে এবং হাইকমিশনেই আছেন। তখনই আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইল। ফোন ধরলাম, আপনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিতে পারেন। ভাবলাম ভালোই হলো, আমার একটা আয়ের ব্যবস্থা হয়ে যায়। আমার পকেটে তখন ৪০ পাউন্ড আছে মাত্র। পরদিনই অক্সফোর্ড শিক্ষক হিসাবে জয়েন করলাম। তখন আমার মা, স্ত্রী ও সন্তানরা বাংলাদেশে। তাদেরকে জানালাম, আমার দেশে ফিরে আসা সম্ভব নয়, যত দ্রুত সম্ভব তাদেরকে লন্ডনে নিয়ে যাব। তখন সরকার এ ব্যাপারে কোনো বাধা দেয়নি, ঝামেলা করতে পারে, একটা ভয় তো ছিলই।

১৫ আগস্ট হত্যাকাণ্ডের ঘটনার পর আপনার...

ড. কামাল হোসেন : বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর সেই সরকারের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ বা তাদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখার প্রশ্নই ওঠে না, এটা একনম্বর। এরপর যুদ্ধাপরাধী, যারা ক্রিমিনাল, তাদের বিচার করা–এ দুটি প্রধান দায়িত্ব মনে করেছি। তিন নম্বর হলো, বঙ্গবন্ধুকে যারা হত্যা করতে পারে, ১৫ আগস্টের এমন হত্যাকাণ্ডের পেছনে যে বা যারা আছে, তারা যে বাংলাদেশের কত বড় শত্রু, বাংলাদেশের জনগণের শত্রু, সেটা বুঝে নেওয়া। কী বলব! বঙ্গবন্ধুকে এভাবে বাংলাদেশে হত্যা করতে পারে, এটা অকল্পনীয়, চিন্তাও হয়নি কখনো। কারণ পাকিস্তানে বন্দি ছিলেন, তখন বিচার, ফাঁসির আদেশ হয়েছে, তারপরও তো তারা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেনি। যদিও ৯৩ হাজার পাকিস্তানি আমাদের এখানে ছিল, এটাও একটা বিষয়। তারপরও পাকিস্তান বঙ্গবন্ধুকে জীবিত ফেরত দিয়েছে অথচ স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুকে জীবন হারাতে হলো এভাবে! তা ছিল অকল্পনীয়। এখনো বিশ্বাস করতে পারি না, কী করে এটা হলো। বঙ্গবন্ধুকে কোনো বাঙালি হত্যা করবে, তা আমরা যেমন ভাবিনি, তেমনই বঙ্গবন্ধু নিজেও ভাবেননি। তবে হ্যাঁ, আমাদের অবহেলা তো ছিলই একটা, এদেশের ইন্টেলিজেন্স এসব টের পেয়ে থামাতে পারেনি। এটাও সত্যি–সবেমাত্র নতুন রাষ্ট্রে দুর্বল ইন্টেলিজেন্স। তাদের সক্ষমতা তখনও তেমন গড়ে উঠেনি। এখনো আমার কাছে প্রশ্ন থেকে গেছে কী করে এটা ঘটাতে পারল। তবে বলতে পারি, অবশ্যই এর পেছনে থেকে পাকিস্তান করিয়েছে, সঙ্গে ছিল আমাদের অন্য শত্রু। একটা হতে পারে ওভার কনফিডেন্ট, স্বাধীন বাংলাদেশের জাতির পিতাকে বাঙালি কোনোদিন হত্যা করবে না। তখনকার পরিস্থিতিতে কয়েকবার সতর্কবার্তা দিয়েছিল ঠিকই।

বঙ্গবন্ধুকে কয়েকবার সতর্কবার্তা দেওয়ার পরও তিনি তা বিশ্বাস করেননি?

ড. কামাল হোসেন: তা ঠিক শুনেছেন, তবে ওনার ওভার কনফিডেন্স ছিল, বঙ্গবন্ধুর অসাধারণ আত্মবিশ্বাস ছিল। কে ওনাকে হত্যা করবে? কোনো বাঙালি তাঁকে হত্যা করবে, তা তিনি বিশ্বাস করতেন না। আর ব্যক্তিগতভাবে মনে করেছি বা এখনো করি, পাকিস্তান এটা ঘটাতে পারে। কারণ, তখন পাকিস্তানের কাছে আমাদের অনেক দাবি ছিল। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিষয়টি ছিল কিন্তু বাংলাদেশের মাটিতে এমনটা ঘটতে পারে, তা ছিল চিন্তার বাইরে। এ ব্যাপারে আমাদের অনেক বড়ো ব্যর্থতা ছিল। আমাদের ইন্টেলিজেন্স আগাম কিছু করতে পারেনি। তবে এটাও ঠিক, তখন নতুন আর দুর্বল রাষ্ট্র। আমাদের পুলিশ, ইন্টেলিজেন্স–সবকিছুতেই ঘাটতি ছিল বলা যায়। কত বড়ো ঘাটতি ছিল যে বঙ্গবন্ধুকে হারাতে হলো। এর চেয়ে বড়ো কিছু হারানোর তো ছিল না। সবচেয়ে বড়ো ক্ষতি হয়ে গেল।

বঙ্গবন্ধু-পরবর্তী বাংলাদেশ কেমন আছে? আপনার পর্যবেক্ষণ কী...

ড. কামাল হোসেন: আমি বলব, বঙ্গবন্ধুর ভাষায়, বঙ্গবন্ধু কী বাংলাদেশ চেয়েছিলেন, শহিদদের স্বপ্নের বাংলাদেশ। আমি বলি, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশ। এটা তো বিতর্কের ঊর্ধ্বে। তিনি কোন বাংলাদেশ চেয়েছিলেন। সেই স্বপ্ন বুঝতে হলে বলব, বাহাত্তরের সংবিধান খুলে

> বঙ্গবন্ধুকে জানতে হলে বাহাত্তরের সংবিধান পড়ে দেখতে হবে। কারণ সেটা বঙ্গবন্ধুর আদেশ অনুযায়ী খসড়া লেখা হয়েছিল। সেখানে লেখা আছে তিনি কেমন দেশ, রাষ্ট্র, রাজনীতি চেয়েছেন, তা তাদের বুঝতে হবে

দেখতে হবে। যে সংবিধানে বঙ্গবন্ধু স্বাক্ষর করেছেন। তাঁর স্বাক্ষরিত সেই দলিল জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। সেখানে লেখা আছে যে, শহিদদের স্বপ্নের ভিত্তিতে আমরা আমাদের সংবিধান প্রণয়ন করছি। এদেশে থাকবে গণতন্ত্র, থাকবে সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ এবং ধর্মনিরপেক্ষতা–এই চার মূলনীতি। তিনি বলতেন, দেখ, বাঙালির দীর্ঘ আন্দোলন, একসময় ভোট দিয়ে পাকিস্তান বানানো হলো; কিন্তু গণতন্ত্র আসেনি, অর্থনৈতিক বৈষম্য চলতেই থাকল। মূলত ১৯৪৮-এ এই আন্দোলনের শুরু, বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ। এ বিষয়গুলোকে ব্যাখ্যা করলেন। এই চার মূলনীতি কোথা থেকে এলো, বঙ্গবন্ধুর ও অন্যদের অভিজ্ঞতা থেকে এই চার মূলনীতি চিহ্নিত করা হলো। যার ভিত্তিতে বাংলাদেশ পরিচালিত হবে। বৈষম্য যেন না থাকে, যার জন্য সমাজতন্ত্র নীতি নেওয়া হলো। বাংলাদেশের বয়স ৫০ বছর আর বঙ্গবন্ধুর শতবর্ষ উদযাপন। এ সময়ে বঙ্গবন্ধুকে চর্চা, মূল্যায়ন বা উপস্থাপন করতে হলে বঙ্গবন্ধু প্রণীত সংবিধানের চার মূলনীতির আলোকে বাংলাদেশ পরিচালিত কতটা হচ্ছে, তা দেখা দরকার।

আপনার কি মনে হয় বাহাত্তরের সংবিধানে ফিরে যাওয়া দরকার?

ড. কামাল হোসেন: কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। তবে মূল বিষয়গুলো তো রয়েছে। আর বাহাত্তরের সংবিধানে ফিরে যাওয়ার বিষয়ে বলা যায়, যদি বর্তমান বাস্তবতা পর্যালোচনা করে মনে করা হয় যে চার মূলনীতির সঙ্গে দেশ পরিচালনার নীতির মিল নেই, তাহলে ফিরে যাওয়ার বিষয়টি বিবেচ্য বিষয়। আমার বক্তব্য হচ্ছে, বাহাত্তরের সংবিধান যা তিনি করে দিয়ে গেছেন, তাতে তাঁর চিন্তাধারা, দর্শন, রাষ্ট্রনীতি, কেমন বাংলাদেশ চেয়েছেন–এর সবই তো আছে।

আগামী প্রজন্মের কাছে বঙ্গবন্ধুকে কীভাবে উপস্থাপন করবেন?

ড. কামাল হোসেন : এক্ষেত্রে বলব, বঙ্গবন্ধু যে চিত্রটি বাহাত্তরের সংবিধানে দিয়ে গেছেন, তা খুলে দেখতে বলব। বর্তমান বাংলাদেশের চিত্রটি এর সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে যে বাস্তবে আমরা পুরোপুরি অর্জন করেছি কি না, কতটা অর্জন করতে হবে। এই যে শিক্ষাব্যবস্থা, তিনি চেয়েছিলেন শহর ও গ্রামে সবাই যেন শিক্ষার সুযোগ পায়। যা এখনো এদেশে করা সম্ভব হয়নি। যদিও এটা সময়সাপেক্ষ বিষয়।

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে করণীয় কী?

ড. কামাল হোসেন : এটা দেশের সবাইকেই সিরিয়াসলি বিবেচনা করতে হবে। এ সময়ে আমাদের অর্জন কতটা আর ব্যর্থতা কোথায়। আমরা স্বাধীনতার ৫০ বছর পেরিয়েছে। স্বাধীনতা পেয়েছি, স্বাধীন একটি রাষ্ট্র পেয়েছি, শিক্ষিতও হয়েছি। আমি কী বলছি, সেটা বড়ো কথা নয়। যদি বলি বঙ্গবন্ধুর চোখ দিয়ে মূল্যায়ন করা হয়, তাহলে বাহাত্তরের সংবিধানই বলে দেয় বঙ্গবন্ধু কী চেয়েছেন। তিনি চেয়েছেন সংসদীয় গণতন্ত্র, ষোলো আনা গণতন্ত্র, নির্ভেজাল গণতন্ত্র। জনগণই সব ক্ষমতার মালিক হবে।

বঙ্গবন্ধুর দল মূল আদর্শ থেকে সরে গেছে কিছুটা...

ড. কামাল হোসেন : বঙ্গবন্ধুকে জানতে হলে বাহাত্তরের সংবিধান পড়ে দেখতে হবে। কারণ সেটা বঙ্গবন্ধুর আদেশ অনুযায়ী খসড়া লেখা হয়েছিল। সেখানে লেখা আছে তিনি কেমন দেশ, রাষ্ট্র, রাজনীতি চেয়েছেন, তা তাদের বুঝতে হবে। বঙ্গবন্ধু নির্ভেজাল গণতন্ত্র চেয়েছেন, জনগণ হবে ক্ষমতার মালিক–এই কথাটা ৭০ অনুচ্ছেদে লেখা আছে। সেখানে সংসদীয় গণতন্ত্রের কথা বলেছেন, সেটা কতটা আছে আর হচ্ছে, তা বিচার করা বা তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের।

প্রথমত. জনগণ ক্ষমতার মালিক হওয়ার অবস্থানে পৌঁছেছে কি না? তিনি সত্যিকার অর্থেই চেয়েছিলেন যে জনগণ ক্ষমতার মালিক হবে। এই শব্দগুলো সংবিধানের সপ্তম অনুচ্ছেদে লেখা আছে। এর মূল্যায়ন সবাইকে করতে হবে, এটা হচ্ছে কি হচ্ছে না। দুই নম্বর হলো সংসদ: সংসদে সদস্যরা ভোটে নির্বাচিত হবেন, সেই ভোট হবে অবাধ ও নিরপেক্ষ। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল রাষ্ট্র পরিচালনা করবে, ক্ষমতা ভোগ করবে, কিন্তু জবাবদিহিতাও থাকবে। এই যে সংবিধানের এই নীতিগুলো ধরে ধরে যদি মূল্যায়ন করা যায়, তাহলেই বিষয়গুলো পরিষ্কার হবে। আর বঙ্গবন্ধুর আদর্শ থেকে তাঁর দল সরে এসেছে কি না, সেই বিচারটা আমি করতে চাই না বরং সবার কাছে আমার প্রশ্ন থাকল– বঙ্গবন্ধুর বাহাত্তরের সংবিধান অনুযায়ী কাজ করছে কি?

বঙ্গবন্ধুর কোন বিষয়গুলো আপনাকে এখনো প্রভাবিত করছে?

ড. কামাল হোসেন: শাসনক্ষমতা ভোগ করতে হয় জনগণের প্রতিনিধি হয়ে। তা তিনি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন এবং সারা জীবন তাই করেছেন, যা আমাকে সব সময়ই প্রভাবিত করে। কারণ, এমনটাই তিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ধরে রেখেছেন সারা জীবন। বঙ্গবন্ধুকে ইয়াহিয়া, আইয়ুব খান ও ভুট্টো–সবাই বলেছিলেন প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য। কিন্তু তিনি তাদের কথার পাত্তাই দেননি। এই যে কোনো লোভ তাঁকে টলাতে পারেনি, এটা আমার কাছে অনেক কিছু।

আগামী প্রজন্মকে কী বলতে চান?

ড. কামাল হোসেন: বঙ্গবন্ধু যেভাবে ঐতিহাসিক নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আর আমাদের সেটা পাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। উনি ছিলেন বলেই সবাই যেটা অসম্ভব মনে করত যে একাত্তরে একটা নতুন রাষ্ট্র জন্ম নেবে তা অসম্ভব। সাত কোটি মানুষের জন্য একটা নতুন রাষ্ট্র পৃথিবীর অনেক বিশেষজ্ঞ এবং কিসিঞ্জার, যা অসম্ভব ভেবেছিলেন; কিন্তু বঙ্গবন্ধু সেই অসম্ভবকে সম্ভব করে দেখালেন। কীভাবে করলেন, তা আগেই বলেছি। তিনি এত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন যে, সব বাঙালি বঙ্গবন্ধুর পক্ষে সমর্থন দিয়েছে। এমনকি মুসলিম লীগের সদস্যরাও তাঁর দলে চলে এসেছেন সমর্থন দিয়ে যেমন: সৈয়দ আব্দুস সুলতান এবং আরও অনেকে।

তিনি এত বড়ো মাপের মানুষ, যা আমরা কেউ কল্পনাও করতে পারিনি। তাঁর মানবতাবোধ, জনগণের প্রতি দরদ, তিনি ছিলেন জনদরদি। এছাড়াও রাজনৈতিক দিক থেকে জনগণের মন তিনি জয় করতে পেরেছিলেন। সবাইকে নিয়ে নির্বাচিত হলেন। অন্যদেশে এমনটা হয় না যে অন্যদল থেকে এসে আনুগত্য জানিয়ে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। দেশের সংবিধান প্রণয়নে ভূমিকা রাখতে হয়েছে। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বিষয়ে তিনি ডিক্টেট করেছেন। অন্যদেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন ও বিভিন্ন বিষয়ে এত সুন্দরভাবে বিষয়গুলোকে চিন্তা করেছেন যে, সাপ মরে কিন্তু লাঠি ভাঙে না। বিশেষ করে আমেরিকার ক্ষেত্রে, নিক্সন, কিসিঞ্জারসহ অনেক নেতাই বিরোধিতা করেছে, তাই অনেকে তখন বলেছে আমেরিকার সঙ্গে বাংলাদেশের কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না। কিন্তু সেই দেশের অনেক সিনেটর, বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সাধারণ মানুষ বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে সমর্থন দিয়েছে, তাদেরকে দূরে সরিয়ে দিতে পারে না বাংলাদেশ। সেই ইতিবাচক দিকটিকে ধরে বঙ্গবন্ধু তাদেরকে কৃতজ্ঞতা জানাতে চেয়েছেন এবং সুসম্পর্কও গড়ে তুলতে বলেছেন। আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্কের কথা ভেবেছেন। এই বিষয়টি বুঝতে কত বড়ো মাপের মানুষ আর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা থাকতে হয়, সেটাই ছিল বঙ্গবন্ধুর। অন্যদেশগুলোর ক্ষেত্রেও তাঁর ছিল এমনই ভাবনা। তিনি শুধু বলেননি তা করে দেখিয়েছেন। কেউ অন্যায়ভাবে বিরোধিতা করলে তার প্রতিবাদ আপসহীনভাবে করতে হবে বাংলাদেশকে। তাছাড়া সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারও সঙ্গে বৈরিতা নয়–এই নীতি তিনি আজীবন মেনে চলেছেন। এসবের সামআপ করলে বলা যায়, বঙ্গবন্ধু একজন নীতিমান মানুষ। অসাধারণ নীতিমান ছিলেন তিনি। নীতির প্রশ্নে বঙ্গবন্ধু ছিলেন আপসহীন। নীতিকে ধরেই এগিয়েছেন এবং সেজন্য জীবনের ঝুঁকি নিতে হয়েছে বারবার। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর দুই দেশের সম্পর্ক স্থাপন এবং এটা ওটা নিয়ে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনায় বসতে চেয়েছিল পাকিস্তান সরকার। তখন বঙ্গবন্ধু সাফ জানিয়ে দেন, পাকিস্তানে বসে কোনো আলোচনা নয়, সব আলোচনা হবে বাংলাদেশে যাওয়ার পর। এটা যে কত বড়ো ঝুঁকি ছিল। তাঁর সাহসের কোনো সীমা ছিল না। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ বা অনেক কিছু বলা হলো। আমি বঙ্গবন্ধুর অন্য আরেকটি দিক বলতে চাই তা হলো তাঁর উদারতা। গড়ে সব বিষয়কে নেতিবাচকভাবে প্রত্যাখ্যান না করা। যেখান থেকে যতটা নেওয়া যায়, তা নিয়ে দেশের স্বার্থে কাজে লাগানো। কোনো কিছুকে দলীয়করণ করেননি, তাঁর কাছে সব বাঙালিই সমান ছিল।

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লব স্বনির্ভর বাংলাদেশের মহাসড়ক

মুহম্মদ শফিকুর রহমান

বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লব বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ তথা বাকশাল নিয়ে বিগত চার দশকাধিককাল ধরে অনেক নেতিবাচক বচন শুনে আসছি। বচনেরও একটা ধরন থাকে। জাতির পিতাকে নিয়ে সমালোচনায় একেক সময় মনে হয়েছে এত অসভ্য অশিক্ষিত মানুষের এই বাংলাদেশকে তিনি স্বাধীন করে দিয়েছেন। দ্বিতীয় বিপ্লবের মাধ্যমে পথ দেখিয়ে গেছেন। অবশ্য সমালোচকরা ব্যাপক জনগোষ্ঠী নয়। দুই শ্রেণির মানুষ ওইসব সমালোচনা করছে: (১) প্রথম শ্রেণি মূর্খতার কারণে না বুঝে এবং অন্যের কাছে শুনে, (২) দ্বিতীয় শ্রেণি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত উচ্চবিত্ত ভদ্রলোক এবং বুদ্ধিজীবী, এরা না বুঝে নয় বরং বুঝেসুঝে বিষোদ্‌গার করে। লেখক-গবেষক প্রফেসর ড. মুনতাসীর মামুনের ভাষায় বলতে হয়, এই শ্রেণির মানুষ শিক্ষিত হোক আর গরমে ঘামতে ঘামতে মুজিব কোট পরুক–তাদের বুকের ভেতর একখানা পাকিস্তানি মানচিত্র আছে। ১নং শ্রেণির চেয়ে ২নং শ্রেণি সংখ্যায় বেশি। ওই দ্বিতীয় শ্রেণির নেতা মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর গং। সিপিবি বা প্রগতিশীল রাজনীতির নেতারা মির্জা ফখরুলের ভাষায় কথা বললেও বাকশালের সমালোচনা করে না, কারণ তারা বাকশালের শেয়ার পেয়েছিল। ভুল রাজনীতির কারণে ডিপেন্ডও করে না। মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীররা যখন বাকশালের বিরোধিতা করে কথা বলেন, তখন হাসি চেপে রাখতে হয়। কারণ ফখরুলদের গডফাদার মিলিটারি জিয়াউর রহমানও শেয়ার পেয়েছিলেন। রীতিমতো বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক সচিব তোফায়েল আহমেদের কেবিনে বসে দিনের পর দিন তদবির করে তবেই শেয়ার অর্জন করেছিলেন। অর্থাৎ বাকশালের সদস্য হয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধু যে রূপরেখা দিয়ে গিয়েছিলেন মিলিটারি ক্যুতে জীবন সংসারের কারণে সব বাস্তবায়ন করে যেতে পারেননি সত্য; কিন্তু তাঁরই সুযোগ্য কন্যা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী তথা রাষ্ট্রনেতা দেশরত্ন শেখ হাসিনা আজ বাকশালের লক্ষ্য অনুযায়ী বাংলাদেশকে এমন এক উচ্চতায় তুলে এনেছেন, যা বিশ্বের কাছে যেমন রোল মডেল, তেমনই দেশি সমালোচকদের কাছেও ঈর্ষণীয়। মির্জা ফখরুল যতই বলুন আওয়ামী লীগ দেশটাকে শেষ করে দিয়েছে, তার দলের সচেতন নেতাকর্মীরা তা বলেন না। আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের ক্যাম্পাস সাথী বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন নেতা (নাম বলে তাকে তোপের মুখে ফেললাম না) বলছিলেন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আজ বাংলাদেশ আর্থসামাজিক, রাজনৈতিকভাবে এমন উচ্চতায় উঠে এসেছে এবং ঝড়ঝঞ্ঝা, অভাব-অনটন কাটিয়ে বাংলাদেশ যেভাবে এগিয়েছে এবং এগিয়ে চলেছে তাতে রাষ্ট্রক্ষমতায় শেখ হাসিনাই থাকুন আর খালেদা জিয়া ঘরে বসে রাজনীতি করুন এবং মাঝেমধ্যে নয়াপল্টনে সমাবেশ করুন তাই ভালো।

বিএনপিপন্থি হয়েও বন্ধুবর একটি সত্য উচ্চারণ করেছেন। তারা তো সময় পেয়েছিলেন–জিয়া-সাত্তার ৭ বছর, খালেদা জিয়া (৫+৫+২) ১২ বছর, মোট ১৯ বছর অথচ একটি ইতিবাচক উদাহরণ রেখে যেতে পারেননি। বরং গণতন্ত্রকে ক্যান্টনমেন্টে বন্দি করেছেন নির্বাচন পদ্ধতিকে প্রশাসনের হাতে ছেড়ে ভোট ডাকাতির মাধ্যমে গণতন্ত্রকে মহাসংকটে নিপতিত করেছেন। জিয়া-খালেদা যুগল পাকিস্তানিদের গণহত্যার সহযোগী নেতা গোলাম আযমকে পাকিস্তান থেকে দেশে এনে নাগরিকত্ব দিয়ে রাজনীতিতে পুনর্বাসিত করলেন, যা বঙ্গবন্ধু বাতিল করেছিলেন। গণহত্যা ও বুদ্ধিজীবী হত্যাকারী জামায়াত, ছাত্রসংঘ, মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলামীর (যেগুলো নিষিদ্ধ ছিল) ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে তাদের আবার রাজনীতির মাঠে নামিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে আবার সাম্প্রদায়িক রাজনীতি শুরু করেন। এমনকি জিয়া একদিকে সংবিধানে বিসমিল্লাহ সংযোজন করেন, সঙ্গে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক নিষিদ্ধ মদ, জুয়া, হাউজি এবং যাত্রার নামে গ্রামেগঞ্জে উলঙ্গ নৃত্য প্রভৃতি ছড়িয়ে দিয়ে যুবসমাজকে এক অন্ধকার জগতে ঠেলে দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্রদের হিজবুল বাহার জাহাজে করে সিঙ্গাপুর ভ্রমণের নামে তাদের হাতে মদ-অর্থ-অস্ত্র তুলে দিয়ে ক্যাম্পাসকে রক্তাক্ত করে ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করার ব্যবস্থা করেন। ক্যুর নামে এয়ারফোর্সসহ বিভিন্ন নিয়মিত বাহিনীর অফিসারদের হত্যা করার ব্যবস্থা করেন। এইভাবে গোটা সমাজকে তছনছ করে দেন। এ অবস্থায় যখন তাদের ভোটের বাজার একেবারেই মন্দা, ঠিক তখন খালেদা জিয়া ১ কোটি ২৪ লাখ ভুয়া ভোট বানিয়ে নির্বাচন বৈতরণি পার হওয়ার ব্যবস্থা করেন; কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি।

এমনই একটি বৈরী পরিবেশে দেশরত্ন শেখ হাসিনা ৬ বছরের নির্বাসিত জীবন এবং সন্তানদের বিদেশে রেখে দেশে আসেন। তাতেও জিয়াউর রহমান অনেকভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন। কিন্তু জাতির পিতার কন্যাকে ঠেকানো যায়নি। যায় না। শুরু হলো জিয়া-সাত্তার-এরশাদের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই। এ লড়াইয়ে প্রধান নেতৃত্ব দেন শেখ হাসিনা; কিন্তু তখনকার মিডিয়া খালেদা জিয়াকে চ্যাম্পিয়ন বানানোর ব্যর্থ চেষ্টা চালায়। রাজাকার ও রাজাকারপন্থিদের নেত্রী হয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়া যায় না। যায়নি। তিনি ক্ষমতায় বসে যেভাবে দেশ চালান তাতে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরেরও সুযোগ পাননি। গণ-আন্দোলনের মুখে ক্ষমতাচ্যুত হন। রেখে যান খাদ্য ঘাটতি, বিদ্যুৎ ঘাটতি থেকে শুরু করে এক বোঝা ঘাটতি–যেমন: প্রথমবার ৩০ লাখ টন খাদ্য ঘাটতি, দ্বিতীয়বার ৪০ লাখ টন, বিদ্যুৎ উৎপাদন মাত্র ৩,২০০ মেগাওয়াট। আর আজ শেখ হাসিনা এক দশক ধরে খাদ্য ঘাটতি মিটিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ২৭ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত করেন। এই তো দুদিন গোটা বাংলাদেশ বিদ্যুদায়ন তথা ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার ঘোষণা দেন। হাওর-বাঁওড় বিল, চরাচরও আজ বিদ্যুতের আলোয় আলোকিত।

কীভাবে করলেন, সব জবাব একটাই–জাতির পিতা স্বনির্ভরতার যে মহাসড়ক বানিয়ে রেখে যান অর্থাৎ তাঁর কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ তথা বাকশালের যে ব্লুপ্রিন্ট রেখে যান, তা-ই অনুকরণ ও অনুসরণ করে কন্যা শেখ হাসিনা আজ এক খাদ্য উদ্বৃত্ত এবং বৈদেশিক মুদ্রার এক বিশাল ভান্ডার নির্মাণ করে এগিয়ে চলেছেন। বিগত নির্বাচনের আগে স্লোগান ছিল বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে, এগিয়ে যাবেই।

বাকশাল গঠন বঙ্গবন্ধুর কোনো একদিনের চিন্তা কিংবা কারও প্রভাব থেকে আসেনি। বঙ্গবন্ধু সারা জীবন গরিব-দুঃখী-মেহনতি মানুষের যে রাজনীতি করেছেন, তারই প্রতিফলন ঘটেছে বাকশালের মাধ্যমে। গোখলে বলেছিলেন, 'what Bengal thinks today rest of India thinks tomorrow' আমরা বলি 'what Bangladesh thinks today rest of leadership of The subcontinent think tomorrow'. বস্তুত বঙ্গবন্ধু আগে আগে হেঁটেছেন আর সব হেঁটেছেন তাঁর পেছন পেছন।

প্রশ্ন হলো বাকশাল কী? বঙ্গবন্ধু বাকশাল সম্পর্কে কী বলেছেন, তা তুলে ধরতে চাই। তিনি বলেছেন:

> 'আমি বহুদিন পর্যন্ত বারবার বলেছি। এ বাংলার মাটি থেকে করাপশন উৎখাত করতে হবে। করাপশন আমার বাংলার কৃষকেরা করে না। করাপশন আমার বাংলার মজদুর করে না। করাপশন করি আমরা শিক্ষিত সমাজ।'
>
> 'দেশে সুষ্ঠু শাসন কায়েম করতে হবে–যেখানে মানুষ শান্তিতে ঘুমাতে পারে, যেখানে মানুষ অনাচার-অত্যাচার থেকে বাঁচতে পারে। এই চেষ্টা নতুন–আমি বলতে চাই, এটা আমাদের দ্বিতীয় বিপ্লব।'

সোজা বাংলায় বাকশাল হলো গরিব-দুঃখী মানুষের স্বনির্ভর তথা আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক মুক্তির কর্মসূচি। এই চিন্তা, এই দর্শন একদিনে বঙ্গবন্ধুর মধ্যে জন্ম হয়নি। বঙ্গবন্ধু তাঁর রাজনৈতিক জীবনে 'আমার গরিব দুঃখী' মানুষ এভাবেই সাধারণ গরিব-দুঃখী জনগোষ্ঠী তাঁর আপন হয়ে ওঠে। এমনকি ১৯৭৩ সালে আলজিয়ার্সে জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনের ভাষণে বলেন, 'বিশ্ব আজ দুই ভাগে বিভক্ত–শোষক আর শোষিত, আমি শোষিতের পক্ষে।' দেশের অভ্যন্তরে আরেকটি বক্তৃতায় বলেন, আমার কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি মানুষ চুরি করে না, চুরি করে আমাদের মতো সাদা কাপড় পরা মানুষ। কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি মানুষ রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে মাঠে কলকারখানায় উৎপাদন বাড়িয়ে আমাদের অন্নবস্ত্র জোগান দেয়, "তাদের ইজ্জত দিয়ে কথা কইয়েন"।

এখানে আমি প্রথমে বঙ্গবন্ধুর বাকশালের রাজনৈতিক দর্শনের আলোচনা করব। বাংলাদেশ স্বাধীন হলো, মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ শহিদ হলেন, ৫ লক্ষাধিক মা-বোন নির্যাতিত হলেন। তাদের অবদানে, আত্মত্যাগে আমরা বিজয় অর্জন করলাম। নতুন দেশ, যোগাযোগব্যবস্থা বিধ্বস্ত, পথে-প্রান্তরে অস্ত্র-বোমা-গোলাবারুদ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে তস্করদের হাতে অস্ত্র, কোষাগার শূন্য–এ অবস্থায় আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পরীক্ষিত বন্ধু ভারত এবং রাশিয়া আমাদের পাশে দাঁড়াল। আমাদের সরকার পরিচালনায় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল। অথচ তিন মাস যেতে না যেতেই জাসদের জন্ম প্রক্রিয়া শুরু হলো। কোন যুক্তিতে এবং কেন, বোঝা বড়ো মুশকিল। আমাদের বন্ধুরা যারা

> এটা তো সত্যিই–বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে দ্বিতীয় বিপ্লব যেমন সফল হতো, তেমনই বাংলাদেশ বহু আগেই আজকের অবস্থানে পৌঁছাত। তারপরও পিতা দিলেন ব্লুপ্রিন্ট, কন্যা (চ্যাম্পিয়ন অব দি আর্থ) তার ওপর মজবুত ইমারত গড়ে তুললেন

উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানে যেমন সাহসী ভূমিকা পালন করেছে তেমনই মুক্তিযুদ্ধে। দুই জায়গায় সমাবেশের মাধ্যমে ছাত্রলীগ দুভাগ হলো, তেমনই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র নাম দিয়ে একটি বড়ো অংশ আলাদা হয়ে গেল–জন্ম নিল জাসদ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল। এর পেছনে রইল সিরাজুল আলম খান দাদা, আ স ম আবদুর রব গং। ধার করা হলো মেজর জলিলকে। সমাজতন্ত্র নিজেই বৈজ্ঞানিক, তারপরও কী অর্থে 'বৈজ্ঞানিক' যোগ হলো–আজও পরিষ্কার নয়। তবে সেদিন ভীষণ রাগ হতো আ স ম আবদুর রবের বক্তৃতা শুনে। যে ভাষায় সে বঙ্গবন্ধুকে গালমন্দ করতেন, কেন করতেন–এসব প্রশ্নের মীমাংসা আজও হয়নি। তবে আমাদের সহযোদ্ধা জাসদকর্মী অর্থাৎ ছাত্রলীগের প্রথম সারির নেতারা দাদা-বরদের গালমন্দ করতেন এই বলে যে নেতারা তাদের সঙ্গে গাদ্দারি করেছেন, তাদের জীবনটা শেষ করে দিয়েছেন। এ কথা বলার পেছনে কারণও ছিল। বঙ্গবন্ধু হত্যার পর আ স ম আবদুর রব কারাগার থেকে মিলিটারি জিয়ার সাহায্যে জার্মানি চলে যান। জাসদ ভেঙে টুকরা টুকরা হয়ে গেল। বঙ্গবন্ধুর জীবদ্দশায় তাদের যে বাগাড়ম্বর ছিল, এর এক কড়িও বাকি রইল না। তখন ব্যাংক লুট, পাটের গুদামে আগুন, বিদ্যুৎকেন্দ্রে আগুন এমনকি পাঁচজন এমপিকে হত্যা, ইদের জামাতে নামাজরত অবস্থায় বার্স্ট ফায়ার করে হত্যা, রক্ষীবাহিনী গঠন করেও থামানো যাচ্ছিল না। তাই বঙ্গবন্ধু জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন নিজ দল আওয়ামী লীগকে বিলুপ্ত করে এবং কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ বাকশাল গঠন করলেন। সেদিন দেখেছি কীভাবে পিঁপড়ার মতো লাইন ধরে সাংবাদিকরাও বাকশালে যোগ দিচ্ছে। আবার বঙ্গবন্ধু হত্যার পর তাদের অনেককেই বিরূপ মন্তব্য করতে শোনা গেছে। এমনকি শেখ হাসিনার সাবেক মিডিয়া উপদেষ্টাকে বঙ্গবন্ধু হত্যার পর প্রেস ক্লাবে বলতে শোনা গেছে, 'এমনটি যে ঘটবে আগেই জানতাম, সবকিছুর একটা সীমা আছে।' অথচ এই লোককেই রীতিমতো হুইপ করে রীতিমতো ভয় দেখিয়ে দলবেঁধে সাংবাদিকদের বাকশালে যোগদান করতে বাধ্য করেছিলেন। ১৫ আগস্টের আগে এবং পরে এই ঢাকার মানুষ সেই চিত্র দেখছিলেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। কী বিচিত্র এই দেশ।

এরপরই আসে বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লবের আরেক মৌলিক উপাদান বহুমুখী গ্রাম-সমবায়। এক্ষেত্রে মুখ্য বিষয় হলো উৎপাদন বৃদ্ধিতে গ্রাম-সমবায়, যা বঙ্গবন্ধুর ১৯৭২ সালের ৩০ জুন বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়নের সম্মেলনে বলেছিলেন:

> 'আজ সমবায় পদ্ধতিতে গ্রামে গ্রামে থানায় বন্দরে গড়ে তুলতে হবে মেহনতি মানুষের যৌথ মালিকানা। কৃষকরা তাদের উৎপাদিত ফসলের বিনিময়ে পাবে ন্যায্যমূল্য, শ্রমিকরা পাবে শ্রমের ফল ভোগের ন্যায্য অধিকার।'

অবশ্য এ অঞ্চলে সমবায় চিন্তা অনেক প্রাচীন। উপমহাদেশে সমবায় চিন্তা আসে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মাধ্যমে ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে। সম্ভবত ১৯০৪-১৯০৫ সালে। কবিগুরু রাজশাহীর পতিসরে গ্রামীণ ব্যাংকও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের জয়লাভ করলে নবগঠিত সরকারের কৃষি ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব লাভ করেন বঙ্গবন্ধু। বঙ্গবন্ধুর গ্রাম-সমবায় ছিল একেকটি গ্রামে ২৯৯ একর জমি নিয়ে একেকটি বহুমুখী গ্রাম-সমবায় সমিতি গঠিত হবে। এতে যৌথভাবে চাষ হবে। ফসল উৎপাদনের পর অংশীদারত্বের ভিত্তিতে ভাগ হবে। এইভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। গ্রাম-সমবায়ের স্বার্থে বঙ্গবন্ধু জমির সিলিং সর্বোচ্চ ১০০ বিঘা পর্যন্ত স্থিরীকৃত করেন (অবশ্য প্রথম ২৫ বিঘার কথাও ভাবা হয়েছিল, পরে অবশ্য ১০০ বিঘা করা হয়)। মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীও বাকশাল সমর্থন করেছিলেন। মিলিটারি জিয়া তো আগেই বলেছি বাকশালের সদস্য হন।

ওই সময়ে একটি অশুভ শ্রেণি মাঠে নেমে অপপ্রচার শুরু করে সরকার কৃষকের জমি নিয়ে নিচ্ছে। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর সরকার যতই বলছিল জমির মালিকানা যার যার জমি তার তারই থাকবে। কিন্তু শয়তানদের অপপ্রচার চলতেই থাকে। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেও তাদের কুৎসা থামেনি। এসব কিছুকে মোকাবিলা করেই শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ এগিয়ে চলেছে। এটা তো সত্যিই–বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে দ্বিতীয় বিপ্লব যেমন সফল হতো, তেমনই বাংলাদেশ বহু আগেই আজকের অবস্থানে পৌঁছাত। তারপরও পিতা দিলেন ব্লুপ্রিন্ট, কন্যা (চ্যাম্পিয়ন অব দি আর্থ) তার ওপর মজবুত ইমারত গড়ে তুললেন। ওইসব কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেই শেখ হাসিনা খালেদার রেখে যাওয়া দুইবারের খাদ্য ঘাটতি (১৯৯১ থেকে '৯৫ এবং ২০০১ থেকে ২০০৭) যথাক্রমে ৩০ লাখ এবং ৪০ লাখ টন মিটিয়ে আজ দেশকে খাদ্যে উদ্বৃত্ত করেছেন। শত্রুর মুখে ছাই পড়ল, বাংলাদেশ এগিয়ে চলল।

ঢাকা ২৪ মার্চ ২০২২

লেখক: সংসদ সদস্য এবং সাবেক সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় প্রেস ক্লাব

পাকিস্তানের ক্ষমা চাওয়া আর ক্ষমা পাওয়া

রেজা সেলিম

একাত্তরের অপরাধের জন্য বাংলাদেশের কাছে পাকিস্তানের ক্ষমা চাওয়া নিয়ে নতুন করে বিস্তর আলোচনা শুরু হয়েছে। কিন্তু আমরা এসব আলাপ-আলোচনার আগে একটি বিষয় ভাবছি না যে, পাকিস্তানের ক্ষমা চাওয়া আর বাংলাদেশের ক্ষমা করে দেওয়া এক বিষয় নয়। পাকিস্তান যদি তার কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চায়ও, বাংলাদেশ ক্ষমা করবে কি না, সেটা কেবল জনমতের বিষয় নয়, তা রাষ্ট্র সম্পর্কের বাইরের জগতে দুনিয়াজোড়া মুক্তিসংগ্রামের যে মানবিক জগৎ আছে তার সম্মানের বিষয়। পাকিস্তানকে ক্ষমা করে বাংলাদেশ সে সম্মানের বিরুদ্ধে কখনোই অবস্থান নিতে পারে না। আর সে সমাধান বঙ্গবন্ধুই করে দিয়ে গেছেন, 'পশ্চিম পাকিস্তানের ভাইদের বলি তোমরা সুখে থাকো। তোমার সামরিক বাহিনীর লোকেরা যা করেছে, আমার মা-বোনদের রেপ করেছে, আমার ৩০ লক্ষ লোককে মেরে ফেলে দিয়েছে, যাও সুখে থাকো। তোমাদের সাথে আর না, শেষ হয়ে গেছে, তোমরা স্বাধীন থাকো, আমিও স্বাধীন থাকি' (১০ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্তিলাভের পর দেওয়া ভাষণ)।

বঙ্গবন্ধু নির্দেশিত এই বক্তব্যের সূত্র ধরে আমরা তথাকথিত 'বর্তমান বাস্তবতায়' এসেও পাকিস্তানের ক্ষমা চাওয়াকে বড়ো করে দেখব কি না, সেটা ভাবাও অবান্তর। গত পঞ্চাশ বছরে পাকিস্তান বাংলাদেশকে একবিন্দু স্বস্তিতে থাকতে দেয়নি। এর আগের ২৪ বছর সে যা যা করেছে, সেটাও আমাদের আমলে নিতে হবে। ব্রিটিশ চক্রান্তে সফলভাবে ধর্মের নামে বিভক্ত করে ভারত-পাকিস্তান সৃষ্টির পরে আমরা পাকিস্তানের অংশ হয়ে, ধর্ম ও জনসংখ্যায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্যের শিকার হয়েছি। যে কারণে জন্মের মাত্র এক

বছর পরেই ২৮ বছরের তরুণ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান 'এই আজাদী গণ-আজাদী হয় নাই' বলে ঘোষণা দিয়ে বলেছিলেন, পাকিস্তানের প্রথম স্বাধীনতা দিবস পালিত হবে 'উৎপীড়নের নিগড় ছিন্ন করার সংকল্প দিবস' হিসাবে।

জন্মের শুরুতেই পাকিস্তান বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষার বলি দিতে শুরু করে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশের মানুষের প্রতি চরম অবজ্ঞা ও বৈষম্যমূলক আচরণ করতেই থাকে। সংগত কারণেই সৌভাগ্যের বরপুত্র হিসাবে বাংলাদেশের মানুষ পেয়েছিল বঙ্গবন্ধুর মতো নির্ভীক, অসম সাহসী এক নেতৃত্ব, যাকে ওই পুরো ২৪ বছরের ১১ বছরই থাকতে হয়েছে জেলে। কারণ, তিনি পাকিস্তানি উৎপীড়নের নিগড় ছিন্ন করে একটি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্য আন্দোলন-সংগ্রাম করেছিলেন। সে সংগ্রামের উদ্দেশ্য বঙ্গবন্ধুই বলেছিলেন, '...বাংলার মানুষ হাসবে, বাংলার মানুষ খেলবে, বাংলার মানুষ মুক্ত হয়ে বাস করবে, বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত খাবে–এই আমার সাধনা, এই আমার জীবনের কাম্য...'। সে উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল ২৪ বছরের অত্যাচার-সংগ্রামের পথ পাড়ি দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশ অর্জনের মধ্য দিয়ে।

আজ যদি সেসব অত্যাচারের কথা স্বীকার করে পাকিস্তান বাংলাদেশের কাছে ক্ষমা চায়, তাহলে ২৪ বছরের জেল-জুলুম আর বৈষম্যের জন্যও তো তাকে ক্ষমা চাইতে হবে, সে কথা আমরা বলছি না কেন? বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা যিনি বিশ্বনেতার আসনে সমাসীন হয়েছিলেন, তাঁর প্রতি যে অসম্মানজনক আচরণ পাকিস্তানিরা করেছে, এমনকি নানারকম মিথ্যা মামলা দিয়ে ফাঁসি দেওয়ার চেষ্টা পর্যন্ত করেছে, এর জন্য কি পাকিস্তান ক্ষমা চাইবে? সেই ২৪ বছরে আমরা যা কিছু পেতে পারতাম, তা কি আজও আদায় হয়েছে? পাকিস্তান কি তা একবারও সেসব বৈষম্যের কথা স্বীকার করেছে? বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক তার এক লেখায় সেসব বৈষম্য ও পাওনার একটি হিসাব উল্লেখ করেছেন, 'পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান ৭ হাজার ৬৪০ মিলিয়ন ডলার বৈদেশিক ঋণ পেয়ে তার ৮৪ শতাংশ ব্যয় করেছিল পশ্চিম পাকিস্তানে, যেখানে ৩০ ভাগেরও কম দেওয়া হয়েছিল পূর্ব বাংলাকে। ১৯৭০ সাল পর্যন্ত মোট রপ্তানিতে পূর্ব বাংলা থেকে পাঠানো দ্রব্য থেকে পাওয়া গিয়েছিল ২৫ হাজার ৫৫৯ মিলিয়ন টাকা, যেখানে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পাঠানো দ্রব্য থেকে এসেছিল ২১ হাজার ১৩৭ মিলিয়ন টাকা। সেসময় সোনালি আঁশখ্যাত আমাদের পাটই ছিল সবচেয়ে বড়ো রপ্তানি পণ্য। আমদানি খাতে পশ্চিম পাকিস্তানকে দেওয়া হয়েছিল ২৯ হাজার ৬২৯ মিলিয়ন টাকা। অথচ পূর্ব বাংলাকে দেওয়া হয়েছিল ১৭ হাজার ৬৭ মিলিয়ন টাকা, যে তথ্য ১৯৭০ সালে করাচিতে প্রকাশিত মান্থলি ফরেন ট্রেড স্ট্যাটিসটিক্স থেকে পাওয়া গেছে। অনেক অর্থনীতিকের মতে, পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার করা অর্থের পরিমাণ ছিল ২ হাজার মিলিয়ন মার্কিন ডলার...' (বিডিনিউজ, ২৮ জানুয়ারি ২০২১)।

একই রচনায় বিচারপতি মানিক আরও উল্লেখ করেছেন, '১৯৭৪ সালের ৪ এপ্রিল দৈনিক বাংলা পত্রিকায় প্রকাশিত খবর অনুযায়ী শুধু বৈদেশিক বাণিজ্য বাবদ পাকিস্তানের কাছে বাংলাদেশের ৫ হাজার কোটি টাকা পাওনা ছিল, যা সুদ-আসল এবং মুদ্রাস্ফীতিতে এখন বহু গুণ বেড়ে গেছে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তান যে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছিল, জাতিসংঘের কার্যক্রম পরিচালনা কর্তৃপক্ষের হিসাব অনুযায়ী, তার আর্থিক মূল্য ১২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং বাংলাদেশ সরকারের হিসাব অনুযায়ী তা ছিল ১ হাজার ২৪৯ কোটি টাকা, যা এখন অনেক বেড়েছে। তাছাড়া ১৯৭০ সালে ঘূর্ণিঝড়ের পর সারা পৃথিবী থেকে যে টাকা এসেছিল ত্রাণ হিসাবে, সে টাকারও বড়ো অংশ রেখে দিয়েছে পাকিস্তান। বিভিন্ন দেশে পাকিস্তান দূতাবাস ভবনেরও আমরা অংশীদার, যার হিস্যা পাকিস্তান আমাদের দিতে বাধ্য বটে। পাকিস্তান বিহারিদের ফেরত নেয়নি, যারা মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তান সৈন্যদের সঙ্গে মিলে গণহত্যা, গণধর্ষণ চালিয়েছিল। পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের ব্যাপারে বেশকিছু সমীকরণের প্রশ্নও জড়িত। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, বিশ্বব্যাপী জঙ্গি অর্থায়ন তদারকি করার জন্য ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্কফোর্স নামক যে আন্তর্জাতিক সংস্থা সৃষ্টি করা হয়েছে, যার দায়িত্ব কারা জঙ্গিদের অর্থায়ন করছে তা নির্ধারণ করা এবং সেসব দেশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া, সেই সংস্থা পাকিস্তানকে ধূসর তালিকাভুক্ত করেছে পাকিস্তান জঙ্গিদের অর্থ সাহায্য করে চলছে বলে। পাকিস্তান মাত্র পাঁচ বছর আগেও আমাদের দেশের জঙ্গিদের অর্থায়ন করে ধরা পড়ার পর দুইজন পাকিস্তানি কূটনীতিককে বহিষ্কার করা হয়।'

এজন্য শুধু কি বৈষম্য, অত্যাচার আর নিষ্ঠুরতার জন্যই পাকিস্তান ক্ষমা চাইবে? মুক্তিযুদ্ধে সংঘটিত হত্যা, ধর্ষণ আর দোসর সৃষ্টির মাধ্যমে বাঙালি জাতিকে অত্যাচারিত রাখার যে নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্র ১৯৭১ সালে পাকিস্তানিরা করেছে, তা আজও অব্যাহত আছে। বঙ্গবন্ধু হত্যা থেকে অব্যাহত চেষ্টায় শেখ হাসিনাকে হত্যার সব ষড়যন্ত্রের পেছনে পাকিস্তানের হাত আছে বলে তথ্য পাওয়া যায়। পাকিস্তানের অপরাধের ঝুড়ি এত বোঝাই যে বাংলাদেশের কাছে তাকে ক্ষমা চাইতে সেসব অপরাধের তালিকা একটি একটি করে তৈরি করে তাকে নিজে থেকেই বিশ্বদরবারে পাঠাতে হবে। আর সবচেয়ে বড়ো কথা, ক্ষমার আগে অপরাধের প্রতিশ্রুত বিচার তো হতে হবে, বিচারের পরেই না ক্ষমার আলোচনা হওয়ার কথা!

আমাদের দেশের একশ্রেণির বুদ্ধিজীবী 'পাকিস্তানের উপলব্ধি'র প্রতি সম্মান জানিয়ে বাংলাদেশের ক্ষমা করে দেওয়া উচিত হবে বলে ইনিয়ে-বিনিয়ে বলার চেষ্টা করছেন। তাদের এক্ষুনি থামিয়ে দেওয়া উচিত। সময়ের কাজ সময়ে না করলে এই শ্রেণি ফুলেফেঁপে বিষধর হবে, সে পটভূমি আমাদের দেখা ও জানা। আমরা খুব ভালো করে ইতিহাসের পাতা থেকে জানি, চীন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিরোধিতা করেছে, এমনকি জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যপদ পেতেও বাধা দিয়েছে। সেই চীন ১৯৭১ সালে পাকিস্তানকে হাতে নিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের বিরোধিতা করেছে, তারাই আজ বাংলাদেশের বন্ধু হওয়ার চেষ্টা করছে। শেখ মুজিবের দেশের মানুষ এত বোকা নয় যে এই ভূরাজনীতির খেলা এখন সে আর বোঝে না!

পাকিস্তান বাংলাদেশের কাছে ১৯৪৭ থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত করা তার সব অপরাধের জন্য যদি ক্ষমা চায়ও, এ প্রতিশ্রুতি কি সে দিতে পারবে ২০২২ সালের পর থেকে সে আর কোনোদিন বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সামান্য ষড়যন্ত্রে অংশ নেবে না? ইতিহাস বলছে, সে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার শক্তি, সামর্থ্য বা মানবিক ও নৃতাত্ত্বিক গুণ বা বৈশিষ্ট্য কোনোটাই পাকিস্তানের নেই, কখনোই ছিল না–তাই তাকে ক্ষমা করার প্রশ্নই ওঠে না। আর এ সিদ্ধান্ত স্বাধীনভাবে নেওয়ার শক্তি ও সামর্থ্য স্বাধীন বাংলাদেশের জনগণের আছে।

লেখক: পরিচালক, আমাদের গ্রাম গবেষণা প্রকল্প

নিরস্ত্র হাতে এক সশস্ত্র লড়াইয়ের কথা

মেজর জেনারেল (অব.) সুবিদ আলী ভূঁইয়া

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের এক অনন্য অধ্যায় 'কুমিরার যুদ্ধ'। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার পর এটাই পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রথম যুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধের টার্নিং পয়েন্টখ্যাত এই যুদ্ধটি সংঘটিত হয় ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ সন্ধ্যায়। বঙ্গবন্ধুর পক্ষে জিয়াউর রহমানের ২৭ মার্চের আলোচিত ঘোষণা পাঠের একদিন আগে। ইতিহাসের জ্বলন্ত সাক্ষী এই লড়াইয়ের নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ হয়েছিল আমার। সেদিন একটি হেভি মেশিনগান ও কয়েকটি লাইটগান এবং রাইফেল নিয়ে পাকিস্তানি বাহিনীর একটি শক্তিশালী ব্যাটালিয়নের মুখোমুখি হয়েছিলাম আমরা মাত্র ১০২ জন যোদ্ধা। যাদের মধ্যে সিভিলিয়নও রয়েছেন। এই যুদ্ধে লে. কর্নেল শাহপুর খান বখতিয়ারসহ পাকিস্তানি বাহিনীর ১৫২ জন সেনা নিহত হয়। তাদের ক্ষয়ক্ষতিও হয় ব্যাপক। কুমিরার এই যুদ্ধটি সেনাবাহিনীর বিভিন্ন শিক্ষা কোর্সে পড়ানো হয়। এমনকি ঢাকার সেনানিবাসে সেনাকুঞ্জের বিজয়কেতনের ডিসপ্লে বোর্ডে এই যুদ্ধের নানা দিকের কথা উল্লেখ রয়েছে।

দিনটি ছিল ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ। ইচ্ছে ছিল সন্ধ্যার আগেই ক্যান্টনমেন্ট দখল করব। কিন্তু জানতে পারলাম শত্রুপক্ষের শক্তি বৃদ্ধির জন্য কুমিল্লা থেকে ২৪নং এফএফ রেজিমেন্ট এগিয়ে আসছে। এটা কীভাবে প্রতিরোধ করব, সেই ভাবনাই আমাকে পেয়ে বসল। সকাল থেকেই অস্ত্র ও সৈন্য জোগাড় করতে করতেই বিকাল ৫টা বেজে যায়। ২৪নং এফএফকে প্রতিহত করার জন্য কুমিল্লার দিকে অগ্রসর হলাম। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং ইপিআর-এর মাত্র ১০২ জন সৈন্য নিয়ে অভিযানে বের হলাম। আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর মোকাবিলা করার জন্য আমাদের সম্বল মাত্র একটা হেভি মেশিনগান, বাকি সব

রাইফেল। এত অল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে পুরো একটা সুসংগঠিত ব্যাটালিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাওয়ার ঝুঁকি যে কী ভয়াবহ এবং এর পরিণাম যে কী মারাত্মক হতে পারে, সেদিন তা উপলব্ধি করতে পারি-নি। কোনো প্রত্যক্ষ লড়াইয়ে এর আগে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অভিজ্ঞতা নেই বলেই যে এত বড়ো একটা ঝুঁকির পরিণাম উপলব্ধি করতে পারিনি তা নয়, আসলে মনটা ছিল প্রতিশোধের স্পৃহায় উন্মত্ত। ক্ষোভে, ক্রোধে ও আবেগে উত্তেজিত। তাই ঠান্ডামাথায় আগ-পিছ বিবেচনা করে পরিকল্পনা করার সুযোগ ছিল না। অন্যকিছু না থাকলেও যুদ্ধের সবচেয়ে বড়ো যে বিষয়টি প্রয়োজন, সেই সাহস, সেই উদ্দীপনা, সেই আকাঙ্ক্ষা আমাদের ছিল। আমাদের এই দৃঢ় মনোবল ও আত্মবিশ্বাস সেদিন মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার শক্তি জুগিয়েছিল।

আগেই খবর পেয়েছিলাম শত্রুবাহিনী ফেনীর কাছে শুভপুরের ব্রিজ পেরিয়ে এগিয়ে আসছে। তাই যত দ্রুত তাদের গতি প্রতিহত করা যায়, ততই আমাদের জন্য মঙ্গল। আমার কথামতো স্থানীয় আওয়ামী লীগের কয়েকজন কর্মী পাঁচটি ট্রাক এনে হাজির করল। তখন আমার সৈন্য ও সুতরাং যখনই তারা দেখতে পেল খাকি পোশাক পরা ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ইপিআর-এর জওয়ানরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য এগিয়ে যাচ্ছে, তখন তারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল। মুহুর্মুহু তারা স্লোগান দিতে লাগল 'জয় বাংলা'।

আমাদের সৈন্যবোঝাই ট্রাকগুলো তখন ধীরে ধীরে এগিয়ে চলছে। এমন সময় একজন বুড়ো তার পথের পাশে দোকান থেকে তিন কার্টন সিগারেট নিয়ে এসে আমার হাতে তুলে দিল। বলল, স্যার, আমি গরিব মানুষ, কিছু দেওয়ার মতো আমার ক্ষমতা নেই, এই নিন আমার দোকানের সিগারেট, আপনার জওয়ানদের মধ্যে বিলিয়ে দিন। বৃদ্ধের এই সহানুভূতি ও আন্তরিকতায় আমার মন ভরে উঠল। আরেকজন একটি ট্রাকে করে প্রায় এক ড্রাম কোকাকোলা নিয়ে এলো। কেউ কেউ খাদ্যসামগ্রীও নিয়ে এলো। তাদের এই আন্তরিকতা ও ভালোবাসা আমাদের আনন্দে উদ্‌বেল করে তুলল। কেমন করে কীভাবে তারা সেসব জিনিস সেই দিন সংগ্রহ করেছিল, তা ভাবলে আজও অবাক লাগে।

একজন বুড়ো তার পথের পাশে দোকান থেকে তিন কার্টন সিগারেট নিয়ে এসে আমার হাতে তুলে দিল। বলল, স্যার, আমি গরিব মানুষ, কিছু দেওয়ার মতো আমার ক্ষমতা নেই, এই নিন আমার দোকানের সিগারেট, আপনার জওয়ানদের মধ্যে বিলিয়ে দিন

জনসাধারণের মধ্যে প্রত্যেকেরই যেন একটা যুদ্ধংদেহী মনোভাব। তাদের চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল যেন দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত বেদনা, বঞ্চনা, ক্ষোভ, আক্রোশ, বিদ্রোহের আগুনে ফুঁসে উঠেছে, যা এক দুর্জয় সংগ্রামের ভেতর দিয়েই যেন স্ফুরিত হতে চায়। ২৩ বছরের পাকিস্তানি শোষণ ও অত্যাচার থেকে রেহাই পেতে আজ সবাই যেন বদ্ধপরিকর।

আমি আমার দলের সবাইকে চারটি ট্রাকে উঠালাম আর অন্য একটি ট্রাকে গুলির বাক্স উঠিয়ে দিলাম। আমি নিজে একটা মোটরসাইকেলে চড়ে সবার আগে চললাম। উদ্দেশ্য–এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে পথের দুপাশে এমন একটি সুবিধাজনক স্থান খুঁজে নেওয়া, যেখান থেকে শত্রুর ওপর সঙ্গে সঙ্গে আঘাত হানা যায়। শুভপুরের উদ্দেশে সেদিন আমাদের যাত্রাপথের দৃশ্য ভোলার নয়। রাস্তার দুপাশে শত শত মানুষের ভিড়। তাদের মধ্যে কলকারখানার শ্রমিকই বেশি। মুখে তাদের নানান স্লোগান, সেই হাজারো কণ্ঠে আকাশ-বাতাস মুখরিত হচ্ছিল। গত রাতে শহরের বিভিন্ন স্থানে ইয়াহিয়ার লেলিয়ে দেওয়া বর্বরবাহিনী অতর্কিত আক্রমণ, নির্মম হত্যা, বিশেষ করে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের জওয়ানদের পাশবিকভাবে হত্যা করার খবর এরই মধ্যে প্রত্যেক মানুষের কানে পৌঁছে গেছে। যে কোনোভাবে এই বিশ্বাসঘাতকতার উপযুক্ত জবাব দেওয়ার জন্য যেন তারা প্রস্তুত।

সন্ধ্যা ৬টা। আমরা কুমিরায় পৌঁছে গেলাম। শত্রুকে বাধা দেওয়ার জন্য স্থানটি খুবই উপযুক্ত মনে হলো। পথের ডানে পাহাড় এবং বামদিকে আধা মাইল দূরে সমুদ্র। শত্রুর ডানে এবং বামে প্রতিবন্ধক, সেজন্য শত্রুকে এগোতে হলে পাকা রাস্তা দিয়েই আসতে হবে। তাই সেখানেই পজিশন নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমি যেখানে পজিশন নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিই, এর পেছনে একটি খাল। ওই খাল থেকে ৪০০/৫০০ গজ সামনে অর্থাৎ উত্তরদিকের জায়গা বেছে নিই। খালটা কোনো পদাতিক বাহিনীর জন্য তেমন কোনো বাধা নয়। উদ্দেশ্য ছিল যদি শত্রু আমাদের বর্তমান পজিশন ছাড়তে বাধ্য করে, তখন খালের পেছনে গিয়ে পজিশন নিতে পারব। এটা ছিল আমার বিকল্প পরিকল্পনা। এলাকাটা দেখে কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রতিরোধের (অ্যাম্বুশ) পরিকল্পনা তৈরি করে নিলাম। স্থির করলাম ১নং প্লাটুন ডানে, ২নং প্লাটুন বামে এবং ৩নং প্লাটুন আমার সঙ্গেই থাকবে। তিনজন প্লাটুন কমান্ডারকে ডেকে খুব সংক্ষেপে আমার পরিকল্পনার কথা জানালাম এবং নিজ নিজ স্থানে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পজিশন নিতে নির্দেশ দিলাম। আমার নির্দেশ অনুযায়ী হেভি মেশিনগানটি পাশে পাহাড়ের ঢালুতে ফিট করা হলো। ইপিআর সুবেদার নিজে ভারী মেশিনগানটির সঙ্গে রইল। কারণ, এই ভারী মেশিনগানটি ছিল

আমাদের প্রধান হাতিয়ার এবং সবচেয়ে বড়ো সম্পদ। আমি বামদিকের কয়েকটি এলএমজি পজিশন ঠিক করে দিলাম। নির্দেশ মতো সবাই পজিশন নিয়ে নিল। পজিশনের অবস্থাটা হলো অনেকটা ইংরেজি ইউ অক্ষরের মতো। অর্থাৎ ডানে-বাঁয়ে এবং পেছনে আমাদের সৈন্য। যেদিক থেকে শত্রু এগিয়ে আসছে, কেবল সেই সামনের দিকটাই খোলা।

কুমিরা পৌঁছেই মোটরসাইকেলে একটা যুবককে আমরা পাঠিয়ে ছিলাম শত্রুর অগ্রগতি সম্পর্কে খবর নিতে। এরই মধ্যে সে খবর নিয়ে এসেছে যে শত্রু আমাদের অবস্থানের আর বেশি দূরে নেই। মাত্র চার-পাঁচ মাইল দূরে। তবে তারা ধীরে ধীরে গাড়ি চালিয়ে আসছে। যে লোকটাকে পাঠিয়েছিলাম, সে পাঞ্জাবিদের কাছে গিয়ে রাস্তার পাশের একটি দোকান থেকে সিগারেট কিনে ফিরে এসেছে। সে আমাকে জানাল, পাঞ্জাবিদের পরনে কালো বেল্ট, কাঁধে কালো ব্যাজ এবং কী যেন একটা কাঁধের ওপর, তা-ও কালো। তখন আমি নিশ্চিত হলাম যে, ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের সৈন্যরাই এগিয়ে আসছে, কারণ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের সদস্যরাই কেবল কালো বেল্ট, কালো ব্যাজ ব্যবহার করে থাকে। আমাদের অবস্থানের ৭০/৮০ গজ দূরে একটা বড়ো গাছ ছিল। স্থানীয় লোকদের সাহায্য নিয়ে গাছের মোটা ডালটা কেটে রাস্তার ঠিক মাঝখানে ফেললাম। গাছের ডাল দিয়ে রাস্তার ওপর একটা ব্যারিকেড সৃষ্টি করলাম। রাস্তার আশপাশ থেকে কিছু ইট এনে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রাখলাম।

এত অল্প সময়ে জনসাধারণ কীভাবে গাছের মোটা ডালটা কেটে ও ইট সংগ্রহ করে ব্যারিকেড সৃষ্টি করল, আজ তা ভাবতে অবাক লাগে। সৈন্যদের জানিয়ে দেওয়া হলো, শত্রুসৈন্য যখন ব্যারিকেড সরানোর জন্য গাড়ি থেকে নামবে এবং একত্রিত হবে, তখন আমার ফায়ার করার সঙ্গে সঙ্গে সবাই একযোগে শত্রুর ওপর গুলি ছোড়া শুরু করবে। বিশেষ করে ভারী মেশিনগানটা দিয়ে অবিরাম ফায়ার করবে।

প্রায় এক ঘণ্টা শত্রুর প্রতীক্ষায় কেটে গেল। সন্ধ্যা তখন প্রায় সাতটা। আমরা শত্রুর অপেক্ষায় ওত পেতে আছি। আমাদের সামনে শত্রু বাহিনীর উপস্থিতি প্রায় আসন্ন বলে মনে হলো। দেখলাম তারা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। ব্যারিকেড দেখে সামনের গাড়িগুলো থেমে গেল। কয়েকজন সিপাহি গাড়ি থেকে নেমে ব্যারিকেডের কাছে এলো। ওদের কেউ কেউ ইটগুলো তুলে দূরে ফেলে দিতে লাগল। পেছনের গাড়িগুলোর তখন সামনে এগিয়ে এসে জমা হতে লাগল।

শত্রুরা যখন ব্যারিকেড সরাতে ব্যস্ত, তখনই আমি প্রথম গুলি ছুড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ডানদিকের ভারী মেশিনগানটি গর্জে উঠল। শুরু হলো শত্রুনিধন। চারদিক থেকে কেবল গুলি আর গুলি। ভারী মেশিনগান থেকে মাঝে মাঝে উজ্জ্বল ট্রেসার রাউন্ড বের হচ্ছে।

আমাদের আকস্মিক আক্রমণে শত্রুপক্ষ হতচকিত। ওদের সামনের কাতারের অনেকেই আমাদের গুলির আঘাতে লুটিয়ে পড়ল। সে কী ভয়াবহ দৃশ্য! তাদের কাতর আর্তনাদ আমাদের কানে আসছিল। আর যারা দিশেহারা হয়ে এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করছিল, তারাও মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই শত্রুদের পেছনের সৈন্যরা এ অবস্থা সামলে নিয়ে মেশিনগান, মর্টার এবং আর্টিলারি থেকে অবিরাম গোলাবর্ষণ শুরু করল।

এভাবে কতক্ষণ চলল। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও শত্রুরা আমাদের প্রতিরোধ ভাঙতে পারল না। তাদের সৈন্যবোঝাই তিনটি ট্রাকে আগুন ধরে গেল। আমাদের মেশিনগানটা 'নিউট্রালাইজ' করার জন্য তারা প্রচুর পরিমাণে আর্টিলারি গোলা নিক্ষেপ করতে লাগল। কিন্তু আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে শত্রুর সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়। প্রায় দুই ঘণ্টা প্রাণপণ লড়ে তারা শেষ পর্যন্ত দুই ট্রাক অস্ত্র ফেলে পিছু হটতে বাধ্য হয়। পড়ে রইল তাদের অনেকগুলো নিথর দেহ।

এই ঘটনাটি আজ থেকে প্রায় ৫১ বছর আগের। এখন স্থানীয়ভাবে দিবসটি পালন করা হয়। আমি কয়েকবার সেখানে স্থানীয় অনুষ্ঠানে গিয়েও ছিলাম। জানি না এই যুদ্ধে অংশ নেওয়া বীর সেনারা আজ কে কোথায় আছেন, কেমন আছেন, কজনই বা বেঁচে আছেন। যারা বেঁচে আছেন, কীভাবে বেঁচে আছেন! চাকরিজীবনে দু-একজনের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হতো। কাউকে কাউকে ব্যক্তিগত সহায়তা করার চেষ্টা করেছি। এখন আর কারও সঙ্গে যোগাযোগ হয় না। তবে এখনো স্মৃতি হাতড়ে বেড়াই। এত বছর পরও এই স্মৃতি চোখে জ্বলজ্বল করে। ভাবলে এখনো শিহরিত হই। মনে হয় সেই ২৬ বছরের যুবক আমি। এখনো যেন শত্রুর বিরুদ্ধে লড়ে যাচ্ছি।

লেখক: সভাপতি, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

স্বাধীন বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির পটভূমি

ড. কামরুল হক

বাঙালি জাতির হাজার বছরের সংগ্রামের ইতিহাসের সবচেয়ে বড়ো অর্জন মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। সুদীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এই সংগ্রামের নেতৃত্ব দেন বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতিতত্ত্বভিত্তিক কৃত্রিম রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ ২৩ বছর পর অনুষ্ঠিত হয় প্রথম সাধারণ নির্বাচন। নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা দেওয়া হয়নি।

সুদীর্ঘ ২৩ বছর ধরে পরিচালিত বাঙালির ওপর শোষণ-নির্যাতন ও বাঙালিকে বিকশিত হতে না দেওয়ার ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে। পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী বাঙালিকে রাষ্ট্র পরিচালনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করতে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে। এর প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে অভূতপূর্ব ঐক্য নিয়ে বাঙালি জাতি ইতিহাসে অনন্য ও শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা করে। অধিকার রক্ষার মরণপণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে জাতিকে প্রস্তুত করে ৭ মার্চ ১৯৭১ তাঁর ইতিহাস সৃষ্টিকারী ভাষণে বঙ্গবন্ধু আহ্বান জানান: 'প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল'। ভাষণের সমাপ্তিতে তিনি উচ্চারণ করেন অমোঘ বাণী: 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। স্বাধীনতাসংগ্রামের এই ডাক ছিল দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক আন্দোলনের চূড়ান্ত পরিণতি।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতের অন্ধকারে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাঙালি নিধনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা ঢাকায় অজস্র সাধারণ নাগরিক, ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, পুলিশ ও

ইপিআর সদস্যকে হত্যা করে। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। স্বাধীনতার ঘোষণায় তিনি সর্বস্তরের জনগণকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান। স্বাধীনতার ঘোষণায় বঙ্গবন্ধু বলেন:

> এটাই হয়তো আমার শেষ বার্তা। আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। বাংলাদেশের মানুষ যে যেখানে আছেন, আপনাদের যা কিছু আছে তা দিয়ে সেনাবাহিনীর দখলদারির মোকাবিলা করার জন্যে আমি আহ্বান জানাচ্ছি। পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকে বাংলাদেশের মাটি থেকে উৎখাত করা এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আপনাদেরকে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।

স্বাধীনতা ঘোষণার অব্যবহিত পর জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নির্দেশে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়। নিয়ে যাওয়া হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। আটকে রাখা হয় কারাগারে।

মুজিবনগর সরকার ও স্বীকৃতির জন্য তৎপরতা

বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার পর শুরু হয়ে যায় মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা ও বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠনের আবশ্যিক উপাদান হিসাবে সরকার গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ভারত সরকারের সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন ভারতে আশ্রয় নেওয়া আওয়ামী লীগের নেতারা। এই লক্ষ্যে একটি প্রতিনিধিদল দিল্লিতে যায় এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীসহ কেন্দ্রীয় সরকারের বেশ কয়েকজন নেতার সঙ্গে গোপনে বৈঠক করেন। ১৯৭১ সালের ৫ এপ্রিল এ সংক্রান্ত খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়:

> নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে যে, আজ ভারত সরকার ও বাঙলাদেশের অস্থায়ী সরকারের প্রতিনিধিদের মধ্যে সরকারী পর্যায়ে পৃথক বৈঠক হয়েছে। শেখ মুজিবর রহমানের চারজন দূত (এদের দুইজন শিক্ষাবিদ এবং অপর দুইজন পূর্ববঙ্গের বিধানসভার সদস্য) গতকাল দিল্লী পৌঁছেছেন এবং কয়েকজন বন্ধুর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের কতিপয় প্রবীণ নেতার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছেন। বাঙলাদেশের ও ভারত সরকারের প্রতিনিধিদের মধ্যে বৈঠক হয়েছে বটে, কিন্তু বৈঠকের স্থান ও আলোচিত বিষয়বস্তু অত্যন্ত গোপন রাখা হয়েছে। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে যে, শেখ মুজিবের দূতদের সঙ্গে বাঙলাদেশের অস্থায়ী সরকারের পক্ষ থেকে স্বাক্ষরিক পরিচয়পত্র ছিল। শেখ মুজিবর রহমানের দূতদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। নিরাপত্তার প্রশ্নে তাঁরা নয়াদিল্লীতেই কোথাও ছদ্মনামে অবস্থান করবেন। জানা গেছে যে, ভারত সরকারের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনার সময় তারা বাংলাদেশকে অবিলম্বে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে স্বীকৃতির জন্য চাপ দিয়েছেন এবং অস্ত্র, গোলাবারুদ ও ঔষধপত্র সরবরাহের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। আরও জানা গেছে যে, তাঁরা বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতির বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন এবং এই মর্মে আশ্বাস দিয়েছেন যে, সংগ্রাম বিলম্বিত হলেও শেষ পর্যন্ত মুক্তি ফৌজের জয় নিশ্চিত। বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলটি দিন দুই দিল্লী থাকার সম্ভাবনা। অতঃপর তাঁরা স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পথে পশ্চিম বাংলায় যাবেন।

একই দিন অর্থাৎ ১৯৭১ সালের ৫ এপ্রিল আওয়ামী লীগের একজন মুখপাত্রের বরাত দিয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশিত অপর এক খবর থেকে জানা যায়, আওয়ামী লীগ নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের নিয়ে একটি জনপ্রিয় সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই খবরে লেখা হয়:

> সমস্ত দল ও মতের প্রতিনিধিদের নিয়ে মুক্ত বাংলাদেশে শীঘ্রই একটি জনপ্রিয় সরকার গঠিত হবে। বস্তুত কয়েকটি বড় ছাউনী ও বিমানঘাঁটি ব্যতীত সমগ্র পূর্ববঙ্গ এখন আওয়ামী লীগের আয়ত্তাধীন। আওয়ামী লীগ আজ একটি স্থায়ী রাজধানীসহ একটি জনপ্রিয় সরকার প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আজ রাতে আওয়ামী লীগের জনৈক বিশিষ্ট মুখপাত্র বলেন যে, দুই একদিনের মধ্যেই প্রাদেশিক বিধানসভায় নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ বাংলাদেশে এক বৈঠকে মিলিত হয়ে একটি প্রতিনিধিমূলক জনপ্রিয় সরকার গঠনের ব্যাপারে বিস্তারিত কর্মসূচী স্থির করবেন।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষিত হওয়ার দুই সপ্তাহের মধ্যেই গঠিত হয় যুদ্ধকালীন মুজিবনগর সরকার তথা স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার। মুজিবনগর সরকার গঠনের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে গিয়ে অধ্যাপক মো. জাকির হোসেন লিখেছেন:

> ১৯৭১ সালের ৩ এপ্রিল দিল্লিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে তাজউদ্দীন আহমদ বৈঠক করেন। বৈঠককালেই তাজউদ্দীন আহমদ মনস্থির করেছিলেন, মার্চে অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব দলের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও চার সহসভাপতিকে নিয়ে যে হাইকমান্ড গঠন করেছিলেন সে আদলেই সরকার গঠন করবেন। ইন্দিরা গান্ধীও সরকার গঠনের পরামর্শ দিয়ে বলেন, বাংলাদেশের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা এমন একটি সিদ্ধান্ত নিলে ভারত সরকার ও বিশ্ব সম্প্রদায়ের তাদের পাশে দাঁড়ানোর একটি আইনগত ভিত্তি সৃষ্টি হবে। দিল্লি থেকে ফিরে তাজউদ্দীন আহমদ দ্রুত সরকার গঠনের লক্ষ্যে দলের অন্যান্য কেন্দ্রীয় নেতাদের খোঁজে বের হন। কেন্দ্রীয় নেতাদের অনেকেই তখন কলকাতায় পৌঁছে গিয়েছেন। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল নির্বাচিত সাংসদেরা (এমএনএ এবং এমপিএ) ভারতের আগরতলায় একত্র হয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠন করেন।

১৯৭১ সালের ১৩ এপ্রিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার গঠনের কথা ঘোষণা করা হয়। এই বেতার কেন্দ্র থেকে এক ঘোষণায় বাংলাদেশ সরকার স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য বিশ্বের সব গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতি আহ্বান জানায় এবং বাংলাদেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্যও আবেদন জানানো হয়। ১৪ এপ্রিল সংবাদপত্রে প্রকাশিত এবিষয়ক খবরে লেখা হয়:

> আজ স্বাধীন বাঙলাদেশ বেতার কেন্দ্র থেকে প্রজাতন্ত্রী সরকার গঠনে কথা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে সরকার একটি ঘোষণায় ভারত, সিংহল এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিকে স্বাধীন বাঙলাদেশে সরকার গঠন সম্পর্কে অবহিত হবার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। স্বাধীন বাঙলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার এবং তার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য এই সকল রাষ্ট্রের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে। স্বাধীনতা রক্ষার উদ্দেশ্যে বাঙলাদেশের সাড়ে ৭ কোটি অধিবাসীকে প্রয়োজনীয় সাহায্য দেওয়ার জন্য সরকার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির কাছে আবেদন জানিয়েছেন। স্বাধীন বাঙলাদেশ সরকার একটি সনদের চূড়ান্ত রূপ দিচ্ছেন। এই সনদে নতুন প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য নির্দিষ্ট করা হবে বলে আজ সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠসূত্রের খবরে জানা যায়।

১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল নবগঠিত বাংলাদেশ সরকার শপথ গ্রহণ করে ১৭ এপ্রিল। এই দিন বাংলাদেশ ভূখণ্ডের মুক্তাঞ্চল মেহেরপুর জেলার তৎকালীন বৈদ্যনাথতলা গ্রামে প্রথম প্রকাশ্যে জনসমক্ষে আসে এই সরকার। শতাধিক গণমাধ্যমকর্মীর মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে। এর মাধ্যমে সারা বিশ্বে পৌঁছে যায় এই খবর। বাংলাপিডিয়ায় প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী:

মুজিবনগর সরকার মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য গঠিত বাংলাদেশের প্রথম সরকার। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণার পর ১০ এপ্রিল এ সরকার গঠিত হয়। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলা গ্রামে মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে বৈদ্যনাথতলা গ্রামের নামকরণ হয় মুজিবনগর। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন আবদুল মান্নান এমএনএ এবং স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন অধ্যাপক ইউসুফ আলী এমএনএ। নবগঠিত সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে এখানে গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়। ১৭ এপ্রিল সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হলেও মন্ত্রীদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন হয় ১৮ এপ্রিল। মুজিবনগর সরকারকে ১৫টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগে ভাগ করা হয়। এছাড়া কয়েকটি বিভাগ মন্ত্রিপরিষদের কর্তৃত্বাধীনে থাকে।

১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল নবগঠিত স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের খবর আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়। ১৮ এপ্রিল ভারতীয় সংবাদপত্রেও এই খবর প্রকাশিত হয়:

> ‘জাতি হিসেবে বাঙালী জেগে উঠেছে। পৃথিবীর কোন শক্তি নেই বাঙালীর এই জয়যাত্রায় বাধা দিতে পারে।’–স্বাধীন বাঙলা সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এখানে দশ হাজার মানুষের এক প্রকাশ্য জমায়েতে একথা ঘোষণা করেন। স্বাধীন বাঙলার সশস্ত্র সৈনিক, দেশভক্ত নাগরিক আর বিভিন্ন দেশের শতাধিক সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বলেন, ‘প্রান্তরে প্রান্তরে, হাটে-বাজারে, শহরে-গঞ্জে বাঙালী লড়ছে। অকাতরে আমরা রক্ত দিচ্ছি পরাজিত হবার জন্যে নয়। এ-যুদ্ধ আমাদের স্বাধীনতার, আমাদের অস্তিত্বের যুদ্ধ, এ যুদ্ধে আমরা জিতবই।’ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি জানান, গত ২৫শে মার্চ তাঁদের সরকার গঠিত হয়। গঠন করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান, সাড়ে সাত কোটি বাঙালী যাঁকে এক বাক্যে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে মেনে নিয়েছে। এতদিন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে কিংবা খবরের কাগজের পাতায় মুজিব সরকারের ঘোষণা প্রচারিত হয়েছে। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যরা নতুন রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের শপথ নিয়েছেন লোকচক্ষুর অন্তরালে। জনপ্রতিনিধিদের আনুষ্ঠানিক সভাতেও বাইরের কাউকে ডাকা হয়নি। আজ সর্বপ্রথম বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রপ্রধান ও মন্ত্রীরা প্রকাশ্যে আত্মপ্রকাশ করলেন। শতাধিক সাংবাদিক এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, তাই ইতিমধ্যেই নতুন সরকারের ঘোষণা বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছে গেছে।

মুজিবনগর সরকারের গুরুত্বপূর্ণ একটি মন্ত্রণালয় ছিল পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রাপ্তিসহ বৈদেশিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য সরকার গঠনের শুরুতেই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ও গঠন করা হয়। এ প্রসঙ্গে ‘বাংলাদেশ ১৯৭১’ গ্রন্থে সাংবাদিক-গবেষক আফসান চৌধুরী লিখেছেন:

> অভ্যন্তরীণ যুদ্ধ পরিচালনা, মুক্তিবাহিনীর প্রশিক্ষণ, ত্রাণ ও পুনর্বাসন, তথ্য ও প্রচারসহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি সরকারকে বিদেশের সহায়তা নিতে হয়েছে সঙ্গত কারণেই। আবার দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বিদেশের সমর্থন ও বাংলাদেশকে বিভিন্ন দেশের স্বীকৃতির বিষয়টিও জরুরি ছিল। ফলে সরকারকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছে সরকার গঠন প্রক্রিয়ার শুরুতেই।

স্বাধীন বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিপ্রাপ্তির জন্য মুজিবনগর সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। এই মন্ত্রণালয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মিশন স্থাপন করে। কূটনীতিক প্রতিনিধি পাঠায়। বাংলাপিডিয়ায় এ বিষয়ে বেশকিছু তথ্য প্রকাশিত হয়েছে:

দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বিদেশের সমর্থন ও বাংলাদেশকে বিভিন্ন দেশের স্বীকৃতির বিষয়টিও জরুরি ছিল। ফলে সরকারকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছে সরকার গঠন প্রক্রিয়ার শুরুতেই

> পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যুদ্ধের সময় বিদেশে বাংলাদেশ মিশন স্থাপন করে এবং বিভিন্ন দেশে কূটনৈতিক প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে বহির্বিশ্বের সরকার ও জনগণের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করে এ মন্ত্রণালয়। এ লক্ষ্যে কলকাতা, দিল্লি, লন্ডন, ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক, স্টকহোম প্রভৃতি স্থানে কূটনৈতিক মিশন স্থাপন করা হয় এবং জাতিসংঘ, আফগানিস্তান, সিরিয়া, লেবানন, নেপাল, শ্রীলংকা, বার্মা, থাইল্যান্ড, জাপান প্রভৃতি দেশের সমর্থন আদায়ের জন্য কূটনৈতিক প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে। এছাড়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির জন্য বিভিন্ন দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে এ মন্ত্রণালয় থেকে পত্র প্রেরিত হয়। বিদেশে বাংলাদেশ মিশনগুলোর প্রধান ছিলেন কলকাতায় হোসেন আলী, দিল্লিতে হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী, ইউরোপে বিশেষ প্রতিনিধি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, ওয়াশিংটনে এম আর সিদ্দিকী। স্টকহোমে আবদুর রাজ্জাক বাংলাদেশ মিশনের প্রতিনিধিত্ব করেন।

স্বাধীনতার জন্য বঙ্গবন্ধুর উদাত্ত আহ্বানে দেশের সব শ্রেণি-পেশার মানুষ মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। বিদেশে কর্মরত অনেক বাঙালি কূটনীতিক এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের অবস্থান থেকে।

মুক্তিযুদ্ধ শুরুর অব্যবহিত আগে তারা পাকিস্তান মিশনে কর্মরত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তাঁরা মুজিবনগর সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন এবং স্বাধীন বাংলাদেশের স্বীকৃতির জন্য তৎপর হন।

মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের পক্ষে সর্বপ্রথম আনুগত্য প্রকাশকারী দুজন কূটনীতিকের একজন কে এম সেহাবউদ্দিন। তাঁর রচিত 'There and Back Again: A Diplomat's Tale' গ্রন্থে 'Declaration of Allegiance to Bangladesh in Missions Abroad by November 1971' শিরোনামে বিদেশে মিশনে কর্মরত আনুগত্য প্রকাশকারী কূটনীতিকদের একটি তালিকা প্রকাশ করেন। এই তালিকা থেকে জানা যায়, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ১৯৭১ সালের নভেম্বরের মধ্যে বিদেশে ১৯টি মিশনের ১১৫ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। তাদের মধ্যে নয়াদিল্লিতে ১৩, কলকাতায় ৬৫, ওয়াশিংটনে ১৩, লন্ডনে ৫ জন; নিউইয়র্ক, প্যারিস, বন ও টোকিওতে ২ জন করে এবং বাগদাদ, হংকং, স্টকহোম, লাগোস, ম্যানিলা, ব্রাসেলস, মাদ্রিদ, বৈরুত, কাঠমান্ডু, বুয়েন্স আয়ার্স ও কায়রোতে ১ জন করে।

সাবেক কূটনীতিক ও পররাষ্ট্র সচিব সৈয়দ মোয়াজ্জেম আলী মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ১৯৭১ সালের ৩০ জুন ওয়াশিংটনে মুজিবনগর সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধকালে বিভিন্ন রাষ্ট্রের বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশকারী কূটনীতিকদের মুক্তিযোদ্ধা কূটনীতিক হিসাবে অভিহিত করেছেন। সৈয়দ মোয়াজ্জেম আলী লিখেছেন:

> মুজিবনগরের বাংলাদেশ সরকার গঠনের আগে যে দুজন কূটনীতিক বাংলাদেশের পক্ষে সর্বপ্রথম আনুগত্য প্রদর্শন করেন, তারা হচ্ছেন নয়াদিল্লির পাকিস্তানের হাইকমিশনের দ্বিতীয় সচিব কে এম সেহাবউদ্দিন ও সহকারী প্রেস অ্যাটাশে আমজাদুল হক। তারা এ ঘোষণা দিলেন এপ্রিল মাসে। নভেম্বরে কাউন্সিলর হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী ও অন্যান্য স্টাফও আনুগত্য প্রকাশ করেন। কিন্তু ভারতে আমাদের কূটনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু ছিল কলকাতায়। ১৮ এপ্রিল ১৯৭১ অর্থাৎ সরকার গঠনের একদিন পর কলকাতার পাকিস্তানের ডেপুটি হাইকমিশনার মোহাম্মদ হোসেন আলী এবং সব বাঙালি কূটনীতিক ও স্টাফ একযোগে বাংলাদেশের পক্ষে আনুগত্য জানান। রাতারাতি সেখানে স্থাপিত হলো বাংলাদেশ মিশন। পাকিস্তানের পতাকা নামিয়ে বাংলাদেশের পতাকা উঠালেন হোসেন আলী। তার অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। অন্য কর্মকর্তা যারা তাকে সহযোগিতা করেন তারা হলেন প্রথম সচিব রফিকুল ইসলাম, তৃতীয় সচিবদ্বয় আনোয়ারুল করীম চৌধুরী ও কাজী নজরুল ইসলাম এবং সহকারী প্রেস সচিব মকসুদ আলী।

১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণের পরদিন ১৮ এপ্রিল কলকাতার পাকিস্তান ডেপুটি হাইকমিশন অফিসের সব বাঙালি কর্মকর্তা-কর্মচারী একযোগে আনুগত্য প্রকাশ করে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি। এর নেতৃত্ব দেন ডেপুটি হাইকমিশনার মোহাম্মদ হোসেন আলী। 'পাকিস্তান ডেপুটি হাইকমিশন' নামফলক নামিয়ে ফেলা হয়। সেখানে 'বাঙলা দেশ কূটনৈতিক মিশন' নামফলক লাগিয়ে দেওয়া হয়। মিশনের ছাদে ডেপুটি হাইকমিশনার মোহাম্মদ হোসেন আলীর নেতৃত্বে ওড়ানো হয় স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা। এর মাধ্যমে প্রথমবারের মতো আনুষ্ঠানিকভাবে বিদেশের মাটিতে বাংলাদেশের পতাকা উড়তে শুরু করে।

হোসেন আলীর দেওয়া তথ্য থেকে জানা যায়, ৩০ মার্চেই তিনি পাকিস্তান মিশনকে বাংলাদেশ মিশনে রূপান্তরের সিদ্ধান্ত নেন। তার রোজনামচার এক স্থানে উল্লেখ ছিল যে, বাংলাদেশ সরকার গঠিত হলে তিনি সেই সরকারের আনুগত্য ঘোষণা করবেন।

কলকাতার পাকিস্তান ডেপুটি হাইকমিশন অফিসের সব বাঙালি কর্মকর্তা-কর্মচারীর বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ এবং পাকিস্তান মিশনকে বাংলাদেশ মিশনে রূপান্তরের ঘটনা নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক তৎপর্য বহন করে। ১৯৭১ সালের ১৯ এপ্রিল এ বিষয়ে সংবাদপত্রে খবর প্রকাশিত হয়:

> কলকাতায় আজ ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে–পাকিস্থান ডেপুটি হাই কমিশন আজ থেকে স্বাধীন সার্বভৌম 'বাঙলাদেশ কূটনৈতিক মিশনে' রূপান্তরিত হল। পাকিস্থানের পতাকা হটিয়ে দিয়ে শ্রী এম হোসেন আলি সহস্র কণ্ঠে জয় ধ্বনির মধ্যে দূতাবাস ভবন শীর্ষে স্বাধীন বাঙলা দেশের রাষ্ট্রীয় পতাকা উড়িয়ে দেন। এর আগের মুহূর্তেও শ্রী আলি ছিলেন কলকাতায় পাকিস্থানের ডেপুটি হাই কমিশনার। দূতাবাস ভবনের প্রধান প্রবেশ পথের দেয়াল থেকে 'পাকিস্থান ডেপুটি হাই কমিশন' ফলক তুলে সেখানে 'বাঙলা দেশ কূটনৈতিক মিশন' ফলকটি লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। নতুন রাষ্ট্রের পতাকা উড়িয়ে ফলক লাগিয়ে দিয়ে শ্রী আলি ঘোষণা করেন এখন থেকে আমি স্বাধীন বাংলা দেশ সরকারের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য জ্ঞাপন করছি, শুধু আমি নয়, আমার অফিসাররা একই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এখন থেকে এই অফিস বাঙলাদেশ সরকারের কূটনৈতিক মিশনের দপ্তর।

১৯৭১ সালের ৩০ আগস্ট দিল্লিতেও বাংলাদেশ মিশন খোলা হয়। এই বিষয়ে ৩১ আগস্ট সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে লেখা হয়:

> কোরাণ, গীতা, ত্রিপিটক, বাইবেল থেকে শ্লোক পাঠ এবং জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে আজ এখানে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ মিশন খোলা হল। সরকারীভাবে স্বাধীন বাঙলাদেশের এটি চতুর্থ মিশন। অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে মিশনের প্রধান শ্রী কে এম শাহাবুদ্দিন বলেন, ভারত আমাদের নতুন রাষ্ট্রের প্রতি সহানুভূতি ও পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে। ভারত শীঘ্রই বাংলাদেশ ও তার আইনসম্মতভাবে গঠিত সরকারকে স্বীকৃতি জানাবে বলে তিনি আশা করেন। শ্রী শাহাবুদ্দিন বলেন, আজকের এই অনুষ্ঠান ঐতিহাসিক, কেন না বাংলাদেশের পতাকা দিল্লীতে পূর্ণ গৌরব নিয়ে উড়বে এবং এই পতাকা বিশ্বের কাছে আক্রমণকারীর পরাজয় ও নিপীড়িতদের চূড়ান্ত বিজয় ঘোষণা করবে।

তবে সাবেক কূটনীতিক ও পররাষ্ট্র সচিব সৈয়দ মোয়াজ্জেম আলীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী লন্ডনে বাংলাদেশ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয় আরও আগে ১৯৭১ সালের ১৭ আগস্ট। সাবেক কূটনীতিক ও পররাষ্ট্র সচিব মহিউদ্দিন আহমেদ এই গবেষণাকর্মের গবেষককে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জানান, লন্ডনের পাকিস্তান দূতাবাস থেকে তিনিই প্রথম বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। তখন তিনি লন্ডনে পাকিস্তান দূতাবাসে দ্বিতীয় সচিব হিসাবে কর্মরত ছিলেন। সৈয়দ মোয়াজ্জেম আলীও মহিউদ্দিন আহমেদের বিষয়ে একই তথ্য প্রকাশ করেছেন। সৈয়দ মোয়াজ্জেম আলী আরও লিখেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে ১৪ জন কূটনীতিক ও মিশন কর্মচারী ১৯৭১ সালের ৪ আগস্ট একযোগে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন:

> লন্ডনে দূতাবাসের প্রথম যে কূটনীতিক বের হয়ে এলেন, তিনি দ্বিতীয় সচিব মহিউদ্দিন আহমেদ। বাংলাদেশ মিশন প্রতিষ্ঠিত হলো ১৭ আগস্ট। আরও তিন কূটনীতিক হাবিবুর রহমান, লুৎফুল মতিন ও ফজলুল হক চৌধুরী বাংলাদেশ মিশনে যোগ দিলেন। পরে সিনিয়র কূটনীতিক কাউন্সিলর রেজাউল করীম মিশনে যোগ দিলেন। কিন্তু ভারতের বাইরে সবচেয়ে বড় দলবেঁধে 'ডিফেকশন' হয় ওয়াশিংটন ডিসিতে। সেখানে একযোগে ১৪ জন কূটনীতিক ও স্টাফ একসঙ্গে বাংলাদেশের

প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করলেন ৪ আগস্ট ১৯৭১। দলের নেতৃত্ব দেন সৈয়দ আনোয়ারুল করীম, জাতিসংঘে পাকিস্তানের উপপ্রধান প্রতিনিধি ও মিনিস্টার। দলে ছিলেন এনায়েত করীম, মিনিস্টার, ওয়াশিংটনস্থ পাকিস্তানের উপমিশন প্রধান। কাউন্সিলর শাহ এম এস কিবরিয়া, অর্থনৈতিক কাউন্সিলর আবুল মাল আবদুল মুহিত, শিক্ষাবিষয়ক কাউন্সিলর সৈয়দ আবুল রশীদ মতীন উদ্দিন, দ্বিতীয় সচিব (হিসাব বিভাগ) আতাউর রহমান চৌধুরী ও তৃতীয় সচিব (রাজনৈতিক) সৈয়দ মোয়াজ্জেম আলী। তিনজন স্থানীয়ভিত্তিক কর্মকর্তা শরফুল আলম, শেখ রুস্তম আলী ও আবদুর রাজ্জাক খান এ দলে যোগ দেন।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বিভিন্ন দেশে বসবাসরত প্রবাসী বাঙালিরাও মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত তৈরি ও বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির জন্য তৎপর ছিলেন। তখন যুক্তরাজ্যে অনেক বাঙালি বসবাস করতেন। সেখানে বাঙালি প্রবাসীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়:

দূর পরবাসে থেকেও বহু মুক্তিকামী বাঙালি এবং অবাঙালি নাগরিক বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে কাঁপিয়েছেন বিলেতের রাজপথ। এর মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের বহু অজানা ইতিহাসের সরব সাক্ষী লন্ডন। স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রাক-প্রস্তুতি পর্ব থেকেই বিলেত প্রবাসী মুক্তিকামী বাঙালিরা সরব ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধকালীন দীর্ঘ নয় মাস বিলেতের প্রতিটি শহরে তারা জোরালো দাবি তুলেছেন স্বাধীন বাংলাদেশের সমর্থনে। বাঙালিদের পাশাপাশি ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের সমর্থনে বিশ্ব জনমত গঠনে ব্রিটিশ এমপি, রাজনীতিক, সাংবাদিক, সমাজকর্মী, প্রগতিশীল শিক্ষার্থীরাও রেখেছেন অনন্য ভূমিকা। ৫ মার্চ ১৯৭১-এ লন্ডনস্থ পাকিস্তান দূতাবাস থেকে পতাকা নামিয়ে পুড়িয়ে দেন মুক্তিকামী বাঙালিরা। ৩ এপ্রিল ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে স্মারকলিপি দেন মহিলা সমিতির নেতারা। ২৬ জুলাই ১৯৭১ হাউস অব কমন্সে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম আটটি ডাকটিকিট ও উদ্বোধনী খাম প্রদর্শন করা হয়। ১ আগস্ট ১৯৭১ স্বাধীন বাংলাদেশের সমর্থনে অ্যাকশন বাংলাদেশের উদ্যোগে লন্ডনের ট্রাফালগার স্কয়ারে অনুষ্ঠিত হয় কালজয়ী বিশাল জনসমাবেশ।

১৯৭১ সলের ১ আগস্ট 'অ্যাকশন বাংলাদেশ' লন্ডনের ট্রাফালগার স্কয়ারে বাংলাদেশে গণহত্যা বন্ধ ও বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতিদানের দাবিতে একটি জনসভার আয়োজন করে। এই জনসভার পোস্টারের আধেয় 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র: চতুর্থ খণ্ড' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। এতে লেখা হয়েছে:

STOP GENOCIDE
RECOGNISE BANGLADESH
Rally at Trafalgar Square
On Sunday August 1, 1971 at 2 p.m.
ACTION BANGLADESH
34 Stratford Villas
LONDON NW 1
Phone: 014852889

১৯৭১ সলের ১২ ডিসেম্বর লন্ডনের 'বাংলাদেশ স্টিয়ারিং কমিটি' হাইডপার্কে বাংলাদেশের স্বীকৃতির দাবিতে জনসভা ও মিছিলের আয়োজন করে। এ উপলক্ষ্যে একটি পোস্টার ছাপানো হয়েছিল। এই পোস্টারের আধেয়ও 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র: চতুর্থ খণ্ড' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। পোস্টারে লেখা হয়:

সালাম, সালাম, হাজার সালাম
গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রপতি ও বাঙ্গালী জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমানকে জানাই অভিনন্দন
স্বাধীন বাংলাদেশ স্বীকৃতি মিছিল
রবিবার ১২ই ডিসেম্বর ১৯৭১ বেলা ১২ টায় হাইডপার্কে স্পীকার্স কর্নার।

স্বাধীন বাংলার সংগ্রামী ভাই ও বোনেরা,
আমাদের রক্তক্ষয়ী মুক্তি সংগ্রাম আজ বিজয়ের চূড়ান্ত পর্যায়ে। আমাদের বন্ধু ও প্রতিবেশী দেশ 'ভারত' আমাদের স্বীকৃতি দিয়েছেন। সেই সাথে স্বীকৃতি দিয়েছেন 'ভুটান'। আমরা পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশের কাছে আবেদন ও দাবী জানাতে চাই 'স্বীকৃতির' জন্য। বিলাতের এক লক্ষ প্রবাসী বাঙ্গালীর মিছিল থেকে আমরা লক্ষ কণ্ঠে আওয়াজ তুলতে চাই "গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দাও।"
সাড়ে সাত কোটি মানুষের পক্ষ হয়ে তোমাদের নিকট আমাদের দাবী স্বীকৃতি দাও। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দাও।
বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি ও গ্রেট বৃটেনস্থ হাই কমিশনার বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী এই সভায় ও মিছিলে যোগ দেয়ার জন্য জাতিসংঘের অধিবেশন থেকে আসবেন।
দলে দলে আপনারা সভা ও মিছিলে যোগ দিন।
যাতায়াতের জন্য নিজ নিজ এলাকার কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ করুন।
বাংলাদেশ স্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক আয়োজিত।

যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত প্রবাসী বাঙালিরাও বাংলাদেশের পক্ষে জনমত তৈরি এবং বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির জন্য উদ্যোগী ছিলেন। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের পর থেকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী বাঙালিদের সংগঠন 'বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকা' কর্তৃক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। নিউইয়র্ক শহরেও এই সংগঠনের ব্যানারে বাংলাদেশের পক্ষে বিভিন্ন তৎপরতা চলেছে। এ প্রসঙ্গে 'বাংলাদেশ ১৯৭১' গ্রন্থে সাংবাদিক-গবেষক আফসান চৌধুরী লিখেছেন:

নগরীতে প্রতি সপ্তাহেই সমাবেশ ও বিক্ষোভ প্রদর্শন চলত। অনেক বাঙ্গালী সমবেত হতেন জাতিসংঘ সদর দপ্তরের সামনে। কেউ কেউ লবি করতেন কংগ্রেসম্যানদের সাথে, সিনেটরদের সাথে। হাতে হাতে তারা প্রচারপত্র বিলি করতেন এবং অর্থ সংগ্রহ করতেন। প্রায় প্রত্যেক বাঙ্গালীই নিয়মিত চাঁদা প্রদান করতেন বাংলাদেশ ফান্ডে। এভাবে প্রচুর অর্থ সংগৃহীত হয়েছিল। সে অর্থ প্রেরিত হয়েছিল মুজিবনগরস্থ বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের কাছে। ডলার ছাড়াও পাঠানো হয়েছে শীতবস্ত্র, খাদ্য, ঔষুধ, জুতা এবং যুদ্ধে ব্যবহৃত নানা দ্রব্যসামগ্রী।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বাংলাদেশকে যুক্তরাষ্ট্রসহ সারা বিশ্বে পরিচিত করে তোলেন বিখ্যাত সংগীত ব্যক্তিত্ব জর্জ হ্যারিসন তাঁর অমর সৃষ্টি 'বাংলাদেশ বাংলাদেশ' শিরোনামের গানের মাধ্যমে। নিউইয়র্কে ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনে 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ'-এ গাওয়া হয় এই গান। এই কনসার্ট ও গানের মাধ্যমে বাংলাদেশে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নৃশংসতার কথা বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরা হয়, যা বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই কনসার্টের প্রাথমিক পরিকল্পনাকারী খ্যাতিমান সেতারবাদক পণ্ডিত রবিশংকর। তিনি তাঁর বন্ধু জর্জ হ্যারিসনকে সঙ্গে নিয়ে এই কনসার্ট বাস্তবায়ন করেন। প্রথম দিনের কনসার্টটি অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭১ সালের ১ আগস্ট। 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' প্রসঙ্গে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে পণ্ডিত রবিশংকর বলেন:

> মিউজিক ইন্ডাস্ট্রিতে যাঁরা প্রথিতযশা ছিলেন, যেমন বব ডিলান, এরিক ক্ল্যাপটন এঁদের সঙ্গে জর্জের যোগাযোগ হল। মাত্র দিন কয়েকের মধ্যেই সবকিছু ঠিকঠাক। ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনে কনসার্টের ব্যবস্থা হল। সেখানেই টানা দু'এক সপ্তাহ কনসার্টের পরিকল্পনা নিলাম। এ উপলক্ষ্যে জর্জ নিজে তো একটি গানই লিখে ফেলল। 'বাংলাদেশ বাংলাদেশ'। আলী আকবর ভাই ও আল্লারাখা ভাইকে অনুরোধ করলাম আমার সঙ্গে বাজাতে। তারা এক কথায় রাজী হয়ে গেলেন। কী বিশাল সাফল্য। প্রতিদিন টানা দু-দুটো শো হত আমাদের। একটি ম্যাটিনি অন্যটি সন্ধ্যাবেলায়। প্রতিটি শোতেই হাজার বিশেকেরও বেশি দর্শকের সমাগত হত। কনসার্টের ওপর তৈরি ছবি, ডিস্ক ও ক্যাসেট বিক্রির বদৌলতে সন্তোষজনক পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত হল। টাকাকড়ি লেনদেনে সরাসরি আমাদের কোনো হাত ছিল না। খরচপাতি বাদ দিয়ে পুরো টাকাটাই ইউনিসেফ পরিচালিত বাংলাদেশি শরণার্থীদের সাহায্য তহবিলে তুলে দেয়া হল। কিন্তু সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে, 'বাংলাদেশ' নামটি রাতারাতি সবার কাছে পরিচিত হয়ে উঠল। আর জর্জ হ্যারিসনের সেই গান 'বাংলাদেশ বাংলাদেশ' তো তক্ষুণি হিট। আমার খুব আনন্দ হচ্ছে এই সামান্য কাজটুকু তো অন্তত করতে পেরেছি। শেষ ভালো যার সব ভালো তার।

অন্যদিকে এর আগে ১৯৭১ সালের ১০ মে বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত এক ভাষণে আশা প্রকাশ করেন, খুব তাড়াতাড়িই বাংলাদেশ সারা বিশ্বের স্বীকৃতি পাবে। কলকাতায় শ্রুত এই ভাষণে তিনি বাংলাদেশ থেকে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।

> গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্রের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম আজ বলেন, বিশ্বের জনসাধারণ বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন এবং তিনি আশা করেন, অদূর ভবিষ্যতেই ঐ রাষ্ট্রগুলি বাংলাদেশ সরকারকে 'বৈধ সরকার হিসাবে স্বীকৃতি জানাবে'।–এখানে শ্রুত বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে তিনি তাঁর বেতার ভাষণে এই কথাগুলি বলেন। জনাব ইসলাম বলেন, চূড়ান্তভাবে শত্রুবাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করার মহৎ উদ্দেশ্যে আমি বাংলাদেশের জনসাধারণকে সুদৃঢ় ঐক্যবদ্ধ হতে আহ্বান জানাচ্ছি।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বাংলাদেশ সরকারের কয়েকজন প্রতিনিধি গোপনে বিভিন্ন দেশ সফর করেন। তারা স্বাধীন বাংলাদেশের পক্ষে জনমত তৈরি ও বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির জন্য বিভিন্ন দেশের রাজনীতিকসহ বিভিন্ন স্তরের নেতার সঙ্গে বৈঠক করেন। ১৯৭১ সালের ২৭ আগস্ট সংবাদপত্রে প্রকাশিত এবিষয়ক একটি খবরে লেখা হয়:

> বাংলাদেশের দুজন প্রতিনিধি গোপনে জাপান সফরে গিয়ে, সেখানে এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, বাঙলাদেশের মুক্তি আসন্ন। এমনকি এই বছরের শেষের দিকেই তা সম্ভব। এই মিশনের খবরটি জাপানের 'মিনিচি' সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরের সারাংশ আজ প্রকাশ করেছেন। এই দুজন প্রতিনিধি ব্যবসায়ীর বেশে বিভিন্ন দেশ সফর করতে করতে জাপানে গিয়ে পৌঁছান। এ'রা বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি।

মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত তৈরি এবং বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির জন্য বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘে প্রতিনিধি পাঠায়। সাংবাদিক-গবেষক আফসান চৌধুরী তাঁর 'বাংলাদেশ ১৯৭১' গ্রন্থে লিখেছেন:

> ২১ এপ্রিল বাংলাদেশ সরকার বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে বহির্বিশ্ব ও জাতিসংঘে বাংলাদেশের কূটনৈতিক মিশনের প্রতিনিধি নিয়োগ করেন।

মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী বিভিন্ন দেশ সফর করেন। এর অংশ হিসাবে ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি দুই সপ্তাহের জন্য স্কানডেনেভিয়ান দেশগুলোও সফর করেন। 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র: ষষ্ঠ খণ্ড' গ্রন্থে এ বিষয়ে তথ্য প্রকাশিত হয়:

> বাংলাদেশের আশু স্বীকৃতি ও শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির জন্য জনমত সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে দুই সপ্তাহব্যাপী স্কানডেনেভিয়ান দেশ সমূহে সফর শেষ করে বিচারপতি চৌধুরী সম্প্রতি লন্ডন প্রত্যাবর্তন করেছেন। এক সাক্ষাতকারে বিচারপতি চৌধুরী জানান যে, তাঁর এই সফর অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছে। সর্বত্রই তিনি বাংলাদেশের ব্যাপারে অত্যন্ত সহানুভূতিশীল মনোভাবের পরিচয় পান এবং স্থানীয় জনগণের দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটিগুলি খুবই সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।
>
> প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি ও শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির জন্য জনাব চৌধুরী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে নরওয়ে, ডেনমার্ক, ফিনল্যাণ্ড ও সুইডেন সরকারের কাছে আনুষ্ঠানিক চিঠিও হস্তান্তর করেন।

১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল জাতিসংঘে যায়। সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্যে জানানো হয়, এই প্রতিনিধিদল বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়ে জাতিসংঘে বিভিন্ন দেশের কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। জাতিসংঘের মহাসচিব, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গেও তাঁরা সাক্ষাৎ করবেন। বাংলাদেশের সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে তাদের অবহিত করবেন এবং স্বীকৃতির দাবির যথার্থতা তুলে ধরবেন। এ বিষয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে লেখা হয়:

> অবিলম্বে শেখ মুজিবর রহমানের মুক্তি, বাংলাদেশের স্বাধীন সার্বভৌম সরকারের স্বীকৃতি ও বিনাসর্তে এক লক্ষ পাক সৈন্যকে বাংলাদেশ থেকে সরিয়ে নেওয়ার দাবীতেই আমরা রাষ্ট্রসঙ্ঘ বিশ্ববিবেকের কাছে যাচ্ছি। আমাদের বিশ্বাস, বিশ্বের সুশিক্ষিত জনপ্রতিনিধিরা বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানবাত্মার এ আবেদনে সাড়া দেবেন।
>
> প্রবীণ আওয়ামী লীগ নেতা শ্রী ফণী মজুমদার আজ মুজিবনগর থেকে নিউইয়র্ক যাওয়ার পথে বাংলাদেশের কোন এক স্থানে সাংবাদিকদের কাছে একথা বলেন। শ্রী মজুমদার বলেন, রাষ্ট্রপুঞ্জের আসন্ন সম্মেলনে ভুটান বাংলাদেশের ওপর পাকিস্থানের আক্রমণ প্রসঙ্গ তুলবে। পাকিস্থানের বর্বর আক্রমণের বিরুদ্ধে যুগোস্লাভিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, ইরাক, রাশিয়া ও আর কয়েকটি দেশ রাষ্ট্রপুঞ্জে ধিক্কার জানাবে। এছাড়া, বাংলাদেশকে রাষ্ট্রপুঞ্জে গ্রহণের জন্য কোন কোন দেশ দাবী তুলবে।
>
> তিনি বলেন, আবু সৈয়দ চৌধুরীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের যে প্রতিনিধিদল রাষ্ট্রসঙ্ঘে যাচ্ছেন তাঁরা রাষ্ট্রসঙ্ঘে বিভিন্ন দেশের কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ স্থাপন করবেন। রাষ্ট্রসঙ্ঘে অবিলম্বে বাংলাদেশের স্বীকৃতির দাবী জানানো ছাড়াও তাঁরা প্রেসিডেন্ট নিকসনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। আমেরিকার পররাষ্ট্র সচিব উইলিয়ম রজার্সের সঙ্গেও তাঁরা যোগাযোগ স্থাপন করবেন। রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাসচিব উ থান্টকে বাংলাদেশ সম্পর্কেও আধুনিক তথ্য দিয়ে তাঁদের দাবীর যথার্থতা তুলে ধরবেন।

বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতা বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী জাতিসংঘে গিয়ে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর প্রতি আহ্বান জানান। ১৯৭১ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ থেকে সাংবাদিকদের পাঠানো এই খবর গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়:

> এখানে আগত বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতা জনাব আবু সাঈদ চৌধুরী রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলির উদ্দেশ্যে এক আবেদনে মিথ্যা প্রথা পদ্ধতি বাতিল করে সত্য, ন্যায় ও মানবিকতার স্বার্থে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের দাবী জানান। বাংলাদেশ এখন বাস্তব। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য এবং ঢাকা হাইকোর্টের বিচারক জনাব চৌধুরী বাংলাদেশে পশ্চিম পাক জান্তার নারকীয় হত্যাকাণ্ড এবং পাক সেনাবাহিনী কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের গণহত্যার প্রতিবাদে পাকিস্থানের উচ্চ সরকারী পদ ত্যাগ করে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। জনাব চৌধুরী এক সাক্ষাৎকারে বলেন, আমরা দেয়ালে পিঠ দিয়ে লড়াই করলেও চরম জয় আমাদের হবেই–সে সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধিদলটি প্রতিদিন জাতিসংঘ ভবনে গিয়ে বাংলাদেশের স্বীকৃতির বিষয়টি তুলে ধরার জন্য বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। তারা বাংলাদেশের প্রকৃত অবস্থা, হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যা, মুক্তিযুদ্ধের অগ্রগতিসহ সংশ্লিষ্ট বিষয় বিস্তারিতভাবে তুলে ধরতেন। এ প্রসঙ্গে 'মুক্তিযুদ্ধ ও প্রবাসী বাঙ্গালী সমাজ' গ্রন্থে তাজুল মোহাম্মদ লিখেছেন:

> ১৬ সদস্যের এই দলটিকে বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ করে কয়েকটি ছোট ছোট দল তৈরি করা হয়েছিল। আলাদা আলাদা ভাগে বিভক্ত হয়ে তারা বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতদের কাছে যেতেন। আবু সাঈদ চৌধুরী, সৈয়দ আবদুস সুলতান এমএনএ এবং কূটনীতিক এ এইচ মাহমুদ আলীর সমন্বয়ে গঠিত গ্রুপটি যেত জাতিসংঘ ভবনে। এছাড়াও বিভিন্ন টেলিভিশন এবং পত্রিকায় সাক্ষাৎকার দিয়েছেন প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। সাংবাদিক সম্মেলনও করেছেন। এভাবে তারা সারা দুনিয়ার সামনে পাকিস্তানিদের নৃশংস অত্যাচারের কাহিনী তুলে ধরতে সমর্থ হন।

বৃহৎ শক্তির দেশের নীতিগত অবস্থান

বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে বিশ্বের বৃহৎ শক্তিগুলো নিজ নিজ ভাবমূর্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ঘটনার মূল্যায়ন করতে শুরু করে। নিজস্ব স্বার্থ অনুযায়ী নীতিগত অবস্থান গ্রহণ করে। কূটনৈতিক তৎপরতা চালায়। কেউ কেউ বাংলাদেশের পক্ষে নীতিগত সমর্থন জানায়। যুদ্ধের মাঠ ও মাঠের বাইরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বন্ধুত্বের হাত বাড়ায়। সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করে। বিপরীত দিকে কোনো কোনো বৃহৎ শক্তির দেশ সামরিক ও বেসামরিক আগ্রাসন চালায়। বাংলাদেশকে স্বীকৃতির প্রশ্নটিও প্রতিটি দেশের নীতিগত অবস্থানের সঙ্গেই আবর্তিত হয়।

বিশ্বের বৃহৎ শক্তির মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ও চীন শুরু থেকেই মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে। যুক্তরাষ্ট্র ও চীন ছিল বাংলাদেশে দখলদার পাকিস্তানি বাহিনীর পক্ষে। তারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে কাজ করেছে। এ দুই বৃহৎ শক্তি পাকিস্তানকে অস্ত্রসহ যাবতীয় সাহায্য-সহযোগিতা করে। শুধু তাই নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র অনবরত তার প্রভাব খাটাতে থাকে। কোনো দেশ যাতে মুক্তিযুদ্ধে সহযোগিতা ও সমর্থন না করে, সে ব্যাপারেও তারা বিভিন্ন অপতৎপরতা চালায়। জাতিসংঘেও যুক্তরাষ্ট্র মুক্তিযুদ্ধবিরোধী ভূমিকা পালন করে। তবে যুক্তরাষ্ট্রের জনসাধারণ মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের পক্ষে ছিল। সেদেশের গণমাধ্যমও বাংলাদেশের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

বিশ্বের বৃহৎ শক্তির মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ও চীন শুরু থেকেই মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে। যুক্তরাষ্ট্র ও চীন ছিল বাংলাদেশে দখলদার পাকিস্তানি বাহিনীর পক্ষে। তারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে কাজ করেছে

অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশের পাশে এসে দাঁড়ায় এবং মুক্তিযুদ্ধে সর্বাত্মক সহযোগিতা করে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারত ছাড়া সবচেয়ে বড়ো মিত্রশক্তি হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। প্রাসঙ্গিক কারণে উল্লেখ করা যায়, ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে ২ এপ্রিলে সোভিয়েত সভাপতিমণ্ডলীর সভাপতি নিকোলাই পদগোর্নি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের কাছে প্রেরিত বার্তায় বাংলাদেশে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বর গণহত্যার প্রতিবাদ জানান এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বন্দি করায় উদ্‌বেগ প্রকাশ করেন। ৪ এপ্রিল সোভিয়েত ইউনিয়নের দৈনিক প্রাভদা পত্রিকায় এই বার্তার পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হয়। 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র : ত্রয়োদশ খণ্ড' গ্রন্থে প্রাভদার বরাত দিয়ে বার্তাটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করা হয়েছে। বার্তাটি ছিল:

> মাননীয় প্রেসিডেন্ট মহাশয়, ঢাকার আলোচনা ভেঙে যাওয়ার খবর এবং সামরিক প্রশাসন চূড়ান্ত ব্যবস্থা অবলম্বন প্রয়োজন মনে করে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের বিরুদ্ধে সাময়িক বলপ্রোয়গ করেছেন–এই মর্মে খবর সোভিয়েত ইউনিয়েনে

> গভীর উদ্বেগের সঞ্চার করেছে। এই ঘটনার ফলে পাকিস্তানের অগণিত মানুষের প্রাণহানি, নিপীড়ন ও দুঃখকষ্টের খবরে সোভিয়েতের জনগণ বিচলিত না হয়ে পারে না। মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য রাজনৈতিক ব্যক্তিদের বন্দী করায় এবং নির্যাতন করায়ও সোভিয়েত ইউনিয়ন উদ্বেগ বোধ করছে। প্রেসিডেন্ট মহাশয়, সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষ থেকে আপনাকে কিছু বলা আমাদের কর্তব্য বলে মনে করি। পূর্ব পাকিস্তানের রক্তপাত বন্ধ করার জন্য, সেখানকার মানুষের উপর নিপীড়নের অবসান ঘটানোর জন্য, এবং সমস্যা সমাধানের একটি শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক উপায় উদ্ভাবনের জন্য অত্যন্ত জরুরি ব্যবস্থা করতে আপনাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি। প্রেসিডেন্ট মহাশয়, আপনাকে এই অনুরোধ জানাতে আমরা কোন নীতি দ্বারা পরিচালিত হয়েছি, আশা করি আপনি তা সঠিকভাবে বুঝতে পারবেন। আমাদের একান্ত কামনা যে অবিলম্বে পূর্ব পাকিস্তানে শান্তি এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হোক।

জাতিসংঘেও সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশের পক্ষে জোরালো অবস্থান নিয়েছিল। এর ফলে যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও পাকিস্তান কূটনৈতিকভাবে পর্যুদস্ত হয়েছে। শুধু তাই নয়, ১৯৭১ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ২৬শ অধিবেশনের পূর্ণাঙ্গ সভায় সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্দ্রেই এন্ড্রেয়েভিচ গ্রোমিকো তার ভাষণে যুদ্ধ এড়ানোর জন্য পাকিস্তানকে সতর্ক করেছেন। 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র: ত্রয়োদশ খণ্ড' গ্রন্থে ভাষণের কিছু অংশ প্রকাশ করা হয়েছে:

> ভারতীয় উপমহাদেশে পরিস্থিতি যথেষ্ট পরিমাণে ঘোরালো হয়েছে। এক কথায় স্বীকার না করে উপায় নেই যে পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনার গতিতে ভারতের উৎকণ্ঠা প্রকাশের কারণ আছে। ভারতে শরণার্থীর স্রোত গুরুতর অসুবিধা ও সমস্যার জন্ম দিয়েছে, সেগুলির প্রকৃতি শুধু অর্থনৈতিক নয়। আমাদের স্থির বিশ্বাস, পাকিস্তানে উদ্ভূত প্রশ্নাদির রাজনৈতিক মীমাংসার মাধ্যমেই শুধু এই এলাকায় সমগ্রভাবে উত্তেজনার প্রশমন ঘটানো যায়। আর সেখানে অবস্থিত সমস্ত রাষ্ট্রেরই এতে আগ্রহী হওয়া উচিত। শরণার্থীরা যাতে পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে যেতে পারে সে ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে। আর এটা সম্ভব হবে কেবলমাত্র সেখানে তাঁদের জন্য নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হবার পর। বর্তমানে এই অঞ্চলের পরিস্থিতি উত্তেজনাপূর্ণ আর এটা শুধু একটা অভ্যন্তরীণ প্রশ্ন নয়। সোভিয়েত সরকার এই আশা প্রকাশ করতে চায় যে ব্যাপারটা সামরিক সংঘাত পর্যন্ত গড়াবে না এবং সংযম ও যুক্তিরই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে জাতিসংঘে সোভিয়েত ইউনিয়ন তিনবার ভেটো দিয়ে মুক্তিযুদ্ধকে চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছে দিয়েছিল এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত করতে সহায়তা করেছিল।

অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের বন্ধুর ভূমিকা পালন করে যুক্তরাজ্য। ফ্রান্সের ভূমিকাও ছিল ইতিবাচক। যুক্তরাজ্যের ভূমিকা সম্পর্কে দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকায় এক প্রবন্ধে রণক ইসলাম লিখেছেন:

> বৃটিশ পার্লামেন্টের সদস্যরা জোরালোভাবে বাঙালির স্বাধীনতার লড়াইকে সমর্থন জানান। শরণার্থীদের জন্য অর্থ ও ত্রাণ সহায়তা দেয়। বাংলাদেশের প্রতি সহমর্মী ও সমব্যথী বৃটিশ পার্লামেন্টের এমপিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছিলেন রাসেল জন স্টোনহাউস। তিনি বাংলাদেশের পক্ষে জোরালো বক্তব্য দেন। হাউস অব কমন্স সভায় তিনি বলেন, 'আমার মনে হয়, ভবিষ্যতে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করবেই।'

ইংল্যান্ডের তৎকালীন বিরোধী দল লেবার পার্টিও বাংলাদেশের পক্ষে অবস্থান নেয়। ১৯৭১ সালের আগস্টে ভারত সফর করেন ব্রিটিশ কমন্স সভার লেবার পার্টির এমপি ও সাবেক মন্ত্রী পিটার শোর। ৩০ আগস্ট তিনি বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই সাক্ষাতের সময় বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রতি তাঁর সমর্থন জানান এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য বৃহৎ শক্তিগুলোর করণীয় নিয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেন। কলকাতায় বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় পিটার শোর তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে সাক্ষাতের বিষয়টি তুলে ধরেন। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়:

> যুক্তরাজ্যের সাবেক মন্ত্রী এবং লেবার পার্টির সাংসদ পিটার শোরও এদিন বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে বৈঠক করেন। বাংলাদেশের মুক্তির জন্য বিশ্বের গণতান্ত্রিক শক্তিগুলো কী করতে পারে, প্রধানত তা-ই ছিল তাঁদের আলোচনার বিষয়। দমদম বিমানবন্দরে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, শেখ মুজিবের তিনি মুক্তি চান। এই দিন রাতেই তিনি দিল্লি চলে যান।

পরদিন ১৯৭১ সালের ৩১ আগস্ট দিল্লিতে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে পিটার শোর বাংলাদেশের সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, নতুন একটি শিশুরাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের জন্মলাভ খুবই আসন্ন। বিশ্বের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর উচিত বাংলাদেশের জন্মলাভের পথ সুগম করা। এই বিষয়ে প্রাপ্ত তথ্য:

> বৃটেনের সাবেক মন্ত্রী ও কমন্স সভায় লেবার পার্টির এমপি পিটার শোর দিল্লিতে সাংবাদিকদের বলেন, বাংলাদেশে এখন ঘটছে পুরোনো পাকিস্তানের মৃত্যুযন্ত্রণা এবং একটি নতুন জাতির জন্মের প্রসববেদনা। এখন বিশ্বের কাছে প্রশ্ন, এই নবজাতকটিকে নিদারুণ দুঃখকষ্টে ফেলে রাখা হবে, না কি গণতন্ত্র ও শান্তির পথে কিছু ব্যবস্থা করা হবে। পিটার শোর জানান, বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীসহ আরও দুজন মন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে। তাঁরা স্বাধীনতা ছাড়া আর কোনো সমাধানে রাজি নন।

বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকারকে রাজি করানোর জন্য ইংল্যান্ডের কমন্স সভার সদস্যরা নিজেদের সম্মতি জানিয়ে স্বাক্ষর সংগ্রহ করেন। কমন্স সভার মোট সদস্যের ৫০ শতাংশ সদস্যের স্বাক্ষর সংগ্রহের টার্গেট নিয়ে তারা এই কার্যক্রম শুরু করেন। দিল্লিতে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য ভারত সফররত ইংল্যান্ডের কমন্স সভার লেবার পার্টির সদস্য ফ্রেড ইভান্স ১৯৭১ সালের ২১ সেপ্টেম্বর কলকাতায় সাংবাদিকদের কাছে এই তথ্য প্রকাশ করেন। তিনি সাংবাদিকদের জানান:

> কমন্স সভার সদস্যরা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য ব্রিটিশ সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে সদস্যদের স্বাক্ষর সংগ্রহ শুরু করেছেন। ইতিমধ্যে প্রায় ২২০ জন সদস্য স্বাক্ষর করেছেন। তিনি জানান, তাঁরা প্রায় ৩০০ জনের স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে পারবেন। ব্রিটেনে সাংসদদের মোট সংখ্যা ৬৩০। ফ্রেড ইভান্স বাংলাদেশ সম্মেলনে যোগ দিতে ভারতে গিয়ে ২১ সেপ্টেম্বর শরণার্থীশিবির পরিদর্শন করেন। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, তাঁর দেশের মানুষ বাংলাদেশকে মুক্ত করার ব্যাপারে একমত। ব্রিটেনের গণমাধ্যম এ ব্যাপারে সোচ্চার। সারা বিশ্বেই বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গড়ে উঠছে। দিল্লিতে বাংলাদেশ সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের কেউ কেউ এদিন লন্ডনে সদর দপ্তর করে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক মৈত্রী

কমিটি গঠনের কথা বলেন। এই কমিটি গঠন এবং তার চূড়ান্ত রূপ দেওয়ার ক্ষমতা সম্মেলনের সভাপতি সর্বোদয় নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণকে দেওয়া হয়।

১৯৭১ সালের ৪ অক্টোবর লেবার পার্টির পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বাংলাদেশের ব্যাপারে জাতিসংঘকে সরাসরি হস্তক্ষেপের আহ্বান জানানো হয়। এই বিষয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে লেখা হয়েছে:

বৃটেনের শ্রমিক দল আজ পূর্ববঙ্গে জনগণের অবর্ণনীয় দুর্দশার জন্য পাকিস্থানকে দায়ী করে। রাষ্ট্রসঙ্ঘকে এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের আহ্বান জানিয়েছেন। পূর্ববঙ্গে অধিবাসীদের বিরুদ্ধে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করায় পাকিস্থানকে নিন্দা করার জন্যও শ্রমিক দল আহ্বান জানিয়েছে। দলের জাতীয় কর্মপরিষদের নামে প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত এক বিবৃতিতে পূর্ববঙ্গ প্রশ্নে জনগণের ইচ্ছা এবং গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক সমাধানের জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘকে সরাসরি হস্তক্ষেপ করার আহ্বান জানান হয়েছে। আজ দলের জাতীয় সম্মেলনে পূর্ববঙ্গের ব্যাপারে পাকিস্থান সম্পর্কে বিবৃতিটি গ্রহণের জন্য শ্রমিক দলের জাতীয় কর্মপরিষদ আনুষ্ঠানিকভাবে এটি পেশ করেছেন। ওই বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এই রাজনৈতিক সমাধান আসতে পারে– পূর্ববঙ্গে জঙ্গীশাহীর সাম্প্রতিক নিপীড়ন বন্ধ এবং পূর্ববঙ্গের রাজনৈতিক নেতা বিশেষ করে শেখ মুজিবর রহমানের মুক্তিদান ও তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে। মঙ্গলবার পররাষ্ট্র বিষয়ে শ্রমিক দলের সম্মেলনে যে বিতর্ক হবে তাতে আলোচনার জন্য দলের নেতারা এই বিবৃতিতে প্রস্তুত করেছেন। বিবৃতিতে আরো বলা হয়েছে, শরণার্থী সমস্যা মোকাবিলায় ভারত এক অসম বৃহৎ বোঝা বইছে। এ ব্যাপারে বিশ্ববাসীর সাড়া মোটেই পর্যাপ্ত নয়।

অন্যান্য দেশের অবস্থন

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অবদান রেখেছিল। বৃহৎ রাষ্ট্রগুলোর পাশাপাশি প্রতিবেশী ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোর অবদানও অনস্বীকার্য। বাংলাদেশে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর হত্যাযজ্ঞে বিশ্বনেতারাও নীরব ছিলেন না।

বাংলাদেশ ভূখণ্ড থেকে প্রকাশিত মূলধারার বেশির ভাগ সংবাদপত্র মুক্তিযুদ্ধের সময় অবরুদ্ধ ছিল। তবে মুক্তিযুদ্ধকালে বিদেশি গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্বজনমত গঠনে সহায়তা করে। এতে স্বাধীনতা অর্জন ত্বরান্বিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জনেও তা বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এ ধরনের কিছু খবরের নমুনা তুলে ধরা হলো।

১৯৭১ সালের মে মাসের শুরুতেই বিদেশি গণমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হয়, বিভিন্ন দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার কথা ভাবছে। এ খবরেই জানানো হয়, সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রধানমন্ত্রী আলেকসি কোসিগিন বাংলাদেশ সফরে আসছেন। তাই খবরটি বাংলাদেশের স্বীকৃতির প্রশ্নে আশাব্যঞ্জক হয়ে ওঠে। যদিও বিজয় অর্জনের আগে শুধু ভারত ও ভুটান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। অন্যদেশগুলোর স্বীকৃতি দেওয়া শুরু হয় ১৯৭২ সালের জানুয়ারি থেকে। খবরটিতে লেখা হয়:

স্বাধীন সার্বভৌম গণতান্ত্রিক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রশ্ন এখন আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। যে সব দেশ আর কিছুদিন দেখার পর বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার কথা ভাবছিল, তারা ইয়াহিয়া বাহিনীর ব্যাপক গণহত্যার ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে কত তাড়াতাড়ি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়া যায়, তার কথা ভাবতে সুরু করেছে।

কোসিগিন আসছেন: রুশ প্রধানমন্ত্রী শ্রী আলেকসি কোসিগিন বাংলাদেশ সফরে আসছেন। এই সংবাদ মস্কো এবং দিল্লী যথেষ্ট গোপনীয়তার সঙ্গে রক্ষা করলেও বাংলাদেশ মন্ত্রিসভার সদস্যদের কাছে এ সংবাদ এসে পৌঁছেছে। শ্রী কোসিগিনের আসার কারণ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল মহলে নানা ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। অনেকে মনে করছেন তিনি বাংলাদেশে নরহত্যা কত ব্যাপক এবং ক্ষতির বিস্তার কতখানি তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করতে চান।

বিভিন্ন জায়গায় গবেষণা: আবার অনেকের ধারণা শ্রী কোসিগিন পশ্চিম এশিয়ায় চীনা প্রভাব নির্মূল করার জন্য নতুন কোন রাজনৈতিক ফরমুলা আরোপ করতে চান। শ্রী কোসিগিনের বাংলাদেশ সফরের সংবাদ ছাড়াও বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে আরও উৎসাহজনক খবর হলো পূর্ব ইউরোপ থেকে অস্ত্র সরবরাহের সংবাদ প্রায় পাকা হয়ে এসেছে। পূর্ব ইউরোপ থেকে মুজিব সরকার যেসব অস্ত্র পাবে সেগুলি হলো: লাইট ও হেভী মর্টার, লাইট ও হেভী মেশিনগান, টমিগান, কার্তুজ ও অন্যান্য অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র।

মুক্তিযুদ্ধকালে বিদেশি গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্বজনমত গঠনে সহায়তা করে। এতে স্বাধীনতা অর্জন ত্বরান্বিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জনেও তা বিশেষ ভূমিকা পালন করে

১৯৭১ সালের ৩০ মে যুগোস্লাভিয়ার রাষ্ট্রপতি মার্শাল টিটো বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের কাছে একটি চিঠি পাঠান। এই চিঠিতে টিটো আন্তরিকভাবে বাংলাদেশের মানুষের প্রতি সমর্থন জানান। মার্শাল টিটোর এই চিঠি পরোক্ষভাবে বাংলাদেশের প্রতি যুগোস্লাভিয়ার স্বীকৃতি হিসাবে অভিহিত করে কূটনৈতিক মহল।

১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে বাংলাদেশকে নিয়ে ভারতে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে ২৫টি দেশের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। এই সম্মেলনে বিশ্বের সব দেশের কাছে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার সুপারিশ করা হয়। ১৯৭১ সালের ২১ সেপ্টেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্টে লেখা হয়:

> বাংলাদেশ সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনের সমাপ্তি দিবসে ২৫টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ আজ যে রিপোর্ট পেশ করেছেন তাতে বিশ্বজনীনতার ভিত্তিতে বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের সুপারিশ করা হয়েছে। তবে এ ব্যাপারে ভারতবর্ষকেই নেতৃত্ব দেবার আহ্বান জানান হয়েছে। বাংলাদেশ সম্পর্কে ঐকমত্য প্রকাশের যে আকাঙ্খা বিশ্ব মানব সমাজ প্রকাশ করেছেন, তা মনে রেখে উক্ত রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ আরও সুপারিশ করেছেন, বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে অহিংস পথে সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশে অভিযান করা যেতে পারে এবং এই অভিযান শুরু হবে ভারত থেকে। আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তিনটি কমিশন গঠন করেছিলেন। এই কমিশনগুলি বিভিন্ন সুপারিশ করেন। এই সব সুপারিশে সরকারী এবং বে-সরকারী স্তরে বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করার প্রস্তাব করা হয়েছে। উদ্দেশ্য, বাংলাদেশের মানুষের স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করা এবং পাক-বাহিনীর অত্যাচারের অবসান করা।

১৯৭১ সালের অক্টোবরে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের কাছে একটি টেলিগ্রাম করেন কাতারের আমির। এই টেলিগ্রামে তিনি তাজউদ্দীন আহমদকে 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী' উল্লেখ করেন। কাতারের আমিরের এই সম্বোধনকে কূটনৈতিক মহল বাংলাদেশ সরকারের প্রতি কাতারের কার্যত স্বীকৃতি অভিহিত করেন। কাতারের আমিরের এই টেলিগ্রামের খবর ১৯৭১ সালের ২ অক্টোবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়:

> আরব জগতের একটি দেশ কাতারের আমীর একটি তারে জনাব তাজউদ্দীন আহমেদকে বাংলাদেশ গণপ্রজাতন্ত্রী সরকারের প্রধানমন্ত্রী বলে উল্লেখ করেছেন। কাতার সম্প্রতি রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্য হয়েছে। কাতারের আমীরের এই তারকে কূটনৈতিক মহল বাংলাদেশ সরকারের প্রতি কাতারের কার্যত: স্বীকৃতি বলে মনে করছেন। কাতারের আমীরের তারের বিষয়বস্তু আজ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রচার করেছে। কাতারের রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্যপদ লাভে আনন্দ প্রকাশ করে জনাব তাজউদ্দীন সেখানকার আমীরকে যে তার পাঠিয়েছিলেন আমীরের তারটি তারই জবাব।

ভারতের অবস্থান

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবস্থান ইতিবাচক। ঘনিষ্ঠ বন্ধুর ভূমিকা পালন করে ভারত। শক্তিশালী দেশ যুক্তরাষ্ট্র ও চীন মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে জোরালো অবস্থান নেয়। বৃহৎ ইসলামি সংস্থা ওআইসিও মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে। আরববিশ্বের অনেক দেশই পাকিস্তানের পক্ষ নেয়। ভারত শক্তিশালী দেশ ও বৃহৎ শক্তির রক্তচক্ষু উপেক্ষা করেই বাংলাদেশের পক্ষ নেয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন, পূর্ব ইউরোপের কিছু দেশ এবং প্রতিবেশী নেপাল ও ভুটানের কূটনৈতিক সমর্থন নিয়ে ভারত মুক্তিযুদ্ধে সার্বিকভাবে বাংলাদেশকে সমর্থন করে। নয় মাস মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে সামরিক ও বেসামরিক সহযোগিতা ছাড়াও ভারত সরকার স্বীকৃতিসহ বিভিন্ন বিষয়ে বাংলাদেশের জন্য সারা বিশ্বে ব্যাপক কূটনৈতিক তৎপরতা চালায়। শুধু তাই নয়, মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের ১০ দিন আগেই ভারত সর্বপ্রথম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। এ প্রসঙ্গে বিবিসি বাংলা এক প্রতিবেদনে বলেছে:

> ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার গঠিত হবার এক সপ্তাহের মধ্যেই ভারতের স্বীকৃতি চেয়ে চিঠি দেন বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম। কিন্তু কৌশলগত কারণে ভারত ছিল তখন সাবধানী। বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার ভারতের মাটিতে বসেই পরিচালিত হতো। এতে ভারত সরকারের সর্বাত্মক সহায়তা ছিল। এছাড়া মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা ভারতের মাটিতেই প্রশিক্ষণ নিয়েছে এবং ভারত তাদের অস্ত্র সরবরাহ করেছে। অন্যদিকে এক কোটি বাংলাদেশী শরণার্থীকে সহায়তা করেছে ভারত।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর তৎপরতা

পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশের অভ্যুদয় পৃথিবীর অনেক দেশের পক্ষেই মেনে নেওয়া কঠিন ছিল। বিশেষ করে বৃহৎ শক্তি যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের বাংলাদেশবিরোধী অবস্থান অনেক দেশের জন্য বাংলাদেশের পক্ষ নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাই স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের পক্ষে ভারতের সমর্থন এবং সহানুভূতি থাকলেও অন্য দেশের সমর্থন আদায় করার জন্য আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতকে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়। আর এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন ভারতের সে সময়ের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকেই তিনি বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। এর অনেক নজির রয়েছে। ১৯৭১ সালের ১৩ এপ্রিল ভারতের রায়বেরিলিতে এক সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দিচ্ছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। বাংলাদেশ সরকার তখনও গঠিত হয়নি। সংবাদ সম্মেলনে তিনি জানান, সরকার গঠনের পর বাংলাদেশ ভারতের স্বীকৃতি চাইলে তা সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করা হবে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই খবরে লেখা হয়:

> প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আজ এখানে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, বাঙলাদেশের বিরুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্থানী সামরিক কর্তৃপক্ষকে চীন 'প্রকাশ্য সমর্থন' জানিয়েছে। তবু এর ফলে বাঙলাদেশ সম্পর্কে ভারতের নীতির কোন পরিবর্তন হবে না। লক্ষ্মৌতে কংগ্রেস বিধানমণ্ডলীর দলের বৈঠকেও তিনি বলেছেন, বাঙলাদেশে যা ঘটছে, তাতে ভারত নীরব দর্শক হয়ে থাকতে পারে না। তাছাড়া, এই যুদ্ধকে পাকিস্থানের নিছক ঘরোয়া ব্যাপারও বলা যায় না। শ্রীমতী গান্ধী এই মর্মে আভাস দেন, বাঙলাদেশে যখনি সরকার গঠিত হবে এবং সেই সরকার স্বীকৃতি লাভের জন্য যথারীতি ভারত সরকারের কাছে আবেদন করবেন তখন তা সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করা হবে।

১৯৭১ সালের ৭ মে নয়দিল্লিতে বাংলাদেশের স্বীকৃতির বিষয়ে আলোচনার জন্য বিরোধী দলগুলোর সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে তিনি জানান, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করছে ভারত। বিষয়টি নিয়ে কয়েকটি মিত্রদেশের সঙ্গেও আলোচনা করা হচ্ছে। এই বৈঠকের খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়:

> বাংলাদেশকে অবিলম্বে স্বীকৃতি দেবার ব্যাপারে বিরোধী দলগুলির নেতৃবৃন্দ প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কাছ থেকে আজ নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি আদায় করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের সে চেষ্টা সফল হয়নি। শ্রীমতী গান্ধী শুধু বলেন, এই স্বীকৃতিদানের বিষয়টির সবদিক দিয়ে বিচার-বিবেচনা করতে হবে এবং এর তাৎপর্য অনুধাবন করতে হবে। তবে তিনি এই প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন, যথোচিত আন্তরিকতার সঙ্গে ভারত সরকার প্রশ্নটি বিবেচনা করে দেখছেন। তাঁর মতে, বাংলাদেশের এই সংগ্রাম, প্রকৃতই জাতীয় সংগ্রাম। মুক্তিফৌজ এই সত্যতা প্রমাণ করেছেন। বিরোধী নেতৃবৃন্দের তিন ঘণ্টা-ব্যাপী সম্মেলনে এক বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী বলেন যে, ভারত এই

স্বীকৃতিদানের বিষয়টি নিয়ে কয়েকটি মিত্র রাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা করেছে। কোন রাষ্ট্রই এখনই বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানে ইচ্ছুক নয়। সেজন্য ভারতও এই ব্যাপারে অপেক্ষা করতে এবং পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রাখতে চায়। প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, পাকিস্থান যে যুদ্ধের হুমকি দিয়েছে তার জন্য অথবা চীনের সঙ্গে সংঘর্ষের ভয়ে ভারত এই স্বীকৃতিদান সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব করছে না, এই বিলম্বের আরও কারণ আছে। বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতিদানের প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রী এই প্রথম তাঁর মনোভাব প্রকাশ করলেন।

১৯৭১ সালের ৭ মে বাংলাদেশ বিষয়ে বিরোধী দলগুলোর সঙ্গে বৈঠকের বিষয়বস্তু অবহিত করার জন্য তিনি নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদের বৈঠক ডাকেন। মন্ত্রিপরিষদে তাঁর মতবিনিময়ের খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়:

বাংলাদেশ সম্পর্কে মতামত বিনিময়ের জন্য আজ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার এক অঘোষিত ঘরোয়া বৈঠক বসে। বিরোধী নেতাদের সঙ্গে বাংলাদেশ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার পর প্রধানমন্ত্রী তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যদের বৈঠকের বিজ্ঞপ্তি পাঠান। প্রায় এক ঘণ্টাব্যাপী এই বৈঠকে শ্রীমতী গান্ধী বিরোধী দলের নেতাদের সঙ্গে আলোচনার ধারা মন্ত্রিসভার সতীর্থদের কাছে ব্যক্ত করেন।

পার্লামেন্টারী দলে বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের জন্য মাঝে মাঝেই কলরব উঠলেও আজ পার্লামেন্টারী দলের কার্যকরী কমিটির বৈঠকে সরকারী মনোভাব পূর্ণ সমর্থন লাভ করে। বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের উপযুক্ত সময় নির্ধারণের ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্ণ দায়িত্ব সরকারের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, ভারত পাকিস্থানের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করেছে, এই দোষটা ভারত নিজের ঘাড়ে নিতে চায় না। আজকের আলোচনায় যাঁরা যোগদান করেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম সচিব শ্রীকৃষ্ণকান্ত ছাড়া আর সকলেই তাড়াহুড়া করে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দেওয়ার জন্য সরকারকে সতর্ক করে দেন। তারা বলেন যে, বাংলাদেশকে এখন স্বীকৃতি দিলেই পাকিস্থানের সঙ্গে যুদ্ধ অনিবার্য হবে। শ্রীকৃষ্ণকান্তই একমাত্র সদস্য যিনি জরুরী মনোভাব সৃষ্টির জন্য বাংলাদেশকে এখনই স্বীকৃতিদানের দাবী জানান।

মুক্তিযুদ্ধকালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের অনানুষ্ঠানিক নিবিড় যোগাযোগ ছিল। তারপরও বাংলাদেশ বিষয়ে সার্বক্ষণিক তদারকির জন্য ভারত সরকার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নীতিনির্ধারণী কমিটির চেয়ারম্যান ডি পি ধরকে দায়িত্ব দেয়। তিনি বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেন। ডি পি ধর ১৯৭১ সালের ২৯ ও ৩০ আগস্ট সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে বাংলাদেশের

মুক্তিযুদ্ধকালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের অনানুষ্ঠানিক নিবিড় যোগাযোগ ছিল। তারপরও বাংলাদেশ বিষয়ে সার্বক্ষণিক তদারকির জন্য ভারত সরকার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নীতিনির্ধারণী কমিটির চেয়ারম্যান ডি পি ধরকে দায়িত্ব দেয়

১৯৭১ সালের ৫ জুলাই নয়াদিল্লিতে কংগ্রেস পার্লামেন্টারি দলের কার্যকরী কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের উপযুক্ত সময় নির্ধারণের দায়িত্ব সরকারের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়। সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্যে দেখা যায়, এই বৈঠকে ইন্দিরা গান্ধী জানিয়েছিলেন, যথাসময়েই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে। তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সমর্থনে ভারতীয় জনমত সংহত করার ব্যাপারে উদ্যোগী হওয়ার জন্য কংগ্রেস সদস্যদের আহ্বান জানান। সংবাদপত্রে প্রকাশিত ইন্দিরা গান্ধীর ভাষ্য:

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী আজ বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের সমর্থনে জনমত সংহত করার জন্য কংগ্রেস সদস্যদের আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে, সরকার যখন বুঝবেন যে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার সময় এসেছে তখনই সরকার স্বীকৃতি দেবেন, তার আগে সরকারকে স্বীকৃতি দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য করা যুক্তিযুক্ত হবে না। বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের এবং পাকিস্থানের বিরুদ্ধে 'চরম পন্থা' গ্রহণের ক্রমাগত দাবীর উত্তরে প্রধানমন্ত্রী উপরিউক্ত মন্তব্য করেন। কংগ্রেস

প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদসহ মন্ত্রিপরিষদের অন্যান্য নেতার সঙ্গে প্রথম আনুষ্ঠানিক বৈঠক করেন। পরে বিষয়টি তিনি সাংবাদিকদের জানান। প্রকাশিত তথ্যে দেখা যায়:

ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নীতিনির্ধারণী কমিটির চেয়ারম্যান এবং বাংলাদেশ বিষয়ে বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত ডি পি ধর ৩০ আগস্ট মুজিবনগরে বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদসহ সরকারি দলের অন্য নেতাদের সঙ্গে বাংলাদেশ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। একদিন আগে এই আলোচনা শুরু হয়। তাঁরা কয়েক দফা আলোচনা করেন। আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের নেতাদের সঙ্গে এই প্রথম ভারত সরকারের একজন উচ্চপদস্থ প্রতিনিধির আলাপ হলো। ডি পি ধর নিজে এই খবর কলকাতায় সাংবাদিকদের জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশ-সমস্যার নানা দিক বোঝার জন্যই বাংলাদেশের নেতাদের সঙ্গে এই আলোচনা। বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা একসঙ্গে বসে প্রস্তাব করেছেন, পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া আর কোনো মীমাংসা নেই। বাংলাদেশে সরকার একটি স্বাধীন সরকার। তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করে বোঝা গেছে, পূর্ণ স্বাধীনতার প্রশ্নে কোনো

> রফার কথা তাঁরা ভাবছে না। তাঁদের প্রতি ভারতের পূর্ণ সহানুভূতি রয়েছে।

আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের অনুকূলে জনমত সংগঠিত করার লক্ষ্যে ইন্দিরা গান্ধী দিনের পর দিন নিরলসভাবে কাজ করেছেন। এক্ষেত্রে তাকে গভীর প্রজ্ঞার পরিচয় দিতে হয়েছে। বাংলাদেশের পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করার জন্য ইন্দিরা গান্ধী দেশে দেশে দূত পাঠিয়েছেন। নিজেও বিভিন্ন দেশ সফর করেছেন। জাতিসংঘেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। এ প্রসঙ্গে 'মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদান' শীর্ষক গ্রন্থে সালাম আজাদ লিখেছেন:

> ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বহু দেশের বিশেষ দূত পাঠান। এই বিশেষ দূতদের মধ্যে ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও অভিজ্ঞ কূটনীতিবিদ। পরে ইন্দিরা গান্ধী নিজেও সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানি, অস্ট্রিয়াসহ বেশ কয়েকটি দেশ সফর করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিক্সন প্রশাসন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেয়। ফলে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর ছিল একটা তিক্ত অভিজ্ঞতা। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সহায়তা রাষ্ট্রপতি নিক্সনের পছন্দ ছিল না। পূর্ব পাকিস্তানের লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্তের বিনিময়ে পাকিস্তানের সঙ্গে সমঝোতায় আসার জন্য নিক্সন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ওপর চাপ সৃষ্টি করেন। কিন্তু ঐ চাপ উপেক্ষা করার সাহস শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ছিল। মার্কিন প্রশাসনের আচরণের বিপরীতে বাংলাদেশের প্রতি মার্কিন জনগণের বিপুল সহানুভূতি ছিল। তিনি ওয়াশিংটনে স্থানীয় প্রেস ক্লাবে ভাষণ দেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সফর শেষে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ফ্রান্সে যান। প্যারিসে ইউরোপের প্রথম সারির রাজনীতিবিদ, কূটনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমাবেশের আয়োজন করা হয়। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাঁদের বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক অবহিত করতে সক্ষম হন। ফলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ইউরোপের সহায়তা ও সহানুভূতি বেড়ে যায়। বাংলাদেশের ন্যায্য স্বার্থ প্রতিষ্ঠা করার জন্য জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ভারতের লড়াই করতে হয়।

১৯৭১ সালের ২৯ আগস্ট ভারত সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়, বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্বজনমত গঠনের জন্য ইন্দিরা গান্ধী বিভিন্ন দেশে দূত পাঠাবেন। তারা আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশ সফর করবেন। এই বিষয়ে প্রকাশিত তথ্যে দেখা যায়:

> ভারত সরকারের একজন মুখপাত্র ২৯ আগস্ট দিল্লিতে সাংবাদিকদের জানান, ২৪ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের অধিবেশন শুরু হওয়ার আগে বাংলাদেশ সম্পর্কে ভারতের বক্তব্যের পক্ষে সমর্থন আদায়ের জন্য প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী চারজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশে পাঠাচ্ছেন। তাঁরা ওই দেশগুলোর সরকারের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের কাছে বাংলাদেশ সম্পর্কে ভারতের বক্তব্য বিশদভাবে বুঝিয়ে বলবেন এবং তাঁরা যাতে ভারতকে সমর্থন করেন, তার চেষ্টা চালাবেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজবাহাদুর এবং কে সি পন্থ দক্ষিণ আমেরিকার দেশ এবং গোখলে ও ঘনশ্যাম ওঝা আফ্রিকার দেশগুলো সফর করবেন। কে সি পন্থ ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের দেশগুলোতেও যাবেন।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ছয় মাস ধরে বাংলাদেশের পক্ষে নানা ধরনের কূটনৈতিক তৎপরতা চালানোর পর ১৯৭১ সালের ২৪ অক্টোবর ইন্দিরা গান্ধী নিজেই ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ও যুক্তরাষ্ট্র সফরে বের হন। একটানা তিন সপ্তাহের এই সফরে তিনি বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধানের সঙ্গে বৈঠক করেন। তাদের কাছে বাংলাদেশে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর গণহত্যা, মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের সব শ্রেণি-পেশার মানুষের অংশগ্রহণ, ভারতে বাংলাদেশের শরণার্থীদের অবস্থা এবং বাংলাদেশের স্বীকৃতির দাবির যথার্থতা তুলে ধরেন। তাঁর বিদেশযাত্রার খবর সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হয়:

> প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কুড়ি দিনের জন্য ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্র পরিভ্রমণ উদ্দেশ্যে আজ সকালে এখানে থেকে বিমানযোগে যাত্রা করেন। বাংলাদেশ ও ভারতের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ এমন কতকগুলি বিষয়ে পশ্চিমা নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনার জন্য শ্রীমতী গান্ধী তিন সপ্তাহের জন্য বিদেশ সফরে যাচ্ছেন। প্রথমে তিনি যাচ্ছেন ব্রাসেলসে। সকল দিক থেকে বিবেচনা করে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কূটনীতিক মিশন। বিমানে ওঠার আগে তিনি সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, গতকাল আমি যা বলেছি তারপর অতিরিক্ত আর কিছু বলার নেই। মন্ত্রিসভার সদস্য, সংসদ সদস্য, কূটনীতিক বিভাগের সদস্য এবং সরকারী ও বে-সরকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দ শ্রীমতী গান্ধীকে বিদায় সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। শ্রীমতী গান্ধী আশা করেন যে, পশ্চিমা নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনাকালে তিনি বাংলাদেশ প্রশ্নে ভারতের গভীর আগ্রহ, ভারতের ধৈর্য্য ও সংযমের কথা এবং বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দের সঙ্গে একটা মীমাংসায় উপনীত হওয়ার জন্য ইসলামাবাদের উপর পশ্চিমা শক্তিবর্গ বিশেষ করে বৃটিশ ও আমেরিকার চাপ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা বুঝাতে পারবেন।
>
> পশ্চিমা মহল বলেন, বৃটিশ ও আমেরিকার নেতারা আশা করেন যে, তারা ভারতের নীতির সামান্য পরিবর্তন সাধন এবং একক পাকিস্থান কাঠামোর মধ্যে মীমাংসার জন্য বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দের উপর তাঁর প্রভাব বিস্তারে শ্রীমতী গান্ধীকে তাঁরা রাজী করাতে পারবেন। কিন্তু রাজধানীর পর্যবেক্ষকগণ মনে করেন যে, শ্রীমতী গান্ধী এ ধরনের ভূমিকা গ্রহণে অথবা বাংলাদেশ প্রসঙ্গটিকে ভারত-পাকিস্থান সমস্যায় রূপান্তরিত করতে অসম্মত হবেন। পূর্ববঙ্গের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে গ্রহণযোগ্য যে কোন মীমাংসা ভারত মেনে নেবে। তবে মীমাংসার জন্য আলোচনা করতে হবে। ইসলামাবাদকে এবং পশ্চিমা নেতৃবৃন্দ ইচ্ছা করলে ইসলামাবাদ ও বাংলাদেশের নেতাদের মধ্যে মধ্যস্থতা করতে পারেন, একথা শ্রীমতী গান্ধী সুস্পষ্টভাবেই বলবেন বলে আশা করা যায়।

বাংলাদেশের পক্ষে সমর্থন আদায়ের জন্য ইন্দিরা গান্ধীর কূটনৈতিক সফর শুরুর দুদিন আগেই তার সফরসূচি প্রকাশ করা হয়। এই সফরসূচিতে কবে, কোথায়, কার সঙ্গে, কখন তিনি বৈঠক করবেন, এর বিবরণ তুলে ধরা হয়। ১৯৭১ সালের ২১ অক্টোবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়, ইন্দিরা গান্ধী ২৪ অক্টোবর যাত্রা শুরু করবেন এবং ১৩ নভেম্বর ভারতে ফিরে আসবেন। বিস্তারিত সফরসূচিতে লেখা হয়:

> প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ৪ঠা নভেম্বর দুদিনব্যাপী সফরোদ্দেশ্যে ওয়াশিংটনে পৌঁছেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট মি: রিচার্ড নিকসনের সঙ্গে বাংলাদেশ-সহ আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করবেন। শ্রীমতী গান্ধী এর আগে ইউরোপে বৃটেন প্রধানমন্ত্রী মি: এডওয়ার্ড হীথ, বেলজিয়াম প্রধানমন্ত্রী মি: জি আই স্কেনম এবং অষ্ট্রিয়ার চ্যান্সেলার ক্রিস্কির সঙ্গেও অনুরূপ আলোচনা করবেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে শ্রীমতী গান্ধী প্যারিসে ফরাসী প্রধানমন্ত্রী এবং বনে জার্মান প্রজাতন্ত্রের চ্যান্সেলার উইলি ব্রান্টের সঙ্গে দেখা করার জন্য পুনরায় ইউরোপে ফিরে আসবেন।
>
> **২৪শে অক্টোবর সফর আরম্ভ:** শ্রীমতী গান্ধী আগামী ২৪শে অক্টোবর পশ্চিমা দেশগুলিতে তাঁর সফর আরম্ভ করবেন।

> দীর্ঘ লড়াই-সংগ্রাম আর নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন হওয়ার পর বিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠন ছাড়াও তৎকালীন সরকারের সামনে একটা বড়ো চ্যালেঞ্জ ছিল দ্রুততম সময়ে বাংলাদেশের পক্ষে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায় করা

> সংসদের অধিবেশন শুরু হওয়ার দুদিন পূর্বে ১৩ই নভেম্বর প্রাতে তিনি নয়াদিল্লীতে ফিরে আসবেন। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যাবেন পররাষ্ট্র সচিব শ্রী টি এন কল, প্রধানমন্ত্রীর সেক্রেটারী শ্রী পি এন হ্যকসার (ভিয়েনায় ইনি প্রধানমন্ত্রীর দলে যোগদান করবেন), পররাষ্ট্র দপ্তরের যুগ্মসচিব শ্রী আর ভি সাথে, তথ্য-উপদেষ্টা শ্রী এইচ ওয়াই সারদা প্রসাদ এবং প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরখানার ডেপুটি সেক্রেটারী শ্রী এন মালহোত্রা। যে-সব পশ্চিমা রাজধানীতে তিনি সফর করবেন, সর্বত্রই তিনি সরকারী নেতাদের ছাড়াও বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে দেখা করবেন। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন দেশের বিশিষ্ট সংসদ সদস্য, সম্পাদক, গ্রন্থকার এবং শিল্পীদের সঙ্গেও তআর আলোচনা হবে। তিনি কয়েকটি স্থানে টেলিভিশন সাক্ষাৎকার ও সাংবাদিক সম্মেলনেও তাঁর বক্তব্য রাখবেন।

বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্ব জনমত তৈরির জন্য ব্যাপক তৎপরতা চালিয়ে তিন সপ্তাহ পর ইন্দিরা গান্ধী ভারতে ফিরে আসেন। ১৯৭১ সালের ১৩ নভেম্বর নয়াদিল্লিতে বিমান থেকে নেমেই তিনি তার সফরের ফল সম্পর্কে সাংবাদিকদের অবহিত করেন। ইন্দিরা গান্ধীর বক্তব্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়:

> প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আজ এখানে বলেন যে, গত তিন সপ্তাহ তিনি যে সব দেশ সফর করে এলেন, সে সব দেশের নেতারা এখন বাংলাদেশের সঙ্কটের গুরুত্ব সম্পর্কে অধিকতর সজাগ হয়েছেন। শ্রীমতী গান্ধী আশা প্রকাশ করেন যে, এসব দেশের ফলপ্রসূ হস্তক্ষেপের ফলে পূর্ববঙ্গের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য একটি রাজনৈতিক সমাধান আসন্ন হবে।
>
> দিল্লী বিমান বন্দরে ফিরে আসার পর মুহূর্তে সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে তিনি ঘোষণা করেন যে, শুধু নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই কোনও সমাধান গ্রহণ বা বর্জন করতে পারেন। দিল্লী থেকে আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি জানাচ্ছেন: পূর্ববঙ্গের নেতাদের সঙ্গে রাজনৈতিক সমাধান খুঁজে বের করার জন্য জেনারেল ইয়াহিয়া খাঁর উদ্যোগী হওয়া উচিত বলে ভারত যে অভিমত ব্যক্ত করেছে, প্রেসিডেন্ট নিকসন, প্রেসিডেন্ট পম্পিদু, চ্যান্সেলর ব্লাস্ট, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মি: হীথ, চ্যান্সেলর ক্লিসুকি প্রভৃতি বিশ্বের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ তা সমর্থন করেছেন। তাঁদের মতে, এ ছাড়া আর কোন পথ নেই, আর কোন ভাল বিকল্প নেই।

ভারতের বিভিন্ন রাজনীতিবিদসহ বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের সমর্থন

মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের মানুষ ভারতের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার জনসাধারণ এবং নানা দলমতের রাজনীতিবিদদের সাহায্য-সহযোগিতা পায়। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার মাত্র চারদিনের মাথায় বাংলাদেশকে সহায়তা করার জন্য ভারতের রাজনৈতিক দলগুলো মিলে বিভিন্ন প্ল্যাটফরম তৈরি করে। তারা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে আহ্বান জানায়। এ প্রসঙ্গে 'মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদান' শীর্ষক গ্রন্থে সালাম আজাদ লিখেছেন:

> ৩০ এবং ৩১ মার্চের ভেতর কংগ্রেস, সিপিআই, সিপিএম, ফরওয়ার্ড ব্লক এবং অন্যান্য দলের উদ্যোগে 'বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রাম সহায়ক সমিতি', 'বাংলাদেশ সংহতি ও সাহায্য কমিটি' এবং 'যুক্ত বাংলাদেশ মুক্তিসংগ্রাম সহায়ক সমিতি' গঠিত হয়। কংগ্রেসের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির প্রধান ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী অজয় কুমার মুখার্জি। উপ-মুখ্যমন্ত্রী বিজয় সিংহ নাহার এবং সাংসদ সমর গুহ ছিলেন যথাক্রমে কমিটির কার্যকরী সভাপতি এবং সহ-সভাপতি। সি.পি.এম গঠিত কমিটিতে জ্যোতি বসুকে সভাপতি করা হয়। সুধীন কুমার এবং কৃষ্ণপদ ঘোষ ছিলেন যথাক্রমে এই কমিটির সাধারণ সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষ। মুক্তিযোদ্ধাদের সব রকম সাহায্য করা ছাড়াও এই কমিটিগুলো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে স্বীকৃতিদানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে আহ্বান জানায়। তাছাড়া ৩০ মার্চ থেকে সংবাদপত্র মারফত শিল্পী, লেখক ও বুদ্ধিজীবীরাও একই দাবি তোলেন।

১৯৭১ সালের ৫ এপ্রিল নয়াদিল্লিতে রাজ্যসভায় আলোচনার সময় দুজন সদস্য বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদান এবং বাংলাদেশের জনসাধারণকে সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। রাজ্যসভায় সেদিনের সভাপতি ডেপুটি স্পিকার তাদের দুজনের বক্তব্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সংসদবিষয়ক প্রতিমন্ত্রীকে দায়িত্ব দেন। সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই খবরে বলা হয়:

> আজ রাজ্য সভায় রাষ্ট্রপতির ভাষণ নিয়ে আলোচনার সময় দুজন সদস্য নির্দলীয় শ্রী ভি এল সেনগুপ্ত এবং এস এস পি শ্রীরাজ নারায়ণ ভারত সরকারকে বাংলাদেশ সরকার মেনে নিতে বলেন এবং সমর সম্ভারসহ সর্বতোভাবে বাংলাদেশের সংগ্রামী জনগণকে সমর্থন দানের দাবী জানান। এ ব্যাপারে তাঁরা প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে একটা বিবৃতিও দাবী করেন। এ দিনের সভাপতি ডেপুটি চেয়ারম্যান শ্রী খোবরাখারে সংসদীয় বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী শ্রী ওম মেহতাকে কথাগুলো প্রধানমন্ত্রীর কাছে পৌঁছে দিতে বলেন, যাতে তিনি রাষ্ট্রপতির অভিভাষণের আলোচনায় উত্তরদান প্রসঙ্গে এ বিষয়ে কিছু বলেন।

১৯৭১ সালের ২৯ এপ্রিল ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিআই) নেতা অধ্যাপক হীরেন মুখার্জি এক বিবৃবিতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য ভারত সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। বাংলাদেশে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বরতার বিরুদ্ধে ভারতের তীব্র প্রতিবাদ জানানো উচিত। এ প্রসঙ্গে সংবাদপত্রের খবরে লেখা হয়:

> সিপিআই নেতা অধ্যাপক হীরেন মুখার্জি এমপি আজ এক বিবৃতিতে অবিলম্বে বাঙলাদেশকে কার্যত স্বীকৃতি দান ও তাড়াতাড়ি ভারতীয় সংসদের একটি অধিবেশন আহ্বানের দাবী জানিয়েছেন। তিনি বলেন, পররাষ্ট্র মন্ত্রী স্মরণ সিং বাঙলাদেশকে স্বীকৃতিদানের প্রশ্ন সম্বন্ধে নিশ্চুপ রয়েছেন। তিনি মনে করেন, সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব ঘটলে পাকিস্থান এই সুযোগ নিয়ে এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি করবে আমাদের পক্ষে যা অসহনীয় হয়ে উঠতে পারে।

১৯৭১ সালের ৭ মে বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদান এবং মুক্তিযুদ্ধে অস্ত্রসহ সব ধরনের সাহায্য দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা সর্বসম্মত প্রস্তাব অনুমোদন করে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে বলা হয়, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদান ও বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র সাহায্য দেওয়ার প্রস্তাব করেছে। খবরে লেখা হয়:

> অনতিবিলম্বে সাড়ে সাত কোটি মানুষের বাংলাদেশের সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ও তার সরকারকে স্বীকৃতি এবং অস্ত্রসস্ত্র-সহ সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় কার্যকরী সাহায্য দিতে হবে। বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ নরনারী যখন বুকের রক্ত দিচ্ছেন, তখন পশ্চিমবঙ্গের জনগণ এর কমে কিছুতেই রাজী হতে পারেন না। 'বাংলাদেশের জনগণের জাতীয় স্বাধীনতার জন্য মরণপণ সংগ্রামের প্রতি ভারত সরকারের আশু ও জরুরী কর্তব্যের কথা বিবেচনা করে' পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সাড়ে চার কোটি মানুষের প্রতিনিধিবৃন্দ আজ বিধানসভায় সর্বসম্মতিক্রমে যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন, তাতে উপরোক্ত দাবীর কথাই ঘোষিত হয়েছে।

১৯৭১ সালের ২৫ মে ভারতের সংসদেও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি ওঠে। বাংলাদেশকে অবিলম্বে স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যাপারে ভারতের সামনে কোনো বাধাই থাকতে পারে না। সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে লেখা হয়:

> আজ লোকসভায় বাংলাদেশ সম্পর্কিত বিতর্কের সূচনা করে প্রাক্তন আইনমন্ত্রী ও কংগ্রেস (শা) পরিষদীয় দলের অন্যতম প্রবীণ নেতা শ্রী এ কে সেন অবিলম্বে বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতির দাবী জানিয়ে বলেন, শুধু বাংলাদেশে গণহত্যা বন্ধের জন্যই নয়, ভারতের নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব ও মর্যাদা রক্ষার জন্যও সাহস ও শক্তির সঙ্গে কাজ করতে হবে। তিনি বলেন, পাকিস্তানসহ সারা বিশ্ব আজ শুধু শক্তির ভাষাই বোঝে। শাসক কংগ্রেসের কয়েকজন সদস্য অবশ্য বাংলাদেশকে অবিলম্বে স্বীকৃতি দানের প্রশ্নে ভিন্ন মত প্রকাশ করেন। কিন্তু শ্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী (জ-স), শ্রী দশরথ দেব (মা: কম্যু), অধ্যাপক হীরেন মুখার্জি (সি পি) প্রমুখ সদস্যগণ তীব্র তীক্ষ্ণ ভাষায় সরকারী গড়িমসির নিন্দা করেন ও অবিলম্বে বাঙলাদেশকে স্বীকৃতি দানের দাবী জানান। রাজ্যসভাও বাংলাদেশকে সমর্থনের দাবীতে সোচ্চার হয়ে ওঠে।

বাংলাদেশের পক্ষে মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসব্যাপী নানামুখী কূটনৈতিক, সামরিক ও মানবিক তৎপরতার পর ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর ভারত সরকার বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। ভারতের এই স্বীকৃতি ঘোষিত হয় মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের ১০ দিন আগেই। সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্যে দেখা যায়:

> ভারত সরকার আজ গণপ্রজাতন্ত্রী বাঙলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এই স্বীকৃতির ফলে এই উপমহাদেশে একটি স্বাধীন সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের অভ্যুদয় আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত হলো। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আজ সকালে সংসদের অধিবেশনে বাঙলাদেশকে স্বীকৃতিদানের গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণাটি করেন এবং উভয় সভার সদস্যগণই দাঁড়িয়ে এই ঘোষণাকে স্বাগত জানান। সেই সঙ্গে সংসদ কক্ষে প্রবল হর্ষধ্বনি উত্থিত হয় এবং সদস্যবর্গ উৎসাহ আবেগে মিলিয়ে ধ্বণি তোলেন–'জয় বাঙলা', 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ'।

নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধের ফলে অর্জিত হয় স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। এক্ষেত্রে প্রকৃত বন্ধুরাষ্ট্র হিসাবে হাত বাড়িয়েছিল ভারত। এ প্রসঙ্গে 'মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদান' শীর্ষক গ্রন্থে সালাম আজাদ লিখেছেন:

> পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বর্বর নির্যাতনের শিকার হয়ে বাংলাদেশ থেকে শরণার্থীরা ভারতের ভূণ্ডে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। প্রায় এক কোটি শরণার্থীকে ভারতের জনগণ ও সরকার হাসিমুখে আশ্রয় ও খাদ্য সহায়তা প্রদান করে। শুধু তাই নয়, মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং, অস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ করে। এসব কাজে তখন ভারতকে খরচ করতে হয়েছিল সাত হাজার কোটি টাকা। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মিত্র বাহিনীর ভূমিকা রাখতে ভারতকে হারাতে হয়েছিল বহু অফিসার ও সৈনিককে। ১৯৭১ সালে পূর্ব ও পশ্চিম রণাঙ্গন মিলে শহীদ ভারতীয় সৈন্যের সংখ্যা ৩,৬৩০ জন। নিখোঁজ ২১৩ জন এবং আহত ৯,৮৫৬ জন। যাঁদের রক্ত এই স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে মিশে রয়েছে।

উপসংহার

মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের পথপরিক্রমা যেমন ছিল কঠিন ও রক্তাক্ত, তেমনই বিশ্বমানচিত্রে আলাদা অবস্থান তৈরিও সহজ ছিল না। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিজয় অর্জনের আগেই স্বাধীন দেশ হিসাবে বাংলাদেশকে ভারত ও ভুটান স্বীকৃতি দিলেও বিজয় অর্জনের পর শিশুরাষ্ট্র বলে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন বাংলাদেশের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়।

দীর্ঘ লড়াই-সংগ্রাম আর নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন হওয়ার পর বিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠন ছাড়াও তৎকালীন সরকারের সামনে একটা বড়ো চ্যালেঞ্জ ছিল দ্রুততম সময়ে বাংলাদেশের পক্ষে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায় করা। নানা বাধাবিপত্তির পরও দেখা যায়, স্বাধীন হওয়ার চার বছরেরও কম সময়ে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র হয়েছিল আর শতাধিক দেশের স্বীকৃতি আদায় করতে সক্ষম হয়েছিল। তৎকালীন ভূরাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে স্বাধীন দেশ হিসাবে স্বীকৃতি আদায় করতে ভিন্ন এক বাস্তবতার মুখোমুখী হতে হয় বাংলাদেশকে। এর অন্যতম একটি কারণ ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী বিশ্বব্যবস্থায় বাংলাদেশই প্রথম দেশ, যা উপনিবেশ থেকে স্বাধীন হওয়া কোনো দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীনতা অর্জন করে। যে কারণে বাংলাদেশের সরকারকে স্বাধীন দেশ হিসাবে নিজেকে বিশ্বদরবারে প্রতিষ্ঠিত করতে জোর কূটনৈতিক তৎপরতা চালাতে হয়।

নানা কূটনৈতিক তৎপরতায় বিভিন্ন দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে শুরু করে। একে একে অনেক দেশই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। তবে অনেক দেশের স্বীকৃতিপ্রাপ্তির বিষয়টি খুব মসৃণ ছিল না। মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী কিংবা পাকিস্তানের পক্ষের অনেক দেশ পরিস্থিতির কারণে স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। পাকিস্তানও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য, কিছু দেশের স্বীকৃতি পাওয়া যায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মর্মান্তিক মৃত্যুর অব্যবহিত পর।

বাংলাদেশকে ১৫০টি দেশ আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিয়েছে। ২০১৭ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদে এ বিষয়ে তথ্য প্রকাশ করেন তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী। সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়। এতে লেখা হয়:

> পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী জানিয়েছেন, ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে সর্বপ্রথম ভুটান স্বীকৃতি প্রদান করে। ভুটান ও ভারত উভয় দেশই বাংলাদেশকে ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর স্বীকৃতি দিয়েছিল। তবে ভারতের কয়েক ঘণ্টা আগে ভুটান স্বীকৃতি দিয়ে তারবার্তা পাঠায়। সর্বশেষ দেশ হিসেবে চীন বাংলাদেশকে ১৯৭৫ সালের ৩১ আগস্ট স্বীকৃতি প্রদান করে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর আনুষ্ঠানিকভাবে মোট ১৫০টি দেশ স্বীকৃতি প্রদান করে।

সংবাদপত্র প্রভাবশালী গণমাধ্যম। স্বাভাবিকভাবেই সংবাদপত্রে চলমান ঘটনাপ্রবাহের প্রতিফলন ঘটে। সমকালীন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংবাদপত্রে গুরুত্বলাভ করে। স্বাধীনতা অর্জনের অব্যবহিত পর থেকে শুরু করে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশকে বিভিন্ন দেশের স্বীকৃতি প্রদান সংক্রান্ত তথ্য সংবাদপত্রে গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়।

তথ্যসূত্র

১. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র: চতুর্থ খণ্ড, সম্পাদক: হাসান হাফিজুর রহমান, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, নভেম্বর ১৯৮২।
২. বঙ্গবন্ধু: স্বাধীনতার ঘোষক: ঐতিহাসিক দলিল, ঢাকা: প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি), আগস্ট ২০০৯।
৩. বঙ্গবন্ধু ভাষণ, ঢাকা: চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, জানুয়ারি ২০১২।
৪. বাংলাপিডিয়া, খণ্ড ১১, প্রধান সম্পাদক: সিরাজুল ইসলাম, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, জুন ২০১১।
৫. আফসান চৌধুরী, বাংলাদেশ ১৯৭১: প্রথম খণ্ড, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারি ২০০৭।
৬. K M Shehabuddin, There and Back Again : A Diplomat's Tale, Dhaka: UPL.
৭. তাজুল মোহাম্মদ, মুক্তিযুদ্ধ ও প্রবাসী বাঙ্গালী সমাজ, ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০০১।
৮. সালাম আজাদ, মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদান, ঢাকা: অংকুর প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০১২।
৯. ড. কামরুল হক, সংবাদপত্রের নামফলক ছাড়িয়ে বঙ্গবন্ধু, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি), আগস্ট ২০২০।
১০. যুগান্তর (কলকাতা)
১১. প্রথম আলো
১২. বাংলাদেশ প্রতিদিন
১৩. দৈনিক জনকণ্ঠ
১৪. বাংলা ট্রিবিউন
১৫. বাংলা নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম
১৬. বিবিসি বাংলা

লেখক: গবেষণা বিশেষজ্ঞ (তথ্যপ্রযুক্তি), চলতি দায়িত্ব
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

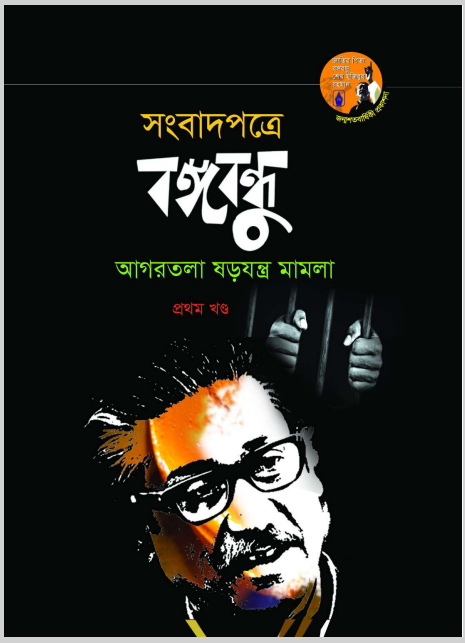

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

স্বাধিকার-স্বাধীনতাসংগ্রামে 'দ্য পিপল' এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়

শাহ শেখ মজলিশ ফুয়াদ

"অসহযোগ আন্দোলনের আরেক প্রবল সমর্থক পত্রিকা ছিল আবিদুর রহমান সম্পাদিত ইংরেজি দৈনিক 'দ্য পিপল'। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ভূমিকাকে সম্ভবত সবচেয়ে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করা হয় এই পত্রিকায় এবং 'দ্য পিপল'-এই প্রথম পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে 'অকুপেশন আর্মি' বলে অভিহিত করা হয়।" (সুব্রত শঙ্কর ধর, বাংলাদেশের সংবাদপত্র: ১৯৪৭-১৯৭১, বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ, ২১ ডিসেম্বর ১৯৮৫, পৃ. ৯৮)

"ঢাকায় পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী 'দ্য পিপল'-এর অফিস পুড়িয়ে দেওয়ার পর সম্পাদক আবিদুর রহমান মুজিবনগর থেকে সাপ্তাহিক হিসাবে 'দ্য পিপল' প্রকাশ করেন ১৯৭১ সালের মে মাসে। দেশের ভেতরে এবং বাইরে পত্রিকাটির প্রচার ছিল যথেষ্ট। বস্তুত বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের খবর পৌঁছে দেওয়ায় এবং বাংলাদেশের পক্ষে আন্তর্জাতিক জনমত গঠনে অনেকখানি ভূমিকা পালন করেছে 'দ্য পিপল'।" (সুব্রত শঙ্কর ধর, বাংলাদেশের সংবাদপত্র: মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১২)

বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতাসংগ্রামের প্রস্তুতিপর্বে বঙ্গবন্ধুর ডাকে অসহযোগ আন্দোলনে এবং এরও আগে স্বাধিকার আন্দোলনকালে ইংরেজি ভাষায় সাংবাদিকতার ইতিহাসে অবিস্মরণীয় নাম 'দ্য পিপল'-এর সম্পাদক আবিদুর রহমান। আবিদুর রহমান সম্পর্কে গবেষক শেখ শামসুল হক 'স্বদেশপ্রেমের কবি আবিদুর রহমান' শীর্ষক নিবন্ধে লিখেছেন, "সাংবাদিক ও কবি আবিদুর রহমানকে জানলাম ১৯৭৬ সালের দিকে। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি যৌথ সংকলন করছি। সেই সংকলনে একটি বিজ্ঞাপন আনতে তার টয়েনবি সার্কুলার রোড, আমিন

কোর্টের পেছনের অফিসে যাই। তখন তিনি আমাকে দেখে খুব আতিথেয়তা করলেন। সেই সঙ্গে অনেক সময় নিয়ে গল্প করলেন। বললেন, 'তোমরাই জাতির ভবিষ্যৎ। পড়াশোনায় মনোযোগী হও।' সেই সংকলনে একটা বিজ্ঞাপন দিলেন নিপ্পন গ্রুপের। এরপর অনেক কথা বলতে হয়। অন্য অনেকের মতো আমি তাঁর বহুমুখী প্রতিভার কথা জানি। তিনি কাউকে কখনো খালি হাতে ফেরাননি। অনেককেই চাকরি দিয়েছেন। অনেক কবি, সাংবাদিক তাঁর প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছেন।

হবিগঞ্জের মইছপুর মামার বাড়িতে জন্ম হলেও পিতৃনিবাস ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বেড়ে ওঠেন। পড়াশোনা করেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও ঢাকায়। কর্মজীবনের প্রথমে তিনি ছাত্র থাকাকালীন ব্রাহ্মণবাড়িয়া কলেজে শিক্ষকতা করেছেন। তিনি মেধাবী ছিলেন বিধায় কর্তৃপক্ষ কলেজের আইন পরিবর্তন করে তাকে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ দেন। কতটা মেধাবী হলে ছাত্রাবস্থায় একই কলেজে শিক্ষক হন, সেটা সহজেই বোঝা যায়।

তিনি একজন কবি, গীতিকার, সুরকার, নাট্যকার, চলচ্চিত্রকার, প্রযোজক, সাংবাদিক, ব্যাংকার, ব্যবসায়ী ও রবীন্দ্রগবেষক। সাংবাদিক হিসাবে তার 'দ্য পিপল' ও 'গণবাংলা' এদেশের সর্বসাধারণের অধিকারের কথা তুলে ধরেছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে তিনি এদেশের গণমানুষের কথা, স্বাধীনতার কথা তার পত্রিকায় নির্দ্বিধায় প্রকাশ করেছেন। ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণাকে তার পত্রিকায় 'Mujib Declares Independence, A New Nation Born In Bangladesh. Withdraw Alien Barbarous Army' এবং 'পাকিস্তানি বাহিনীর গুলিতে তিন বাংলাদেশি নিহত', 'বাঙালি অস্ত্র ধরো' প্রভৃতি শিরোনামে তুলে ধরেছেন। 'দ্য পিপল' পত্রিকায় এ নিউজ ছাপার পর পাকিস্তান সরকার তাকে গ্রেফতার করার জন্য রাও ফরমান আলী বঙ্গবন্ধুকে ফোন করেছেন। আবিদুর রহমানকে মৃত্যুর হুমকি দেওয়া হয়। কিন্তু বঙ্গবন্ধু হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করায় তাকে গ্রেফতার করেনি। তবে এই জের তোলে সেই ২৫ মার্চের কালরাত্রিতে। তার সেই 'পিপল' পত্রিকার অফিসে গ্রেনেড হামলা চালিয়ে ভবনসহ উড়িয়ে দেওয়া হয়। ভাগ্য যে তিনি সেদিন পত্রিকা অফিসে ছিলেন না। সেই হামলায় ছয়জন স্টাফ প্রাণ হারান। পাকিস্তান আর্মি প্রথমে যে মামলা করে পাঁচজনের বিরুদ্ধে, তাদের মধ্যে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, আবদুল মান্নান, তোফায়েল আহমেদ–এই চারজন রাজনৈতিক নেতা আর সাংবাদিক হিসাবে একমাত্র আবিদুর রহমানের নামে মামলা হয়। প্রত্যেক আসামিকে তাদের অনুপস্থিতিতে ৫০ ভাগ সম্পত্তি বাজেয়াপ্তসহ ১৪ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। পরে আবিদুর রহমান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন কলকাতার 'লোকসেবক' অফিস থেকে পত্রিকা দুটি প্রকাশ করেন। তার পত্রিকায় বিশ্বের অনেক নামকরা সাংবাদিক কাজ করেছেন। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আবিদুর রহমানের একান্ত ঘনিষ্ঠতা ছিল। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে আবিদুর রহমান লিখেছেন বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারিতে: 'বঙ্গবন্ধু ফিরে এলে তোমার স্বপ্নে স্বাধীন বাংলায় তুমি আজ, ঘরে ঘরে এত খুশি তাই, কী ভাল তোমাকে বাসি আমরা, বল কি করে বুঝাই। সারাটা জীবন তুমি জেলে জেলে থাকলে আর তব স্বপ্নের সুখী এক বাংলার ছবি শুধু আঁকলে, তোমার নিজের সুখসম্ভার কিছু আর দেখলে না তাই' (বিপন্ন বলয়)। এই গান শুনে বঙ্গবন্ধু চোখের জল ফেলেছেন। কাজেই বঙ্গবন্ধুর কত কাছের মানুষ ছিলেন আবিদুর রহমান, তা সহজেই অনুমেয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে 'দ্য পিপল' পত্রিকার অবদান এককথায় সবচেয়ে উজ্জ্বল, অবিস্মরণীয়। ১৯৭৫ সালের ২২ আগস্ট তাকে ও তোফায়েল আহমেদকে গ্রেফতার করে ময়মনসিংহ কারাগারে রাখা হয়। ১০ মাস কারাভোগের পর মুক্তি পেয়ে প্রথমে ইউরোপ, পরে অস্ট্রিয়া এবং শেষে লন্ডন চলে যান। এ দুটি পত্রিকা ছাড়াও তিনি সম্পাদনা করেছেন ১৯৫৬-৫৭ সালে 'দ্য লরেল', লন্ডন থেকে 'দ্য ওয়ার্ল্ড টাইমস' ও জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর দেশে ফিরে 'দি ইলাস্ট্রেটেড নিউজ উইকলি'।

আবিদুর রহমান ছাত্রজীবন থেকেই বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগের ডিবেটিং সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক এবং ন্যাশনাল ডিবেটিং ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। বিভিন্ন সভা, সেমিনার ও টকশোতে সংকট মুহূর্তে দেশের মানুষকে তিনি আজীবন দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। কর্মজীবনে মানুষের উপকারে তিনি সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। একজন মানুষের এত গুণ, কোনটা রেখে কোনটাতে তিনি সফল–এই প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয়, কবি আবিদুর রহমান সবটাতেই একজন সফল মানুষ।" (বাংলা কবিতাডটকম, ১০ জুলাই ২০১৭)

বাঙালির স্বাধিকার ও স্বাধীনতার আন্দোলন-সংগ্রামে 'দ্য পিপল'-এর গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা অনস্বীকার্য। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ছয়দফা আন্দোলন বাংলার জনগণের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য বাংলা ভাষার পত্রিকা দৈনিক ইত্তেফাক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ইংরেজি পত্রিকা দ্য পাকিস্তান অবজারভার ও মর্নিং নিউজ ছিল পাকিস্তানঘেঁষা। দ্য পাকিস্তান অবজারভারের মালিক নিজেই ছিলেন মুসলিম লীগের একজন শীর্ষনেতা এবং মর্নিং নিউজ ছিল সরকারি ট্রাস্টের পত্রিকা। ওই অবস্থায় স্বাধিকার আন্দোলনে বাঙালির দাবিদাওয়া, চিন্তাচেতনা তুলে ধরার জন্যই মূলত 'দ্য পিপল'-এর জন্ম। ফলে এর ভূমিকা কী হতে পারে, তা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। সামরিক শাসনামলের মধ্যে ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলনে 'দ্য পিপল' কী অপরিসীম সাহসিকতায় ঘটনাপ্রবাহের সংবাদ প্রকাশে যথার্থ ভূমিকা রেখেছিল, তা এর প্রকাশিত সংবাদগুলোর দিকে তাকালেই বোঝা যায়। ১ থেকে ১০ মার্চ প্রকাশিত 'দ্য পিপল'-এর সংবাদ শিরোনামগুলো এখানে তুলে ধরা হলো:

১ মার্চ পাকিস্তানি সামরিক জান্তা জেনারেল ইয়াহিয়া আকস্মিকভাবে জাতীয় সংসদ অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করলে বিক্ষুব্ধ জনতা ঢাকার সর্বত্র বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। এই পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু ঢাকায় বললেন ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে তিনি পরবর্তী বিস্তারিত কর্মসূচি ঘোষণা করবেন। পরদিন 'দ্য পিপল'-এ ৮ কলাম ব্যানার-শিরোনামে সংবাদটি ছিল: 'Mujib's Call for Emancipation of Bengalees, United Fight to be Put Up For Ending Colonial Treatment'. ৩ কলামের অপর একটি সংবাদের শিরোনাম ছিল: 'Hartal Today and Tomorrow: Race Course Rally on March 7'। বস্তুত বাঙালি ও বাংলাদেশের জন্য বঙ্গবন্ধুর সব বক্তৃতা-বক্তব্য-ভাষণ ও চিন্তাচেতনা 'দ্য পিপল'-এ যেন জীবন্ত ও মূর্ত হয়ে প্রকাশিত হতো।

৩ মার্চেও ৮ কলাম ব্যানার শিরোনাম করেছিল 'দ্য পিপল': 'MUJIB STRONGLY CONDEMNS FIRING. Bangaldesh Cannot be Suppressed As Colony Anymore'। ৬ ও ৭ মার্চে দ্য পিপলের ব্যানার শিরোনাম: 'Mujib in Effective Control of Govt. Administrative And Coercive Forces Including Communications And Other Essential Sectors At His Absolute Command' এবং 'Mujib Speaks At Race Course Today. Momentous Decision on The Fate of Bangladesh To be Announced.'। পরদিন ৮ মার্চ 'দ্য পিপল'-এর ব্যানার শিরোনাম:

20 Lacs attend Race Cource Meeting
MUJIB'S CALL TO FIGHT FOR FREEDOM
No Work In Govt. Offices Until demands Met

Shops To Open, Trains to Run, Buses To Ply And Banks To Work 2 Hours A-Day. Withdrawal Of Martial Law And Transfer of Power Precondition for Attending N. A.

৯ মার্চ ঢাকার পল্টন ময়দানের জনসভায় মওলানা ভাসানীর বক্তৃতার সংবাদটিও পরদিন ১০ মার্চ ব্যানার শিরোনাম করেছিল 'দ্য পিপল':

Meeting At Paltan

BHASHANI PLADGES HIS UNFETTERED SUPPORT TO MUJIB

Ready To Launch Movement If Sheikh's Demand Not Met.

'দ্য পিপল' সম্পর্কে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালক একুশে পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক জাফর ওয়াজেদের বক্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, "পিপল পত্রিকাটি তখন নতুন এসেছে, শেরাটন হোটেলের (বর্তমান ইন্টারকন্টিনেন্টাল, ১৯৭১ সালেও হোটেলটির নাম ইন্টারকন্টিনেন্টাল ছিল) উলটাদিকে ছিল পিপল পত্রিকার অফিস। পিপলের সম্পাদক ছিলেন আবিদুর রহমান। তিনি বঙ্গবন্ধুর খুব কাছের লোক ছিলেন। তার গাড়ির ব্যাবসা ছিল। তিনি জাপান থেকে গাড়ি আমদানি করে বিক্রি করতেন। নিপ্পন মোটর্সের মালিক। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তার ভালো সম্পর্ক ছিল। 'দ্য পিপল' পত্রিকাটি তখন জনগণের মুখপত্র হয়ে গেল। ইংরেজি দৈনিক 'দ্য পাকিস্তান অবজারভার' হামিদুল হকের পত্রিকা। স্বভাবতই এটি পাকিস্তানপন্থি সংবাদপত্র। 'মর্নিং নিউজ' ছিল পাকিস্তান সরকারি ট্রাস্টের পত্রিকা। সেখানে পিপল এসেই প্রো-পিপল অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের পক্ষে সংবাদ প্রকাশ শুরু করে। এ রকম একটি পত্রিকা বের করার জন্যই বঙ্গবন্ধু আবিদুর রহমানকে বলেছিলেন। মূলত বঙ্গবন্ধুর প্রেরণাতেই আবিদুর রহমান 'দ্য পিপল' বের করেন। যেহেতু বিদেশিদের কাছে চলমান আন্দোলন-সংগ্রামের প্রকৃত খবর পৌঁছানো দরকার, সেজন্য পিপল পত্রিকা ওই সময় বাংলার যৌক্তিক স্বাধিকার আন্দোলন নিয়ে প্রচুর আর্টিক্যাল ছেপেছিল। নিবন্ধগুলোয় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, শেখ মুজিবের ছয়দফা ইত্যাদি বিষয় ছিল। আমরা দেখেছি, রেহমান সোবহানের লেখাও পিপল ছাপত।...১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পিপল অফিস পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। যাতে সংবাদপত্রটির কয়েকজন স্টাফ মারা যান। এরপর সংবাদপত্রটির সাংবাদিক ও সম্পাদক কলকাতায় পালিয়ে গিয়ে প্রাণ রক্ষা করেছিলেন।" (মো. মিনহাজ উদ্দীন, সাক্ষাৎকার; বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ: সংবাদপত্রের আধেয় বিশ্লেষণ, প্রকাশক: জাফর ওয়াজেদ, মহাপরিচালক, পিআইবি, প্রথম প্রকাশ জুন ২০২১, পৃ. ৪৫৯-৪৬০)।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সাংবাদিক ও 'দ্য পিপল' সম্পাদক আবিদুর রহমান সম্পর্কে বর্তমান প্রজন্মের সাংবাদিকতা জগতে আলোচনা খুব একটা হয় না বললেই চলে। সম্প্রতি গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখার্জির মহাপ্রয়াণের খবর প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে 'বঙ্গবন্ধু ফিরে এলে তুমি স্বপ্নের স্বাধীন বাংলায়...' গানটি গণমাধ্যমে প্রচারিত হওয়ার মধ্য দিয়ে সাংবাদিক-গীতিকার আবিদুর রহমান ও তাঁর 'দ্য পিপল' নতুন করে আলোচনায় আসে। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দিন কলকাতার আকাশবাণী হিসাবে গানটি প্রথমবারের মতো প্রচার করা হয়েছিল। এ সম্পর্কে সাংবাদিক জাফর ওয়াজেদের ভাষ্য: "১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু যেদিন মুক্তি পান, আবিদুর রহমান দুটি গান লিখেছিলেন। তার একটি গান পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত শিল্পী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া 'বঙ্গবন্ধু তুমি ফিরে এলে, তোমার স্বাধীন সোনার বাংলায়'। গানটির সুরকার ছিলেন সুধীন দাশগুপ্ত। অপরদিকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুর করা একটি গানও আছে। গানটি আবিদুর রহমান নিজের অর্থেই রেকর্ড করিয়েছিলেন।" (পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫৯-৪৬০)

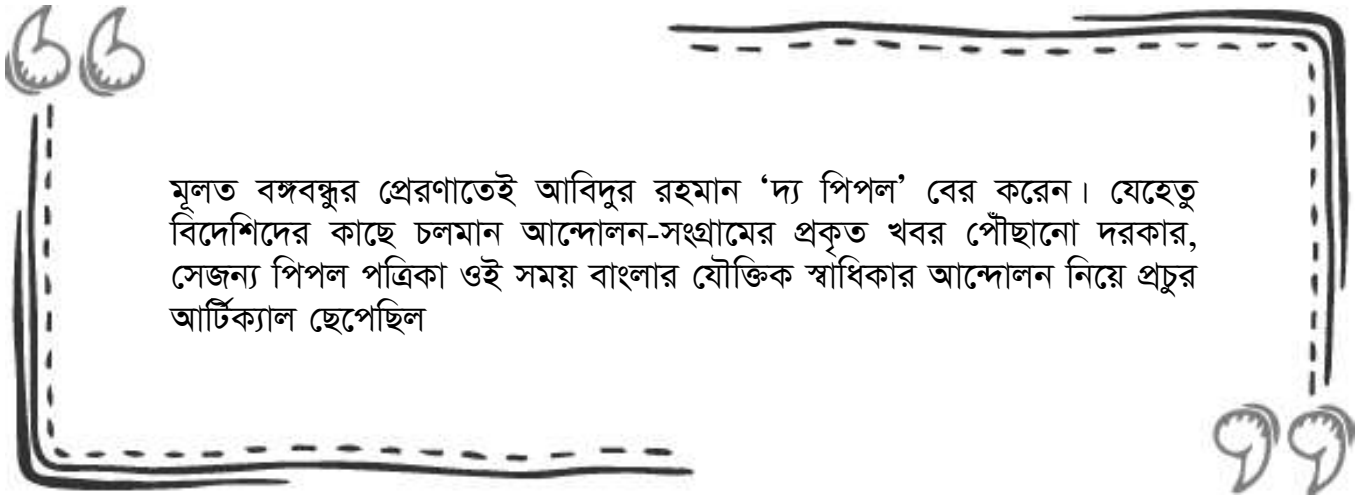

বাংলাদেশের জনগণের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা ও স্বাধীনতার আন্দোলন-সংগ্রামে এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে দেশ ও বিশ্ববাসীর কাছে জনমত তৈরিতে 'দ্য পিপল' নামটি অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। এদেশের সাংবাদিকতার ইতিহাসে, বিশেষ করে ইংরেজি ভাষায় সাংবাদিকতার ইতিহাসে তাই 'দ্য পিপল'-এর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

লেখক: রিসার্চ অফিসার, গবেষণা ও তথ্য সংরক্ষণ বিভাগ, পিআইবি

একাত্তরের ইতিহাস বাঙালির ইতিহাস

ডা. কামরুল হাসান খান

আমরা সগৌরবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালন করেছি। বাংলাদেশ এখন বিশ্বদরবারে উন্নয়নের রোল মডেল। বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ। আমাদের রয়েছে উন্নত বাংলাদেশ '৪১-এর পরিকল্পনা, রয়েছে ডেল্টা প্ল্যান-২১০০। একটি সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে হলে আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। মনে রাখতে হবে, আমাদের গৌরবের অতীত ইতিহাস, বাঙালির সংগ্রাম-আন্দোলন-ত্যাগের ইতিহাস। বিগত পঞ্চাশ বছরে ছিল সুখ-দুঃখ, বেদনা, শোক, আন্দোলন, ব্যর্থতা, সফলতা, বিজয়, অর্জন–এসব অভিজ্ঞতা নিয়েই আমাদের সামনে চলার পথ তৈরি করতে হবে। পেছনে যাওয়ার আর কোনো সুযোগ নেই।

বাঙালি হিসাবে এ ভূখণ্ডে রয়েছে আমাদের হাজার বছরের ঐতিহ্য, কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও সংগ্রামের ইতিহাস। এসবের ওপর ভিত্তি করেই আমাদের যত স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা ও আন্দোলন। আমাদের অধিকার আদায়ের জন্য শত শত বছরের আন্দোলন-সংগ্রাম ও ত্যাগের ইতিহাস রয়েছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ভাষা আন্দোলন থেকে আমাদের এ ভূখণ্ডের বাঙালিদের আন্দোলন একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে অগ্রসর হয় আর সেটি হলো স্বাধীনতার আন্দোলন, যা মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যেমন জীবন ও বাস্তব সামাজিক অবস্থার অভিজ্ঞতা থেকে বেড়ে উঠেছেন, তেমনই আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য বাঙালির মননশীলতা, শিল্প-সাহিত্যে নির্ভর করে তাঁর লক্ষ্য স্থির করেছেন।

একাত্তরে আমরা বলেছি, 'বাংলার হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান–আমরা সবাই বাঙালি।' বাংলার অপরূপ প্রকৃতি, সমাজ, ঋতু পরিবর্তন, খেত, নদী, বনজঙ্গল, পাহাড়-সমুদ্র থেকে শত

শত বছরের বাঙালির যে মন, ভালোবাসা, দেশপ্রেম, স্বাধীনচেতা, ত্যাগের মহিমা, সৃজনশীলতা গড়ে উঠেছে–এর ফলেই আমাদের সব চাওয়াপাওয়া, কর্মকাণ্ড, আন্দোলন-সংগ্রাম, লক্ষ্য ও স্বপ্ন স্থির হয়েছে।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর শুরু হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র। ১৯৭৫ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত টানা ১৫ বছর চলেছে আমাদের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে অত্যন্ত পরিকল্পিত নানামুখী কর্মকাণ্ড। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের, সংগ্রামের প্রিয় স্লোগান জয় বাংলার পরিবর্তে স্থান পেল পাকিস্তানি ভাবধারার স্লোগান বাংলাদেশ জিন্দাবাদ, বাংলাদেশ বেতার হলো রেডিয়ো বাংলাদেশ, লাখো শহিদের রক্তে রঞ্জিত রচিত সংবিধানের চার মূলনীতিসহ গুরুত্বপূর্ণ ধারার পরিবর্তন, উপেক্ষিত বঙ্গবন্ধু, বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের স্থানে শিশুপার্ক নির্মাণ–সর্বোপরি বাঙালি জাতীয়তাবাদের স্থানে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ। বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ নিয়ে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট পর্যন্ত আমরা এ ভূখণ্ডের সবাই বাঙালি ছিলাম জাতি হিসাবে, জাতীয়তাবাদী হিসাবে। ২০১৪ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি যুদ্ধাপরাধী কাদের মোল্লার ফাঁসির দাবিতে তরুণদের স্বতঃস্ফূর্ত সমাবেশে দলমতনির্বিশেষে আবার ফিরে এসেছে সেই স্লোগান 'জয় বাংলা', 'আমি কে তুমি কে–বাঙালি, বাঙালি'। সেখানে চাকমা, মারমা, গারোসহ সব উপজাতিকে এ স্লোগানে একাত্ম হতে দেখেছি। কারণ আমরা সবাই তো বাংলায় কথা বলি।

পঁচাত্তরের পর বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদী বিষয়টি নিয়ে এসে নতুন বিতর্ক সৃষ্টি করা হয়। মনে হয় আমাদের দ্বিখণ্ডিত করার এক নতুন ষড়যন্ত্র। আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয়তাবাদ বাংলাদেশি থাকলেও বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাস, ঐতিহ্য, কৃষ্টি, সংস্কৃতি মুছে ফেলার ক্ষমতা কারও নেই বরং আরও তীব্রভাবে ফিরে আসছে বৈশাখে, উৎসবে, পূজা-পার্বণে সাহিত্যে, সংস্কৃতির রীতিনীতিতে বছরজুড়ে।

নব্বইয়ের ডিসেম্বরে এসে অনুভব করলাম গত ১৫ বছরে আমরা যে বাঙালি, আমাদের যে দীর্ঘ ইতিহাস আছে, তা মুছে ফেলার চেষ্টা চলছিল। সিদ্ধান্ত নিলাম নতুন প্রজন্মের জন্য এমন একটি অনুষ্ঠান করতে হবে মুক্তিযুদ্ধের ওপর, যেখানে ইতিহাসের সাক্ষীরাই থাকবেন। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক হিসাবে সভায় প্রস্তাবটি উত্থাপন করলে সবাই সমর্থন করে। শহিদজননী জাহানারা ইমামের 'একাত্তরের দিনগুলি' পড়ার পর থেকেই ইচ্ছা ছিল সুযোগ পেলে জাহানারা ইমামকে নতুন প্রজন্মের সামনে উপস্থাপন করার। সেই সুযোগ তৈরি হলো। ব্যক্তিগতভাবে অপরিচিত শহিদজননী জাহানারা ইমামকে অনুরোধ করলাম আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য। উনি রাজি ছিলেন না। উনি কখনো এ ধরনের অনুষ্ঠানে আসেননি। অনেক বলে-কয়ে ওনাকে রাজি করালাম বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের কথা বলে। অনুষ্ঠানটি ছিল ১৯৯০ সালের ১৮ ডিসেম্বর। অতিথি ছিলেন অধ্যাপক ডা. এমএ মাজেদ, অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, জাহানারা ইমাম, শহিদ ডা. ফজলে রাব্বীর স্ত্রী ডা. জাহানারা রাব্বী, শহিদ ডা. আলীম চৌধুরীর স্ত্রী শ্যামলী নাসরীন চৌধুরী, শহিদ শহীদুল্লা কায়সারের স্ত্রী পান্না কায়সার, বিএমএ-এর সাবেক মহাসচিব ডা. সারওয়ার আলী এবং বিএমএ-এর তৎকালীন মহাসচিব ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দীন। বক্তব্য দিয়েছিল নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরাও। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক এমএ হাদী আর সঞ্চালনা করেছিলাম আমি।

> আমাদের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে হলে জাতি হিসাবে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। আগামী প্রজন্মের জন্য এটা আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। লাখো শহিদের কাছে আমাদের অবশ্যই দায়বদ্ধ থাকতে হবে

অনুষ্ঠানের দুদিন আগে থেকে প্রতিটি ক্লাসে গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম উপস্থিত থাকার জন্য, কারণ অনুষ্ঠানটি তাদের জন্য। তারা শুনবে শহিদ পরিবারের মুখে বেদনার মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের বিজয়গাথা। সেদিন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ১নং গ্যালারিতে উপচে পড়া ভিড় হয়েছিল। ঢাকা শহর থেকে এসেছিলেন অসংখ্য চিকিৎসক। সম্মানিত সব ডাক্তারের অসাধারণ বক্তব্যে বারবার আবেগপ্রবণ, উদ্‌বেলিত হয়েছে সভাস্থল। সেদিন সবাই সোচ্চার হয়েছিল, প্রতিজ্ঞা করেছিল অবিলম্বে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে। ১৫ বছর পর জাতীয় গণমাধ্যমে এসব সম্মানিত ব্যক্তিকে প্রথমবারের মতো সংবাদে ফলাও করে প্রচার করে, যেখানে নিষিদ্ধ ছিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু। ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে নতুন প্রজন্ম বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ শুনতে পায়। একানব্বইয়ের নির্বাচন পর্যন্ত আবার কিছুটা ফিরে আসে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, বাঙালির জীবন। পঁচাত্তর থেকে নব্বই পর্যন্ত এই বাংলাদেশ ফিরে গিয়েছিল প্রায় পাকিস্তান ভাবধারায়–সরকারে, রাজনীতিতে, সংস্কৃতিতে। একানব্বইয়ের নির্বাচনের পর আবার ফিরে গেলাম পঁচাত্তরের ১৫

আগস্টে–আবার নিষিদ্ধ হলো বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ, বাঙালি জাতীয়তাবাদ।

১৯৯৬ সালের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে আবার ফিরে আসে বাংলার প্রাণ–বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ, দেশের উন্নয়নের সঠিক ধারা। ২০০১ সালের নির্বাচনের পর আবার ফিরে আসে একাত্তরের স্বাধীনতাবিরোধীদের ভয়াবহ তাণ্ডব, হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, আবার পাকিস্তানের ভাবধারা। ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বরের নির্বাচনে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি বিপুল ভোটে জয়যুক্ত হয়ে সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করে। আবার ফিরে আসে গণতন্ত্র, অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, উন্নয়নের ব্যাপক ধারা, বাঙালির শাশ্বত জীবন।

আমাদের রয়েছে হাজার বছরের সমৃদ্ধ ইতিহাস, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, কৃষ্টি–বিশেষ করে ২৩ বছরের আন্দোলন-সংগ্রামের, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে, স্বাধীনতার জন্য বাঙালির অকাতরে জীবনদানের ইতিহাস। নতুন প্রজন্ম পাঠ্যবই ছাড়া অন্য বই পড়তে অনেকটাই বিমুখ। ইতিহাসের সাক্ষীরা একে একে পৃথিবী ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। যারা বেঁচে আছেন, তাঁদের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের কাছে আমাদের গৌরবের, প্রেরণার ইতিহাস প্রবাহিত করা সবারই দায়িত্ব।

বাঙালি মানেই বঙ্গবন্ধু। বাঙালি মানেই রবিঠাকুর-নজরুল-জীবনানন্দ, মায়ের মুখের সুমধুর ভাষা, পদ্মা-মেঘনা-যমুনা, ২৩ বছরের সংগ্রাম-আন্দোলন, মাথা নত না করা, মুক্তিযুদ্ধ, অসাম্প্রদায়িক চেতনা–এসব মুছে ফেলতে হলে বাঙালি শব্দটাই মুছে ফেলতে হবে। স্বাধীনতাবিরোধী তাই এ শব্দ মুছে ফেলার সব আয়োজন করেছে, করবে।

১৯৯০ সালের ১৮ ডিসেম্বরে বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের জন্য আয়োজিত সে অনুষ্ঠানটির মূল শিরোনাম ছিল: 'একাত্তরের ইতিহাস, বাঙালির ইতিহাস'।

পৃথিবী ঘুরে এসে মনে হয়েছে বাঙালি জাতি শ্রেষ্ঠ জাতি, মনে হয়েছে 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি সে যে আমার জন্মভূমি'। বাঙালি জাতির মতো মেধা, ত্যাগের ইতিহাস বিশ্বের কম মানুষেরই আছে। আমরা মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অনেক শিক্ষা পেয়েছি, যার অন্যতম হচ্ছে–'একটি দেশের স্বাধীনতার জন্য তার অধিকাংশ মানুষ জীবনদানে প্রস্তুত হয়, আর সেই দেশটি হচ্ছে বাংলাদেশ'। বাঙালি জাতিকে সুযোগ আর পরিবেশ দিলে তারা অসাধ্য সাধন করতে পারে–সেই প্রমাণ দেশে-বিদেশে ভূরিভূরি।

আমাদের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে হলে জাতি হিসাবে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। আগামী প্রজন্মের জন্য এটা আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। লাখো শহিদের কাছে আমাদের অবশ্যই দায়বদ্ধ থাকতে হবে। তারা যে গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক উন্নত বাংলাদেশ চেয়েছিলেন, তাদের সেই স্বপ্ন পূরণ করা আমাদের দায়িত্ব। এর জন্য আমাদের জীবন দিতে হবে না, কেবল নিজের দায়িত্বটুকু সততার সঙ্গে যথাযথভাবে পালন করলেই হবে। মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকেই একটি জাতীয়-আন্তর্জাতিক চক্র স্বাধীনতার বিরোধিতা করে আসছে। যখনই তারা সুযোগ পেয়েছে, যখনই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি দুর্বল হয়েছে; তখনই তাঁরা বাংলাদেশের পতাকা খামছে ধরেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সুরক্ষার জন্য এবং বর্তমান উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তির ঐক্যের কোনো বিকল্প নেই। পাশাপাশি আমাদের গৌরবের ২৩ বছরের ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধ, বাঙালি কৃষ্টি-সংস্কৃতি নতুন প্রজন্মের কাছে নিরন্তর প্রবাহিত করতে হবে নানা মাধ্যমে। কেবল আনুষ্ঠানিকতায় নয়, তাদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে দেশপ্রেমে।

তাই বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তীর সময়ে দেশের সব প্রগতিশীল রাজনৈতিক শক্তি, সামাজিক-সাংস্কৃতিক শক্তিকে সব ভুল বোঝাবুঝির যৌক্তিক অবসান ঘটিয়ে একাত্তরের মতো ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার উদাত্ত আহ্বান জানাই। জয় বাংলা।

লেখক: অধ্যাপক, সাবেক উপাচার্য
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়

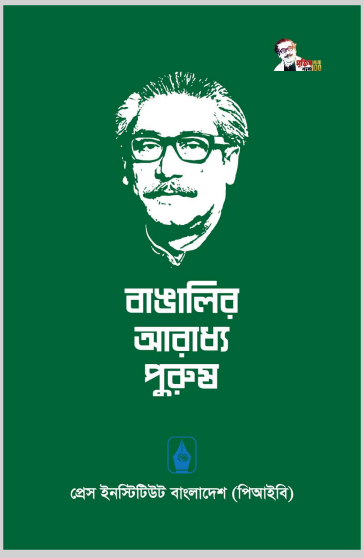

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

কেবল ভালোবাসারই পুনর্জন্ম হয়

ফজলুর রহমান

একজন মানুষকে হত্যা করা হলো; যার বুকভরা ভালোবাসা ছিল মানুষের জন্য। মানুষটাকে খুন করা হলো; যার দেশপ্রেম ছিল দুনিয়া কাঁপানো।

সেই মানুষটাকেই তাঁর প্রিয় স্বদেশের মাটিতে রক্তাক্ত করা হলো–যে দেশের জন্য, দেশের মানুষের মুক্তির জন্য জীবনের অনেকটা সময় জেল খেটেছেন!

কেন? এই প্রশ্নটা ঘুরে-ফিরে আসছে, আসতেই থাকবে যতদিন একজনও মুক্তমনা 'বাঙালি' বেঁচে থাকেন এই গ্রহে!

একজন মানুষ খেলাধুলা ভালোবাসেন। একজন মানুষ অন্যের বিপদে ছুটে যান সবার আগে। একজন লোক গান ভালোবাসেন; ভালোবাসেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আব্বাস উদ্দীনের গান। একজন মানুষ রাজনীতি ভালোবাসেন।

ভালোবাসেন বাঙালির লড়াই, ঐতিহ্য। মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার সংগ্রামে নিজেকে নিয়োজিত করেন। হাজার হাজার বছর ধরে, শোষিত পরাধীন থাকা জাতিকে মানুষটা 'স্বাধীনতা'র স্বপ্ন দেখান এবং সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন হয় তাঁর জীবনকালে। বাঙালি জাতিকে একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র এনে দেন তিনি।

সেই মানুষটাকে কেন হত্যা করা হলো? এই প্রশ্ন উঠছে, উঠতেই থাকবে; যতদিন পৃথিবীতে 'ন্যায়' শব্দটি একটু হলেও টিকে থাকবে!

একজন মানুষ এতটা সাহসী কী করে হন, গোটা দুনিয়া এটা জেনেছে সে-ই প্রকৃত সাহসী, যে মৃত্যুদৃশ্যেও অবিচল থাকতে পারেন। ঘাতকের বুলেটের সামনে দাঁড়িয়েও ধমক দিয়ে উঠতে পারেন!

দুনিয়া নাড়িয়ে দেওয়া আর্জেন্টাইন বিপ্লবী চে গুয়েভারাকে বলিভিয়ার জঙ্গলে যখন মার্কিন মদতপুষ্ট সৈন্য গুলি করতে উদ্যত, তখন চে নাকি এসব বুলেটফুলেট মৃত্যুকে নিতান্তই তাচ্ছিল্য করেছিলেন। চের মৃত্যুদৃশ্য আমি দেখিনি। শুনেছি, পড়েছি এই বিপ্লবীর কথা এবং আমাদের যাপিত সময়ে দেখছি চে কতটা জাগ্রত আজও আমাদের বুকে। আর আমি বাংলাদেশে বসে যে মানুষটার কথা ভাবছি, বলছি, লিখছি, তিনি শেখ মুজিবুর রহমান। এদেশের মানুষ ভালোবেসে তাঁকে ডেকেছে 'বঙ্গবন্ধু'। অসীম সাহসী এক 'বাঙালি'। মৃত্যু যখন তাঁর সামনে, ঘাতকের বন্দুক যখন বেপরোয়া-উন্মাদ। ঘাতক যখন মৃত্যু পরোয়ানা নিয়ে অনড়, তখন মানুষটি এটাতে বলতেই পারতেন কেন তাঁকে হত্যা করা হচ্ছে, কী তাঁর অপরাধ? মৃত্যুর সামনে বেঁচে থাকার জন্য একটু আকুতি দেখাতে পারতেন হয়তো! না, তা তিনি করেননি। উলটো ধমক দিয়েছেন ঘাতকদের, মৃত্যুকে। ঘাতকের বুলেট বিদীর্ণ করেছে মানুষটার বুক। তারপর পৃথিবী বহুবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করেছে। অনেক অনেক চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যগ্রহণ হয়েছে। দিনের পর রাত হয়েছে কত কতবার। অনেক মিথ্যে দিয়ে মোড়ানো ইতিহাস নতুনরূপে দেখেছি। নতুন দিনের মানুষ সত্য জানতে চেয়েছে, তারা একটু একটু করে সত্য বুঝতে শিখেছে। বালু দিয়ে সাজানো ঘর যত সুন্দরই হোক না কেন, তার স্থায়িত্ব আর অস্তিত্ব বেশি সময়ের নয়। নতুন দিনের মানুষ, এটা আরও ভালো করে বুঝতে শিখেছে। সত্য যে, মানুষকে হয়তো কিছুটা সময়ের জন্য আড়াল করা যায়, চিরকালের জন্য নয়।

বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে পরাজিত শক্তি মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল। একটি মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের জন্ম–এই উজ্জ্বল অধ্যায়কে ভুলিয়ে দিতে চেয়েছিল একাত্তরের ঘাতক দালালরা। সেই ষড়যন্ত্রে হাত মিলিয়েছে দেশি-বিদেশি চক্র। স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের অস্তিত্ব বিনষ্ট করতে তারা বারবার ছোবল মেরেছে। ভেবেছে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করেই তারা ফিরে পাবে কাঙ্ক্ষিত 'বর্বরভূমি'। কিছুকাল অন্ধকারে গেছে। অনেক রক্তপাত, অনেক মিথ্যার জাল ছিন্ন করে বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ সঠিক পথে ফিরে এসেছে।

আজ, এখনো বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনের কথা মনে আসতেই ভাবছি, একজন মানুষের জন্য তাঁর জন্মদিনটা সত্যি সত্যি গুরুত্বপূর্ণ। যদিও বঙ্গবন্ধু তাঁর জীবনকালে জন্মদিন নিয়ে মাতামাতি করেননি। তিনি জননেতা। তাঁর জন্মদিন নিয়ে জনগণ মাতামাতি করবে, এটাই স্বাভাবিক। আর আমি এই ২০২২ সালে এসে ভাবছি, বঙ্গবন্ধু, মানে শেখ মুজিবুর রহমান, মানে সাধারণজনের 'শেখ সাহেব' যদি জন্ম না নিতেন এই বাংলায়, তাহলে শৃঙ্খলিত বাঙালি কি আজও স্বাধীন দেশ পেত; পেত পতাকা, জাতীয় সংগীত? বঙ্গবন্ধু না জন্মালে 'আমার সোনার বাংলা/আমি তোমায় ভালোবাসি' কি হতো আমাদের জাতীয় সংগীত? আমি ঘুরে-ফিরে পড়ি কারাগারে বসে তাঁর লেখা 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'। পড়ি 'আমার দেখা নয়াচীন'।

পড়ি আর বিস্ময় জাগে এতটা গল্প তিনি জানতেন, বলতে পারতেন। পুরোটা জীবন কেটেছে রাজনীতির মাঠে, যিনি তাঁর জন্মই মানুষের মুক্তি, কল্যাণের জন্য ভেবেছেন সব সময়। সেই মানুষটি কী সুন্দর গল্পের ভাষায় সময়ের কথা লিখেছেন।

প্রশ্ন করি নিজেকে, যার বুকে এত ভালোবাসা, তাঁর কি মৃত্যু হতে পারে কখনো, না তাঁকে কেউ কোনোদিন হত্যা করতে পারে?

আমি জানি আর কিছু নয় কেবল ভালোবাসারই পুনর্জন্ম হয়। আর বঙ্গবন্ধুর বুকভরা সেই ভালোবাসাই ছিল।

লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক

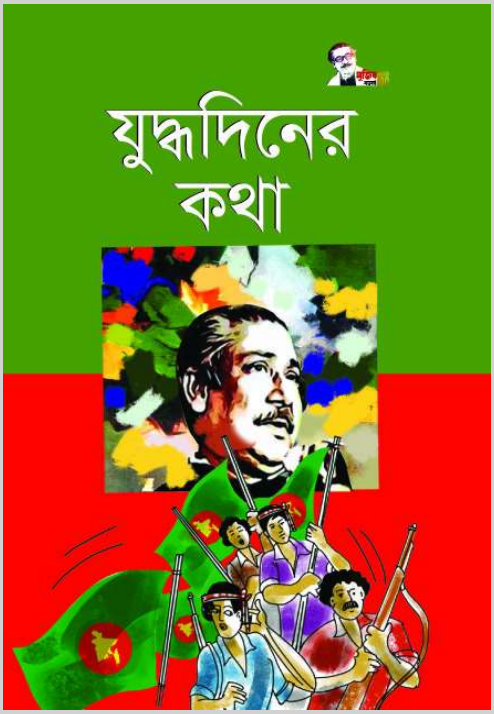

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

মুক্তিযুদ্ধে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের স্মারক বধ্যভূমি সংরক্ষণ জরুরি

রাজন ভট্টাচার্য

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালন করল বাংলাদেশ। মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে এ রাষ্ট্রের জন্ম। যুদ্ধে শহিদ হয়েছেন ৩০ লাখ মানুষ। সম্ভ্রমহানি হয়েছে দুই লাখ মা-বোনের। শহর ছাপিয়ে গ্রামের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে যুদ্ধের অজানা অনেক স্মৃতি। কত মানুষ নিজের অজান্তে দেশের প্রয়োজনে কাজ করেছেন, তা ইতিহাসে হয়তো ঠাঁই পায়নি আজও। তবে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংরক্ষণে সবার আগে জরুরি দেশজুড়ে ছড়িয়ে থাকা বধ্যভূমিগুলো সংরক্ষণ করা। ৩০ বছরের মধ্যে যারা সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন, তাদের কেউই হয়তো থাকবেন না। তখন ইচ্ছা করলেও বধ্যভূমির সঠিক স্থান নির্ধারণ কঠিন হবে। থাকবে মুক্তিযুদ্ধে ইতিহাসভিত্তিক গ্রন্থ। তখন মুক্তিসংগ্রামের প্রকৃত ইতিহাসকে জীবন্ত করে ধরে রাখবে সংরক্ষণ করা বধ্যভূমিগুলো।

আন্তরিকতার অভাব, অযত্ন, অবৈধ দখল, অবহেলা আর উদাসীনতায় মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত বধ্যভূমিগুলো নিশ্চিহ্ন হতে চলছে। স্বাধীনতার ৫০ বছর পেরিয়ে গেলেও একাত্তরের বধ্যভূমি ও গণকবরের সংখ্যা নির্দিষ্ট করা যায়নি। সংরক্ষণ করা হয়নি গণশহিদের নামের তালিকাও। মহান মুক্তিযুদ্ধের যে কোনো স্মৃতি সংরক্ষণ করা জাতিসত্তার জন্যই অপরিহার্য।

চোখের সামনে একের পর এক বেদখল হয়ে গেল বধ্যভূমি। যেখানে শুয়ে আছেন দেশের সূর্যসন্তানরা। দেশপ্রেমিক মানুষগুলো। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের প্রতিবাদের কণ্ঠগুলো। তাদের প্রতি অবহেলা করা মানেই তো মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে প্রকারান্তরে মুছে দেওয়ার অপচেষ্টা! সেটি রাজনৈতিক বা অন্য যে কোনো কারণেই হোক, তা মেনে নেওয়া একেবারেই কঠিন, যা বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের সঙ্গে যায় না।

মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ হিসাবে সারা দেশে চিহ্নিত বধ্যভূমির সংখ্যা ২৮১টি। এর মধ্যে সশস্ত্রবাহিনী বিভাগ ১৯৩টি শনাক্ত করেছে। তবে বেসরকারি হিসাবে এ সংখ্যা পাঁচ হাজারের বেশি।

মুক্তিযুদ্ধের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধ, গণহত্যা ও নির্যাতন নিয়ে গবেষণা করছে–এমন দুটি বেসরকারি সংস্থার দেওয়া তথ্য থেকে ধারণা করা যায়, সারা দেশে চিহ্নিত বধ্যভূমির সংখ্যা পাঁচ হাজারেরও বেশি। সংস্থা দুটির একটি ওয়ার ক্রাইমস ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং কমিটি। তারা বছর দশেক আগে একটি জরিপ শেষে জানিয়েছিল, সারা দেশে পাঁচ হাজারের মতো বধ্যভূমি রয়েছে। এগুলোর মধ্যে তারা ৯৪২টি বধ্যভূমি শনাক্ত করতে পেরেছে বলে জানায়। তবে তালিকা প্রকাশ করেনি।

গণহত্যা জাদুঘর ট্রাস্টের সভাপতি অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন বলেন, ৩২ জেলার জরিপে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী বধ্যভূমির সংখ্যা ৭২৫টি, গণহত্যা ১৩ হাজার ৬৫০টি, গণকবর আছে এক হাজার একটি এবং নির্যাতনকেন্দ্রের সংখ্যা ১ হাজার ৬২টি। দেশের আনাচে-কানাচে অসংখ্য বধ্যভূমি ও গণকবরের সন্ধান মিলছে আমাদের জরিপে। ওই জরিপের ওপর ভিত্তি করে গণহত্যা জাদুঘর গণহত্যার জিপিএস জরিপ এবং তা ডিজিটাল ম্যাপে প্রকাশ করছে।

গণহত্যা জাদুঘরের গবেষণাকেন্দ্রের জরিপে পাওয়া তথ্য পুরোনো সব ধারণা বদলে দিচ্ছে। স্বয়ং মুনতাসীর মামুনের 'মুক্তিযুদ্ধ কোষ' দ্বিতীয় খণ্ডে সারা দেশের মোট ৯০৫টি গণহত্যা, গণকবর, বধ্যভূমি ও নির্যাতনকেন্দ্রের নাম ছিল।

সবকটি সংরক্ষণ করা জরুরি।

পাঁচ হাজার ছোটো-বড়ো বধ্যভূমি ছিল

বেসরকারি একটি সংস্থার তথ্যে ১৯৭১ সালে দেশে প্রায় পাঁচ হাজার ছোটো-বড়ো বধ্যভূমি ছিল। সবচেয়ে উদ্‌বেগের খবর হলো, ইতোমধ্যেই বহু গণকবরের নাম-নিশানা মুছে ফেলে সেখানে দালানকোঠা তোলা হয়েছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে লতাগুল্ম-বনজঙ্গলে ঢাকা পড়ে অযত্ন-অবহেলায় অনেক গণকবর আজ লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে গেছে।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের দোসর রাজাকার, আলবদর, আলশামস ১৯৭১ সালে সমগ্র বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায়ই হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে। তারা নির্যাতন ও হত্যার জন্য বিশেষ বিশেষ স্থানও বেছে নিয়েছিল। পাকিস্তানিরা বাঙালি হত্যায় সব সময় বুলেটও ব্যয় করেনি। তারা কখনো বেয়নেট দিয়ে, আবার কখনো বা ধারালো ছুরি দিয়ে নির্মমভাবে মানুষের গলা কেটে হত্যা করেছে।

হত্যার পর হতভাগ্য মানুষের মৃতদেহ ফেলে দেওয়া হয়েছে খালে-বিলে-নদীতে। যেখানে নদনদী ছিল না, সেখানে তারা মৃতদেহগুলো মাটিচাপা দিয়েছে। এ হতভাগ্যদের যেসব স্থানে মাটিচাপা দেওয়া হয়েছিল, ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই সেসব বধ্যভূমি ও গণকবর শনাক্ত করা জরুরি। জেলাভিত্তিক এসব বধ্যভূমি ও গণকবর শনাক্ত করার মধ্য দিয়ে পাকিস্তানি হানাদার সেনাবাহিনী এবং তাদের দোসরদের নির্মমতা, নৃশংসতা, নির্যাতন ও হত্যার বহুমাত্রিকতা সম্পর্কে কিছুটা হলেও ধারণা লাভ সম্ভব।

১৯৭১ সালে নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে জাতিকে মেধাশূন্য করার চক্রান্ত করা হয়। রাজাকার, আলবদর ও শান্তিবাহিনীর সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় পাকিস্তানি বাহিনী হত্যা করে সূর্যসন্তান বুদ্ধিজীবীদের। এছাড়া অগণিত বাঙালিকে এক কাতারে দাঁড় করিয়ে গুলি চালায় নরপশুরা। রচিত হয় বধ্যভূমি, গণকবর।

বাস্তবতা হলো–জানা নেই বধ্যভূমি-গণকবরের প্রকৃত সংখ্যা। এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত সব বধ্যভূমি ও গণকবরে স্মৃতিস্তম্ভও স্থাপন করা হয়নি। শ্রদ্ধা জানানো হয়নি সেখানে প্রাণ উৎসর্গ করা দেশের কৃতীসন্তানদের প্রতি, যা জাতির জন্য বড়োই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। এর পাশাপাশি অযত্ন, অবহেলা ও সংরক্ষণের অভাবে অনেক বধ্যভূমি বেহাত হয়ে যাচ্ছে। কোথাও স্মৃতিস্তম্ভ করা হলেও যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্যার অভাবে সেগুলো বেহাল। অনেক স্থানে ভেঙে ফেলা হয়েছে স্মৃতিস্তম্ভ। এভাবে চলতে থাকলে ইতিহাস নিশ্চিহ্ন হতে থাকবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সঠিক ইতিহাস জানতে পারবে না।

ইতিহাস সংরক্ষণ জরুরি

১৯৮১ সালে ইউএন ইউনির্ভাসাল হিউম্যান রাইটসের ডিকলারেশনে লেখা হয়েছে: মানব ইতিহাসে যত গণহত্যা হয়েছে, এর মধ্যে বাংলাদেশের ১৯৭১ এর গণহত্যায় স্বল্পতম সময়ে সংখ্যার দিকে সর্ববৃহৎ। গড়ে প্রতিদিন ছয় থেকে ১২ হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। এটি হচ্ছে গণহত্যার ইতিহাসে প্রতিদিনে সর্বোচ্চ নিধনের হার।

এই ভূখণ্ডে ১৯৭১ সালে বর্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যে নজিরবিহীন গণহত্যা পরিচালনা করেছিল সেরকম আরেকটি গণহত্যার উদাহরণ খুঁজে পাওয়া একরকম অসম্ভব। অবহেলিত এসব বধ্যভূমি যদি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা যেত, তবে একদিকে যেমন নতুন প্রজন্ম ইতিহাস-সচেতন হতো, তেমনই এসব স্মৃতিচিহ্ন হতে পারত আগামী দিনের পথচলার প্রেরণা।

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে যুদ্ধের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়গুলোকেও জীবন্ত করে রাখতে হবে। বধ্যভূমি সংরক্ষণের দায়িত্ব সরকারের একার নয়। মুক্তিযুদ্ধে নিহত ব্যক্তির পরিবার ও নাগরিকদের উদ্যোগেও দেশের বধ্যভূমিগুলোর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ সম্ভব। তবে সরকারকে প্রধান ভূমিকা পালন করতে হবে।

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অসাড়তার কারণে ঢাকা ও এর আশেপাশের এলাকায় অন্তত ৩৯টি এবং অন্যান্য বধ্যভূমি, গণকবর ও মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলো নিশ্চিহ্ন হতে চলছে। মুক্তিযুদ্ধের বীর শহিদদের স্থানগুলো আজও রয়ে গেছে অজানা, রহস্যময়। এমন অবস্থা চলতে থাকলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে শহিদদের ইতিহাস থেকে যাবে কুয়াশাচ্ছন্ন।

জমি অধিগ্রহণ জটিলতায় থেমে আছে ২৫০ বধ্যভূমির নির্মাণকাজ

যথাসময়ে জমি অধিগ্রহণ করতে না পারায় দেশের বিভিন্ন এলাকায় শুরু করা যায়নি মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন ২৫০টি বধ্যভূমি সংরক্ষণ ও স্মৃতিস্তম্ভের নির্মাণকাজ! একাত্তরের বধ্যভূমিগুলোর বেশির ভাগই ব্যক্তিমালিকাধীন ভূমিতে। কোনো কোনো বধ্যভূমির ওপর বাড়িঘরও নির্মাণ করা হয়েছে। এ কারণে জমি অধিগ্রহণে নানা ধরনের জটিলতা সৃষ্টি হওয়ায় '২৮০টি বধ্যভূমি সংরক্ষণ ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ' প্রকল্পে এ পর্যন্ত মাত্র ৩০টি বধ্যভূমির জন্য জমি পাওয়ায় সেগুলোর কাজ শুরু করা হয়েছে। বাকিগুলোর জন্য জমি অধিগ্রহণে পদক্ষেপ নিতে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকদের চিঠি দিয়ে বারবার তাগাদা দেওয়া হচ্ছে।

মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা ও মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কর্তৃক গণহত্যার জন্য ব্যবহৃত বধ্যভূমিগুলো সংরক্ষণ ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণে ৪৪২ কোটি ৪০ লাখ টাকা ব্যয়ে প্রকল্প গ্রহণ করে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়।

২০১৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর একনেক বৈঠকে অনুমোদন পাওয়া এ প্রকল্পের মেয়াদ নির্ধারিত ছিল ২০১৮ সালের ১ জুলাই থেকে ২০২১ সালের ৩০ জুন। প্রকল্পের অধীনে গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে ৪০টি জেলার ১১০টি উপজেলায় ২৮০টি বধ্যভূমি সংরক্ষণ ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের পাশাপাশি রায়েরবাজার বধ্যভূমির আনুষঙ্গিক কাজও

সম্পাদন করার কথা ছিল। কিন্তু নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ না হওয়ায় প্রকল্পের মেয়াদ আরও দুবছর বাড়িয়ে ২০২৩ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত করা হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় বলছে, দেশে ৯২০টি বধ্যভূমি শনাক্ত করা হয়েছে, যদিও তালিকা প্রকাশ হয়নি। এছাড়া ৮৮টি নদী ও ৬৫টি ব্রিজ-কালভার্ট শনাক্ত করা হয়েছে, যেগুলোয় শত শত বাঙালিকে নির্বিচারে হত্যা করা হয়। রাজধানীতে ৭০টি বধ্যভূমির মধ্যে মিরপুরেই রয়েছে ২৩টি। কিন্তু ২৩টি বধ্যভূমির মধ্যে সংরক্ষিত হয়েছে মাত্র তিনটি। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের বধ্যভূমির তালিকায় ঢাকা ও আশপাশ এলাকায় রয়েছে ৩৯টি বধ্যভূমির নাম। এসব বধ্যভূমি অরক্ষিত। বধ্যভূমি ও মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলো সংরক্ষণের পক্ষে উচ্চ আদালত রায় দিয়েছিলেন ২০০৯ সালে। অবশ্য এর আগে ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করার পর ৩৫টি বধ্যভূমি ও মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত স্থান সংরক্ষণ করতে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করেছিল। কিন্তু এ কাজের ধারাবাহিকতা রক্ষা হয়নি।

রাজধানীর ৭০টি বধ্যভূমির অধিকাংশেই এখন অবৈধভাবে গড়ে উঠেছে আবাসিক ভবন, ব্যাবসা প্রতিষ্ঠান, কাঁচাবাজার ও পাবলিক টয়লেট। আর হাতেগোনা কয়েকটিতে নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভগুলোও এখন জরাজীর্ণ। তবে দেশের বেশির ভাগ বধ্যভূমিতেই লাগানো হয়নি স্মৃতিফলক। কারণ সরকারি পর্যায় থেকে এ বিষয়ে কোনো জরিপ নেই।

চট্টগ্রামে অরক্ষিত ১১১ বধ্যভূমি

চট্টগ্রামের ১১১টি বধ্যভূমি অরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে। স্বাধীনতার অর্ধ শতক পরও এসব বধ্যভূমি সংরক্ষণ করা হয়নি। এর মধ্যে নগরীর ৬১টি বধ্যভূমির ৫৬টিতেই নেই কোনো স্মৃতিচিহ্ন। ২০১৮ সালে একটি প্রকল্পের অধীনে চট্টগ্রামের ১৬টি বধ্যভূমি সংরক্ষণের উদ্যোগ নেয় মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়। ভূমি জটিলতার কারণে এসব বধ্যভূমি সংরক্ষণের কাজও মুখ থুবড়ে পড়ে আছে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পের অধীনে চট্টগ্রামের ১৬টি বধ্যভূমিতে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করতে স্থানীয় প্রশাসনকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ভূমি জটিলতার কারণে এগুলোর কোনোটিইতে এখনো স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি। মোট কথা হলো–মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংরক্ষণ করার জন্য একটি জায়গা পাওয়া যাবে না? এর চেয়ে কষ্টের আর কী হতে পারে। যদি অন্যান্য উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণ করা যায় তবে বধ্যভূমি সংরক্ষণের জমি মিলবে না–এ কথা বিশ্বাস করা সত্যিই কঠিন।

কেন জমি উদ্ধার করা গেল না?

প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা অনুযায়ী, চট্টগ্রামের পাহাড়তলী বধ্যভূমিতে ১৯৭১ সালের এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর প্রায় ১০ হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়। এই 'জল্লাদখানা'ই দেশের সবচেয়ে বড়ো বধ্যভূমি হবে বলে মনে করেন আদালতের আদেশে গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটির সদস্য শাহরিয়ার কবির।

পাহাড়তলী এলাকায় বধ্যভূমি হিসাবে পরিচিত জমিতে ২০০৭ সালে একটি ভবন নির্মাণের কাজ শুরু করে ইউএসটিসি কর্তৃপক্ষ। এর বিরুদ্ধে ২০১০ সালে একটি রিট আবেদনে ওই ভবন নির্মাণে স্থগিতাদেশ দেন আদালত। সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগের আদেশে বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়।

সাত সদস্যের এ বিশেষজ্ঞ কমিটির অন্য সদস্য হলেন সাবেক সেনাপ্রধান কেএম সফিউল্লাহ, গবেষক মুনতাসীর মামুন, মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপসচিব ও কমিটির সদস্যসচিব সৈয়দ মুজিবুল হক, চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক ফয়েজ আহমদ, মুক্তিযুদ্ধ গবেষক ডা. মাহফুজুর রহমান ও ইউএসটিসির নিবন্ধক অধ্যাপক শামসুদ্দোহা।

রাজধানীর ৭০টি বধ্যভূমির অধিকাংশেই এখন অবৈধভাবে গড়ে উঠেছে আবাসিক ভবন, ব্যাবসা প্রতিষ্ঠান, কাঁচাবাজার ও পাবলিক টয়লেট। আর হাতেগোনা কয়েকটিতে নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভগুলোও এখন জরাজীর্ণ

সাক্ষ্যদাতাদের বক্তব্য অনুসারে প্রায় পৌনে দুই একর এলাকাজুড়ে বধ্যভূমি ছিল। পুরো এলাকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল মানুষের মাথার খুলি, কঙ্কাল ও হাড়গোড়। শাহরিয়ার কবির বলেন, 'সাক্ষ্যদাতারা বলেছেন, এ হত্যাকাণ্ডের কয়েক মাস পরও সংলগ্ন খালে মাছ ধরতে গিয়ে জালে উঠে এসেছিল মানুষের কঙ্কাল। ১৯৭১ সালের এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত এ স্থানে বাঙালিদের ধরে এনে হত্যা করেছে বিহারিরা।

মো. সোলায়মান নামের এক সাক্ষ্যদাতা স্বাধীনতার পর পত্রিকায় প্রকাশিত পাহাড়তলী বধ্যভূমিতে ছড়িয়ে থাকা কঙ্কালের ছবি কমিটির সামনে উপস্থাপন করেন। ছবি ও সাক্ষ্যদাতাদের বক্তব্যের বিষয়ে জানতে চাইলে শাহরিয়ার কবির বলেন, প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য অনুসারে এখানে প্রায় ১০ হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়। এ ধারণা সত্যি হলে এটাই বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ো বধ্যভূমি। দেশের সর্ববৃহৎ বধ্যভূমি হিসাবে এটিকে রক্ষায় সরকারের বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া উচিত।

তিনি বলেন, আদালত সারা দেশের সব বধ্যভূমি ১৯৭১ সালে যে অবস্থায় ছিল, সে অবস্থায় সংরক্ষণের নির্দেশ দিয়েছেন। এই নির্দেশ অনুসারে কোনো বধ্যভূমির জমি কোনো ব্যক্তির মালিকানাধীন থাকলে তা সরকারের অধীনে নিতে হবে। পাশাপাশি সব বধ্যভূমিতে একই আঙ্গিকের স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করতে হবে।

কমিটির কাছে সাক্ষ্যদাতাদের বক্তব্য অনুসারে, ১৯৭১ সালের ১০ নভেম্বর পাহাড়তলীতে গণহত্যা সংঘটিত হয়। ১৯৭১ সালের এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত এ স্থানে বাঙালিদের ধরে এনে হত্যা করা হয় বিহারিদের সহায়তায়।

সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগের নির্দেশে গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ২০১৪ সালের ১১ মার্চে দেওয়া এক আদেশে এক দশমিক ৭৫ একর জমির সম্পূর্ণ অংশ পাহাড়তলী বধ্যভূমি বলে রায় দেওয়া হয়। চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসন থেকে জমি অধিগ্রহণের জন্য অর্থের চাহিদাপত্র ইতোমধ্যে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। ২০১৮ সালে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে–১৯ শতক পরিমাণ জমির মধ্যে সরকার দেশের সব চিহ্নিত বধ্যভূমি সংরক্ষণ করবে।

দেশের সবচেয়ে বড়ো এই বধ্যভূমি রক্ষায় সর্বোচ্চ আদালতের রায় এবং আপিলে এক দশমিক ৭৫ একর জমি রক্ষার কথা বলা আছে। মুক্তিযুদ্ধে মানবতার বিরুদ্ধে যে অপরাধ করা হয়েছে, এই বধ্যভূমি তারই স্মারক। অথচ ধীরে ধীরে এখানে অবকাঠামো নির্মাণ হয়ে গেছে। এতকিছুর পরও জায়গাটি দখলমুক্ত করে বধ্যভূমি নির্মাণকাজ শুরু সম্ভব হয়নি।

আদালতের রায় কার্যকর হয়নি

দেশে বধ্যভূমি সংরক্ষণ করা হয়েছে মাত্র ৩৫টি। ঢাকায় যে বধ্যভূমিগুলো রয়েছে, এর মধ্যে ২৩টি মিরপুর এলাকায়। যার মধ্যে অন্যতম মিরপুর বাঙলা কলেজের বধ্যভূমিটি। মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক গবেষণায় এই বধ্যভূমির কথা বারবার উঠে এলেও কলেজের ভেতরে এ সংক্রান্ত একটি ফলক ছাড়া আর কিছুই নেই।

মিরপুর বাঙলা কলেজের জলাশয়টি আসলে একটি বধ্যভূমি। যেখানে ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সেনারা মানুষকে হত্যা করে ফেলে রাখত। অথচ বাংলাদেশের ইতিহাসের সাক্ষ্য বহনকারী এই বধ্যভূমির চারপাশে এখন ময়লার স্তূপ, জায়গায় জায়গায় গড়ে উঠেছে কলেজের কর্মচারীদের থাকার ঘর ও শৌচাগার।

জলাশয়টির কিছু দূরেই রয়েছে একটি পুরোনো গাছ, সেখানে মানুষকে বেঁধে শিরশ্ছেদ করা হতো বলেও জানা যায়। ২০০৭ সাল থেকে এই বধ্যভূমি সংরক্ষণের দাবিতে কলেজের শিক্ষার্থীরা আন্দোলন করে এলেও আজ পর্যন্ত তারা আশ্বাস ছাড়া কিছু পায়নি।

মিরপুরের কালাপানি বধ্যভূমি এলাকার চিত্রও প্রায় একই। সেখানে গড়ে উঠেছে মসজিদ ও দোকানপাট। এছাড়া রাইনখোলা, শিরনিরটেক, সারেংবাড়িসহ অন্য বধ্যভূমিগুলো পড়ে আছে কোনো স্মৃতিচিহ্ন ছাড়া অযত্ন-অবহেলায়।

২০০৯ সালে এই বধ্যভূমিগুলো সংরক্ষণের পক্ষে উচ্চ আদালত রায় দেয়। এই প্রকল্প বাস্তবায়নে কয়েক দফা বাজেট বরাদ্দ হলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। মিরপুরের জল্লাদখানা বধ্যভূমিটির খননকাজ শুরু হয় ১৯৯৯ সালে। এখান থেকে ৭০টি মাথার খুলি পাওয়া যায়। তবে স্মৃতিস্তম্ভ বানাতে যে পরিমাণ জায়গার প্রয়োজন, সেই জায়গাগুলো ব্যক্তিমালিকানাধীন। প্রশ্ন হলো–তাহলে কি বধ্যভূমি সংরক্ষণ হবে না?

ইতিহাস সংরক্ষণে বধ্যভূমির জমি অধিগ্রহণ করতে হবে

রাষ্ট্রের প্রয়োজনে যে কোনো জমি সরকার অধিগ্রহণ করতে পারে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংরক্ষণের প্রয়োজনে বধ্যভূমির যেসব জায়গা ব্যক্তিমালিকানাধীন, সেগুলো একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে সরকারের অধিগ্রহণ করা উচিত। সরকারের খাসজমিতে যেসব বধ্যভূমি রয়েছে, সেগুলো দ্রুত উচ্ছেদ করে সংরক্ষণ করা সময়ের দাবি। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত অন্যান্য দখল হওয়া জমি মুক্ত করতে হবে। তাহলে জমি সংকটের কারণে বধ্যভূমিতে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণকাজ আটকে থাকবে না। আন্তরিকতার সঙ্গে কাজটি করতে পারলে মুক্তিযুদ্ধের কোনো স্মৃতি অবহেলায় পড়ে থাকার সুযোগ নেই।

এতকিছুর পরও আশার কথা হলো, ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত '১৯৭১: গণহত্যা নির্যাতন আর্কাইভ জাদুঘর'-এর পক্ষ থেকে দেশের ৩৪টি জেলা জরিপে উঠে এসেছে প্রায় ১৮ হাজার গণহত্যার নিদর্শন। আরও আটটি জেলার কাজ এডিটিং পর্যায়ে রয়েছে। বাকিগুলোর কাজ চলমান রয়েছে। জরিপের সঙ্গে সঙ্গে ডিজিটাল ম্যাপ তৈরির কাজও চলমান। ইতোমধ্যে জরিপ হওয়া জেলাগুলোর মধ্যে ১১টির মানচিত্র আপডেট করা হয়েছে। আরও ২০টির কাজ শেষ হলেও এখনো আপলোড করা হয়নি বলে জানান তিনি। প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে জরিপ কাজ শেষ হলে আশা করি সারা দেশে গণহত্যার নিদর্শনের প্রকৃত সংখ্যা জানা যাবে। এটাও মনে রাখতে হবে–গণহত্যার জায়গাগুলো চিহ্নিত করে রাখলেই হবে না, সঙ্গে সঙ্গে জায়গাটি সংরক্ষণ করে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের উদ্যোগও নিতে হবে।

লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক ও কলাম লেখক

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

বঙ্গবন্ধুর জন্মই ত্যাগ এবং মানুষকে ভালোবাসার জন্য

নিরঞ্জন রায়

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি আমাদের স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের তুলনা বঙ্গবন্ধু নিজেই। বিশ্বের অনেক নেতার জীবনী যখন পাঠ করি, তখন বঙ্গবন্ধুকে পাই এক স্বতন্ত্র অবস্থানে এবং অনন্য উচ্চতায়। বঙ্গবন্ধু এমন একজন মহান ব্যক্তি, যিনি নিজের জন্য কোনোদিন ভাবেননি। একজন মানুষ সারা জীবন শুধু ত্যাগ স্বীকার করে গেছেন শুধু মানুষকে ভালোবেসে। বঙ্গবন্ধু যে শুধু বাঙালি জাতিকে নিয়ে ভেবেছেন তেমন নয়। তিনি সমগ্র বিশ্বের মেহনতি এবং বঞ্চিত মানুষকে নিয়েই ভেবেছেন। বিভিন্ন বক্তৃতা, বিশেষ করে বিভিন্ন বিশ্বনেতার সঙ্গে আলোচনায় বঙ্গবন্ধুর এই ভাবনা স্পষ্টতই প্রকাশ পেয়েছে। বঙ্গবন্ধু নিজেই তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনীর এক স্থানে উল্লেখ করেছেন, 'একজন মানুষ হিসাবে সমগ্র মানবজাতি নিয়েই আমি ভাবি। একজন বাঙালি হিসাবে যা কিছু বাঙালিদের সঙ্গে সম্পর্কিত, তাই আমাকে গভীরভাবে ভাবায়। এই নিরন্তর সম্পৃক্তির উৎস ভালোবাসা, অক্ষয় ভালোবাসা; যে ভালোবাসা আমার রাজনীতি এবং অস্তিত্বকে অর্থবহ করে তোলে।'

বঙ্গবন্ধু সেকারণেই আগে বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের বিষয় নিয়েই ভাবতে থাকেন এবং কাজও শুরু করে দেন। সেই ছাত্রজীবনের শুরু থেকে আন্দোলন-সংগ্রামের সঙ্গে নিজেকে সক্রিয়ভাবে নিয়োজিত করেন এবং নেতৃত্ব দিতে শুরু করেন। বঙ্গবন্ধুর দৃঢ়বিশ্বাস ছিল ভারতবর্ষ ব্রিটিশদের কাছ থেকে এমনভাবে স্বাধীন হবে, যেখানে বাঙালি জাতির স্বার্থ রক্ষা করা হবে। কিন্তু বাস্তবে যেভাবে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ভাগ হয়ে স্বাধীন দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হলো তাতে বঙ্গবন্ধু ভীষণভাবে আশাহত হয়েছিলেন। এই স্বাধীনতায় বাঙালিদের স্বার্থ তো

রক্ষা হয়ইনি, বরং উপেক্ষিত হয়েছে। এ কারণেই বঙ্গবন্ধু তখন থেকেই বাঙালিদের স্বার্থরক্ষার বিষয়ে নতুন করে ভাবতে শুরু করেন এবং সেই উদ্দেশ্যে কাজও শুরু করে দেন। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতবর্ষ ভাগ হওয়ার কারণে বঙ্গবন্ধুর সবচেয়ে কষ্টের জায়গা ছিল–কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের ক্ষমতালোভী নেতারা সাধারণ মানুষের আবেগ-অনুভূতির বিষয়টি একেবারেই অবজ্ঞা করেছেন। এমনকি হাজার বছরের ঐতিহ্য সব ধর্মের মানুষের মধ্যে মিলেমিশে বসবাস করার সম্প্রীতিও নষ্ট করে সাম্প্রদায়িকতার বীজ রোপণ করা হয় ভারতবর্ষে, যার খেসারত দিতে হচ্ছে আজও। শুধু ধর্মের ওপর ভিত্তি করে ভারত ও পাকিস্তান নামের দুটি রাষ্ট্র সৃষ্টির বিষয়টি বঙ্গবন্ধু মেনে নিতে পারেননি। এ ব্যাপারে তাঁর ভাবনার বিষয়গুলো পরবর্তী সময়ে বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন বক্তৃতা, আলোচনা, বিশেষ করে তার ঘনিষ্ঠদের সঙ্গে আলোচনায় এবং নিজের লেখনীতে কিছুটা প্রকাশ করে গেছেন। বঙ্গবন্ধুর এরকম একজন ঘনিষ্ঠ সহচর এবং অনুজ মাহফুজুল বারী, সংক্ষেপে যিনি বারী ভাই নামে বেশি পরিচিত ছিলেন এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার একজন অভিযুক্ত আসামি ছিলেন, তার কাছ থেকেই বঙ্গবন্ধুর এরকম ভাবনার কিছু কথা জানার সুযোগ হয়েছিল।

বঙ্গবন্ধু তাঁর এই ভাবনা এবং আদর্শের ওপর ভিত্তি করেই বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন, দেশ স্বাধীন করেছেন এবং দেশ পরিচালনার মূলনীতি গ্রহণ করেছেন। দেশ স্বাধীন করার নেতৃত্ব দিয়ে জাতিকে যে দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের পথে নিয়ে গেছেন, সেখানে ব্রিটিশদের চাপিয়ে দেওয়া দ্বিজাতিতত্ত্বকে পেছনে ফেলে ধর্মবর্ণনির্বিশেষে সব বাঙালি জাতিকে অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে সেই দ্বিজাতিতত্ত্বের কবর রচনা করে একজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে সব স্তরের মানুষ স্বাধীনতাযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল, ৩০ লাখ মানুষ আত্মাহুতি দিয়েছে, ২ লাখের বেশি মা-বোন সম্ভ্রম হারিয়েছেন এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে দেশ স্বাধীন করেছেন। স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানের মূলনীতিতে ধর্মনিরপেক্ষতা গ্রহণ করে বঙ্গবন্ধু ইতিহাসের সবচেয়ে নিন্দনীয় এবং ব্রিটিশদের কুটবুদ্ধির ফল দ্বিজাতিতত্ত্বকে চিরতরে নির্বাসনে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে বঙ্গবন্ধুর এই উদ্যোগ বেশিদিন এগোতে পারেনি। যদিও বঙ্গবন্ধুর জীবদ্দশায় কোনো পক্ষই বঙ্গবন্ধুর এমন প্রচেষ্টার ব্যাপারে কোনোরকম প্রশ্ন উত্থাপন করতে সাহস করেনি; কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করার পর প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ পালটে যায়। দেশকে আবার পাকিস্তানি ভাবধারায় নিয়ে যাওয়ার সব ধরনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ, বাঙালির হাজার বছরের ঐতিহ্য অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে নির্বাসনে পাঠিয়ে সেই ঘৃণ্য দ্বিজাতিতত্ত্বের অর্থাৎ হিন্দু-মুসলিম বিভেদকে সামনে এনেই ক্ষান্ত হয়নি। এর সঙ্গে হাজির করা হয় আরও দুই বিভেদের তত্ত্ব অর্থাৎ ভারত বিরোধিতা এবং আওয়ামী লীগ বিরোধিতা। এ কারণে ১৯৭৫ সালের পটপরিবর্তনের পর বাংলাদেশ পরিণত হয় চার জাতিতত্ত্বের সমাহার, যা নানাভাবে সমাজে শক্ত অবস্থান করে জেঁকে বসে আছে। এ কারণেই বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সব সফলতাকেই দেশের একটি অংশ এখনো বিবেচনা করে এর ভিত্তিতে অর্থাৎ আওয়ামী লীগ বিরোধিতা, ভারত বিরোধিতা এবং হিন্দু বিরোধিতার দৃষ্টিকোণ থেকে।

এই শ্রেণির মানুষ শেখ হাসিনার কোনো সফলতাকেই সহ্য করতে পারে না শুধু তাদের চার জাতিতত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গির কারণে। পদ্মা সেতু নির্মাণ না করলে বলবে দেশের কোনো উন্নতিই এ সরকার করতে পারছে না। আবার পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল, কর্ণফুলি টানেলসহ দেশের মেগা প্রকল্পগুলো যখন এগিয়ে চলছে, তখন বলবে এসব প্রকল্পে দুর্নীতি হচ্ছে। এক যুগেরও বেশি সময় একটানা দেশ শাসনের সুযোগ পাওয়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনেক যুগান্তকারী অর্থনৈতিক কর্মসূচি হাতে নিতে পেরেছেন এবং তা সফলভাবে বাস্তবায়নও করেছেন, যার সুফল ভোগ করছে দেশের জনগণ। দেশের মানুষের মাথাপিছু আয় এখন ২ হাজার ৫০০ ডলার ছাড়িয়ে গেছে। এখানেও সেই চার জাতিতত্ত্বের ধারকবাহক খুঁত ধরার চেষ্টা করে বলে থাকে যে দেশের আয়বৈষম্য বেড়েছে। মুক্তবাজার অর্থনীতিতে উন্নতি হলে সবারই আয় উপার্জন বৃদ্ধি পাবে এবং সেই সঙ্গে আয়বৈষম্যও বাড়বে–এটাই স্বাভাবিক। উন্নত বিশ্বের একটি ব্যাংকের প্রধান নির্বাহীর বেতন একজন ব্যবস্থাপকের বেতনের চেয়ে প্রায় ১৫০ গুণ বেশি। অর্থাৎ একজন ব্যবস্থাপকের বেতন যদি হয় ১ লাখ ডলার, তাহলে সেই ব্যাংকের প্রধান নির্বাহীর বেতন হবে ১ কোটি ৫০ লাখ ডলার। অথচ আমাদের দেশের একটি বেসরকারি ব্যাংকের প্রধান নির্বাহীর বেতন সেই ব্যাংকের একজন ব্যবস্থাপকের বেতনের ১০ গুণ। অর্থাৎ একজন প্রধান ব্যবস্থাপকের বেতন যদি হয় ১ লাখ টাকা, তাহলে সেই ব্যাংকের প্রধান নির্বাহীর বেতন হয় ১০ লাখ টাকা। উন্নত বিশ্বে এই অস্বাভাবিক আয়বৈষম্য যে শুধু ব্যাংকের ক্ষেত্রে ঘটে তেমন নয়। সব প্রতিষ্ঠানেই মোটামুটি একই রকম অবস্থা বিরাজ করে। অর্থাৎ আয়বৈষম্য মুক্তবাজার অর্থনীতির এক অনিবার্য এবং নিষ্ঠুর বাস্তবতা।

বঙ্গবন্ধু মানুষকে ভালোবেসে, বিশেষ করে বাঙালিদের কথা ভেবে, তাদের ন্যায্য অধিকার এবং নিজস্ব আবাসভূমির কথা ভেবে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার করেছেন। জীবনের দীর্ঘ সময় এবং বলা যায় জীবনের সোনালি সময়ের পুরোটাই কাটিয়েছেন কারাগারে। আন্দোলন-সংগ্রামকে সফল করতে গিয়ে এবং মানুষকে স্বাধীনতাসংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করতে ছুটে বেড়িয়েছেন দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল মাসের পর মাস এবং বছরের পর বছর। মানুষকে ভালোবেসেছেন অন্তর দিয়ে এবং মানুষের ভালোবাসাও পেয়েছেন অকাতরে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেশের শাসনভার নিয়েও একমুহূর্তের জন্য হলেও শান্তিতে থাকতে পারেননি। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে পুনর্গঠন করে দ্রুততম সময়ের মধ্যে দেশের মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর কাজে আত্মনিয়োগ করেন এমনভাবে যে আবারও ভুলে যান নিজের কথা এবং নিজের পরিবারের কথা। দেশের রাষ্ট্রপতি হয়েও জীবনযাপন করেন অতি সাধারণের মতো। বাঙালিকে সেই আগের মতোই ভালোবেসে এবং তাদের প্রতি শতভাগ আস্থা রেখে বঙ্গবন্ধু তাঁর ৩২ নম্বরের বাসভবনকে কখনোই রাষ্ট্রপতি ভবন বানানোর কথা কল্পনাও করেননি। বরং ৩২ নম্বরের বাসভবনকে তিনি আগের মতোই বঙ্গবন্ধুর বাসভবন করে রেখেছিলেন এবং সেখানে শত্রু-মিত্র সবার অবাধ যাতায়াতের সুযোগ ছিল। আর এটাই ছিল বড়ো দুর্বলতা। এটি বঙ্গবন্ধু তাঁর জীবদ্দশায় নিজেই বুঝেছিলেন। এ কারণেই বিদেশি এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে বঙ্গবন্ধু সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন, তাঁর বড়ো শক্তি তিনি জনগণকে ভালোবাসেন এবং তাঁর বড়ো দুর্বলতা হচ্ছে তিনি জনগণকে বেশি ভালোবাসেন। দুর্ভাগ্য আমাদের, বঙ্গবন্ধুর বাঙালিদের প্রতি তাঁর অপরিসীম ভালোবাসা এবং তাদের ওপর আস্থার প্রতিদান আমরা সেভাবে দিতে পারিনি। বঙ্গবন্ধুর ভালোবাসার এবং বিশ্বাসের সুযোগ নেয় একদল চক্রান্তকারী, ষড়যন্ত্রকারী এবং বিপথগামী মানুষ। তারা বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করে। ছোট্ট শিশু রাসেলসহ পরিবারের সব সদস্য এবং বঙ্গবন্ধুকে যেভাবে হত্যা করা হয়েছে, এর নজির সমসাময়িক ইতিহাসে বিরল।

ভাগ্যগুণে বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং শেখ রেহানা বিদেশে অবস্থান করায় প্রাণে বেঁচে যান, যে কারণে আজ আমরা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের উন্নত বাংলাদেশ পেয়েছি। তা না হলে যে

কেমন বাংলাদেশ হতো, তা কল্পনা করাও কষ্টকর। বঙ্গবন্ধুকে নির্মমভাবে হত্যার পর তাঁর আদর্শকে তো জলাঞ্জলি দেওয়া হয়েছিলই, সেই সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর নাম-ঠিকানা পর্যন্ত মুছে ফেলা হয়েছিল। এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছিল যে বঙ্গবন্ধুর নাম নেওয়া ছিল রীতিমতো অপরাধ। আশির দশকে আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং তখন একমাত্র জহুরুল হক হল ও জগন্নাথ হল ছাড়া অন্যান্য হলে বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া সংগঠন ছাত্রলীগ টিকতেই পারত না। সেসব হলে বঙ্গবন্ধুর নাম উচ্চারণ করা ছিল রীতিমতো ভয়ের ও আতঙ্কের। ছাত্রলীগের অবস্থান জহুরুল হক হল ও জগন্নাথ হলে থাকায় হল দুটির ওপর নির্যাতনও হয়েছে যথেষ্ট। বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার এবং বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ফিরিয়ে আনা তো দূরের কথা, আমরা ছাত্রজীবনে কখনো বিশ্বাস করতে পারিনি যে একদিন আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রক্ষমতায় যাবে। ভাবতে ভালো লাগছে যে একসময় যা কল্পনা করতে পারিনি, আজ তাই বাস্তবতা। বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া এবং মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়া সংগঠন আওয়ামী লীগ আজ এক যুগেরও বেশি সময় রাষ্ট্রক্ষমতায় আছে। বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার সম্পন্ন হয়ে বিচারের রায়ও কার্যকর করা হয়েছে

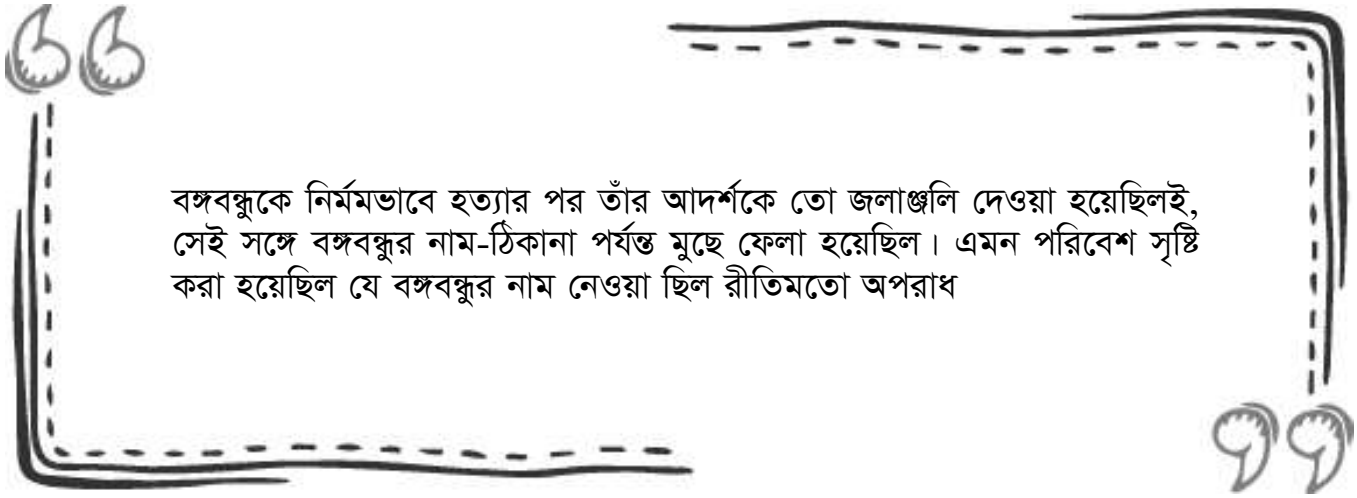

এবং দেশে মুক্তিযুদ্ধের ও অসাম্প্রদায়িক আদর্শ অনেকটাই পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে। যদিও এর সবকিছুই সম্ভব হয়েছে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনার সফল এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বের কারণে; কিন্তু মূল শক্তিটা নিহিত আছে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ এবং মানুষকে অপরিসীম ভালোবাসার মাঝে।

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বঙ্গবন্ধুর আদর্শ পুনরুদ্ধার করা এবং সেই আদর্শকে অনুসরণ করেই বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশ পরিচালনা করতে শতভাগ সফল হয়েছেন। কিন্তু বাস্তবে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ নতুন প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে আমরা যথেষ্ট সফল হয়েছি–এমন দাবি করা যাবে কি না সন্দেহ আছে। অনেকেই বঙ্গবন্ধুর আদর্শের কথা অনবরত মুখে বললেও তারা সেই আদর্শ কতটা সত্যিকার অর্থে ধারণ করেন, তা ভেবে দেখার দাবি রাখে। তা না হলে অনেকের কর্মকাণ্ড যেভাবে প্রকাশ হয় তাতে মনে হয় না যে তারা বঙ্গবন্ধুর আদর্শের কথা আদৌ জানে। একথা সত্যি যে নতুন প্রজন্মের সবাই এখন বঙ্গবন্ধুকে জানে এবং বঙ্গবন্ধুর ব্যাপারে সঠিক তথ্যই তারা জানে। কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে জানা আর বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে জানা মোটেই এক কথা নয়। বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে জানতে হলে জানতে হবে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শন, আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস এবং বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবনের ইতিহাস। আর এসব জানতে হলে এ সংক্রান্ত বিষয়ে যথেষ্ট পড়াশোনার কোনো বিকল্প নেই। অথচ আমাদের সমাজে পড়াশোনার অভ্যাসও যেমন কমতে শুরু করেছে, তেমনই পড়াশোনার সুযোগ তেমন অবারিত নয়। জ্ঞান অর্জনের সুযোগ অবারিত করা হয় পাবলিক লাইব্রেরির মাধ্যমে। তথ্যপ্রযুক্তির স্বর্গরাজ্য উন্নত বিশ্বের দেশগুলোয় এখনো পাবলিক লাইব্রেরির গুরুত্ব হ্রাস করা হয়নি মোটেই, বরং বৃদ্ধি করা হয়েছে অনেকাংশে। অথচ আমাদের দেশে পাবলিক লাইব্রেরির প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে যাওয়ার পথে। যেখানে প্রতিটি গ্রামে একটি করে পাবলিক লাইব্রেরি থাকা প্রয়োজন, সেখানে প্রতিটি জেলার পাবলিক লাইব্রেরিগুলো বন্ধের উপক্রম। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ প্রজন্মের পর প্রজন্মের মাঝে প্রসারিত করার স্বার্থে দেশের প্রতিটি জেলার পাবলিক লাইব্রেরিগুলো সচল এবং আধুনিক করে গড়ে তোলা প্রয়োজন। সেই সঙ্গে প্রতিটি উপজেলায় এবং পর্যায়ক্রমে প্রতিটি গ্রামে একটি করে আধুনিক পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। সেসব লাইব্রেরির একটি স্থান নির্ধারিত থাকবে বঙ্গবন্ধুর এবং আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ওপর লিখিত বইয়ের জন্য।

বর্তমান ডিজিটাল বাংলাদেশে বিশাল আকৃতির লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হবে না। খুবই ছোট্ট পরিসরে একটি লাইব্রেরি রেখে পাশাপাশি ভার্চুয়াল লাইব্রেরি চালু করা প্রয়োজন। এই ভার্চুয়াল লাইব্রেরির একসেস হতে হবে খুবই সহজ এবং ঝামেলামুক্ত। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, আমরা এমন এক সমাজব্যবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছি, যেখানে মানুষ ফেসবুকে না থেকে লাইব্রেরিতে লগইন করে বই পড়বে–এমনটা আশা করা দুরূহ। তাই মানুষকে লাইব্রেরিতে গিয়ে বা লগইন করে বই পড়তে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এজন্য কিছু উৎসাহ বা প্রণোদনাও দেওয়া যেতে পারে। যেমন কেউ যদি নিয়মিত লাইব্রেরি থেকে বই পড়ে, তাহলে তাদেরকে কিছুটা ইন্টারনেট সেবা বিনামূল্যে প্রদান করা যেতে পারে। নিয়ম করে দেওয়া যেতে পারে যে, ভার্চুয়াল লাইব্রেরিতে লগইন করে পড়তে কোনো ইন্টারনেট চার্জ দিতে হবে না।

এমনকি কেউ যদি প্রতিদিন ন্যূনতম দুই ঘণ্টা করে বঙ্গবন্ধুর এবং আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ওপর লিখিত বই পড়ে, তাহলে সে মাসে ৫০ জিবি ইন্টারনেট সেবা ফ্রি পাবে। এরকম কিছু প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রণোদনা প্রদানের মাধ্যমে একবার মানুষকে বই পড়তে অভ্যস্ত করে তুলতে পারলে মানুষ তখন নিজের আগ্রহেই বই পড়বে। এভাবে মানুষকে বঙ্গবন্ধুর এবং মুক্তিযুদ্ধের ওপর বই পড়ায় উৎসাহিত করার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ তাদের মাঝে সত্যিকার অর্থে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব। সেই সঙ্গে স্কুল-কলেজে বঙ্গবন্ধুর জীবন, আদর্শ এবং রাজনীতির ওপর রচিত বই পাঠ্যসূচি হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা বাধ্যতামূলক করতে হবে। কারণ, বঙ্গবন্ধুকে ভালোভাবে জানতে হলে তা স্কুল-কলেজ থেকেই শুরু করতে হবে।

বঙ্গবন্ধু এখন সেই একাত্তরের মতোই সমান জনপ্রিয় এবং সবার আদর্শ। তেমনই আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও তিনি এখন খুবই পরিচিত এবং আলোচিত নাম। বিশেষ করে ইউনেস্কো কর্তৃক বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক সেই কালজয়ী ভাষণকে স্বীকৃতি দেওয়ায় বঙ্গবন্ধু এখন আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নেতা। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বের সরকার বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে পালন করার ফলে বঙ্গবন্ধুর নাম এখন আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিশেষভাবে আলোচিত ও প্রশংসিত। তবে বঙ্গবন্ধুর এই স্বীকৃতিকে দীর্ঘস্থায়ীভাবে বিশ্ব ইতিহাসের অংশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে বিশ্বের নামিদামি বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধুর ওপর গবেষণা চালু করা প্রয়োজন। বিশেষ করে হার্ভার্ড, ইয়েল, ব্রাউন, টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বা রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে কিছু অনুদান বা স্কলার-শিপ চালু করার মাধ্যমে খুব সহজেই এই গবেষণা কোর্স চালু করা যায়। এ ব্যাপারে বঙ্গবন্ধু ট্রাস্টের ফান্ডে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ জমা দিয়ে বা অনুদান হিসাবে সংগ্রহ করে সেই তহবিল লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করা যেতে পারে। আর সেই বিনিয়োগ থেকে যে আয় হবে, তা দিয়েই এই গবেষণা অর্থের জোগান দেওয়া সম্ভব। কাজটি মোটেই কঠিন নয়। তবে এজন্য প্রয়োজন যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা।

এখনো পশ্চিমা বিশ্বের মানুষের তথ্যসূত্র এখানকার লাইব্রেরিগুলো। মানুষের কোনো বিষয়ে বিস্তারিত জানার প্রয়োজন হলে তারা এখানকার লাইব্রেরিতে যায়। এসব লাইব্রেরিতে আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধুর ওপর রচিত প্রকাশনা তেমনটা নেই বললেই চলে। সামান্য কিছু প্রকাশনা দেখা যায়, তাও সেগুলো মূলত পঁচাত্তরপরবর্তী সরকারের সময় সরবরাহ করা হয়েছে। ফলে সেসব প্রকাশনায় পর্যাপ্ত তথ্য যেমন নেই, তেমনই কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিকৃত ও বিভ্রান্তকর তথ্যও দেখা যায়। এখন আমাদের অনেক প্রকাশনা আছে এবং সেগুলো ইংরেজিতে। এমনকি বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী ও কারাগারের রোজনামচা ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয়েছে বলেই জেনেছি। সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও কর্তৃপক্ষ চাইলে ইংরেজিতে প্রকাশিত আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধ এবং বঙ্গবন্ধুর ওপর বই ও প্রকাশনা পর্যাপ্ত পরিমাণে আমেরিকা, কানাডাসহ উন্নত বিশ্বের অনেক দেশের লাইব্রেরিতে সরবরাহ করার উদ্যোগ নিতে পারে। এ ব্যাপারে একটি বিষয় সবারই জানা থাকা প্রয়োজন যে, এখন কোনো লাইব্রেরি আর নিজেদের অর্থ দিয়ে বই কিনে পাঠকদের জন্য সংগ্রহ করে না। বিভিন্ন দেশের প্রকাশক ও সরকার অনুদান হিসাবে তাদের বই ও প্রকাশনাসামগ্রী এসব লাইব্রেরিতে দিয়ে থাকে এবং সেগুলোই পাঠকদের জন্য সংগ্রহ করা হয়। আমাদের সরকারও বিষয়টি বিবেচনা করে এখানকার লাইব্রেরিগুলোয় আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধুর ওপর ইংরেজিতে প্রকাশিত বই অনুদান হিসাবে প্রদান করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। অনেক অপপ্রচার এবং সব ধরনের বৈরী প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধ বিশ্ব ইতিহাসে এক বিরল ঘটনা হিসাবে আজ সর্বজনবিদিত। তেমনই বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বও আজ বিশ্ব স্বীকৃত এবং তিনি আজ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। এই স্বীকৃতিকে ধরে রাখা এবং স্থায়ী রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে যেসব পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন, এর সবকিছুই গ্রহণ করার এখনই উপযুক্ত সময়।

বঙ্গবন্ধুর কাছে আমাদের রেখেছ চিরঋণী করে। এই ঋণ শোধ করার ধৃষ্টতা আমাদের নেই এবং সেই চেষ্টাও কোনোদিন করতে পারব না। শুধু বঙ্গবন্ধুর আদর্শের মাঝেই বাঁচতে চাই এবং সেই আদর্শকে ধারণ করে বঙ্গবন্ধুর দেখানো পথে যদি বাকি জীবন থাকতে পারি, তাহলেই নিজেকে ধন্য মনে করব। বঙ্গবন্ধুর কথা আমাদের জীবনের প্রতিপদে মনে পড়ে। বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে আরও বেশি তোমায় মনে পড়ে এবং বঙ্গবন্ধুকে স্মরণ করি বিনম্র শ্রদ্ধায়। বঙ্গবন্ধু তুমি যেখানেই থাক, শান্তিতে থাক। সেখান থেকেই দেখ তোমার সোনার বাংলা আজ তোমারই সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সফল নেতৃত্বে উন্নতির অগ্রযাত্রায় এগিয়ে চলছে দ্রুতগতিতে।

লেখক: সিপিএ, সিএমএ, সিএএমএস, ব্যাংকার, কমপ্লায়েন্স স্পেশালিস্ট ও কলাম লেখক, টরেন্টো, কানাডা

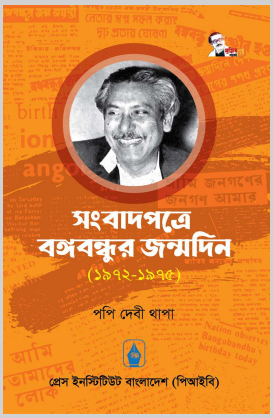

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

বিস্মৃতপ্রায় এক গণহত্যা

মোহাম্মদ এনায়েত হোসেন

গত ২৫ জানুয়ারি জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে এক উন্মুক্ত আলোচনায় ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি টিএস ত্রিমূর্তি বিশ্বব্যাপী রাষ্ট্রীয়ভাবে সন্ত্রাস বেড়ে যাওয়ার কথা উল্লেখ করে বলেছেন–আঞ্চলিক, বিশ্বশান্তি ও স্থিতিশীলতার স্বার্থে সন্ত্রাস প্রতিরোধে বিশ্ব সম্প্রদায়কে এগিয়ে আসা উচিত। প্রসঙ্গান্তরে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে সংঘটিত গণহত্যার আন্তর্জাতিক বিচারও দাবি করেছেন তিনি। দেখতে দেখতে আমরা স্বাধীনতা অর্জনের ৫১ বছর পেরিয়ে এলাম। রাষ্ট্রীয়ভাবে ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস পালন করা হলেও আন্তর্জাতিক পরিসরে এই দিবসটি এখনো উপেক্ষিত। বর্তমান সরকার নানা প্রচেষ্টায় দিবসটি আন্তর্জাতিকভাবে পালনের উদ্যোগ নিচ্ছে। টিএস ত্রিমূর্তির দাবির প্রতি সম্মান জানিয়ে বলতে চাই–মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বেই আমরা শিগগিরই এই স্বীকৃতি পাব।

স্বাধীনতাসংগ্রামে বহু গৌরবময় ইতিহাসের স্রষ্টা চট্টগ্রাম। একাত্তরে সারা দেশের মতো চট্টগ্রামেও শুরু হয় পরিকল্পিত গণহত্যা। গণহত্যার এই নারকীয়তা চলে দেশ স্বাধীন হওয়ার আগপর্যন্ত। চট্টগ্রাম সেনানিবাস একাত্তরের বর্বরতার প্রথম সাক্ষী। এখানে ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে প্রায় ২ হাজার ৫০০ নিরস্ত্র বাঙালি সৈনিককে হত্যা করা হয়। সেনানিবাসের বাইরে প্রথম গণহত্যা ঘটে ২৭ মার্চ চট্টগ্রাম বন্দরে, যার সূচনা হয় ২৪ মার্চ থেকে। বন্দরের ১৭ নম্বর জেটিতে ২৭ মার্চ ১১২ জন নিরস্ত্র বাঙালি সৈনিক পাকিস্তান বাহিনীর হাতে প্রাণ হারান। তাই চট্টগ্রামের মুক্তিযুদ্ধে ২৪ মার্চ ইতিহাসে রক্তাক্ষরে লেখা আরও একটি দিন। বাইরে সোয়াত জাহাজের প্রতিরোধটি ছিল বাঙালির জনযুদ্ধ। মূলত ২৪ থেকে ২৬ মার্চ চট্টগ্রাম বন্দরে বাঙালি সৈনিকদের বুকের তাজা রক্তে একটি ইতিহাস রচিত হয়েছিল।

চট্টগ্রাম বন্দরের গণহত্যায় মেজর জিয়াউর রহমানের নাম নানাভাবে জড়িয়ে আছে। উল্লেখ্য, মেজর জিয়াউর রহমান 'সোয়াত' জাহাজ থেকে অস্ত্র-গোলাবারুদ নামিয়ে ক্যান্টনমেন্টে আনার কাজে কমান্ডিং অফিসার লে. কর্নেল জানজুয়ার নির্দেশে চট্টগ্রাম পোর্টে যাচ্ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানিদের সাহায্য করার জন্য। এই মেসেজ পেয়েই ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান মেজর জিয়াকে সর্বশেষ ঘটনা জানিয়ে 'সোয়াত' জাহাজে যাওয়া থেকে বিরত থাকতে বার্তা পাঠান। পরে জনতার প্রতিরোধে এবং সেনা অফিসারদের অনুরোধে তিনি ফিরে আসেন। জিয়াউর রহমান নিজেই তার এক লেখায় লিখেছেন, '২৫ ও ২৬ মার্চের মধ্যবর্তী কালরাত। রাত ১১টায় আমার কমান্ডিং অফিসার আমাকে নির্দেশ দিল নৌবাহিনীর ট্রাকে করে চট্টগ্রাম বন্দরে গিয়ে জেনারেল আনসারীর কাছে রিপোর্ট করতে।' (একটি জাতির জন্ম: জিয়াউর রহমান, বিচিত্রা, স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা, ১৯৭৪)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, "পাকিস্তান ২৫ মার্চ নিরস্ত্র বাঙালির ওপর হামলা করে। জাতির পিতা বলেছিলেন, 'যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুতি নাও। রাস্তাঘাট বন্ধ করে দাও।' সমগ্র বাংলাদেশেই ব্যারিকেড দিচ্ছিল জনতা। ২৫ মার্চ চট্টগ্রামে যারা ব্যারিকেড দিচ্ছিল, তাদের ওপর যারা গুলি চালিয়েছিল, তাদের মধ্যে জিয়াউর রহমান একজন। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অফিসার হিসাবে বাঙালি যারা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করেছিল, জাতির পিতার নির্দেশে যারা সেদিন রাস্তায় ব্যারিকেড দিচ্ছিল, তাদের অনেককে জিয়াউর রহমান গুলি করে হত্যা করে। চট্টগ্রামের যারা মুক্তিযোদ্ধা, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলে এ তথ্য পাওয়া যাবে। তারা দেশেও আছে, বিদেশেও অনেকে আছে।"

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, 'শুধু তাই নয়, জিয়াউর রহমান ২৫ ও ২৬ মার্চ দুই দিনই এ হত্যাকাণ্ড চালায়। ২৬ তারিখে সে যাচ্ছিল সোয়াত জাহাজ থেকে অস্ত্র নামাতে। এ অস্ত্র যাতে না নামায়, সেখানে কিন্তু আমাদের সংগ্রাম পরিষদের নেতারা বাধা দিয়েছিল। ছাত্ররা, সাধারণ জনগণ সেখানে বাধা দিয়েছিল। সেখানেই তারা জিয়াউর রহমানকে আটকায়, যাতে জাহাজ থেকে অস্ত্র নামাতে না পারে। ওইদিন পর্যন্ত সে তাদের হাতেই ছিল। মুক্তিযুদ্ধের দীর্ঘ নয় মাসে বাংলাদেশে পাকিস্তান সেনাবাহিনী যত গণহত্যা চালিয়েছিল, চট্টগ্রাম তার অন্যতম। এই নিবন্ধে চট্টগ্রাম বন্দরের সেই গণহত্যার চিত্রই তুলে ধরছি।

১৯৭১ সালের ২৪ মার্চ। দুপুরে কর্নেল সিগরীর নির্দেশে ইবিআরসি থেকে ৬০ জন বাঙালি সৈন্যকে ২০নং বেলুচ রেজিমেন্টের একটা কোম্পানির সঙ্গে চট্টগ্রাম বন্দরে পাঠানো হয়। বাঙালি সেনাদের বিনা অস্ত্রে পাঠানো হয়েছিল। আর বেলুচ রেজিমেন্টের কোম্পানিকে পাঠানো হয়েছিল অস্ত্রসজ্জিত করে। চট্টগ্রাম বন্দরের ১৭নং জেটিতে পৌঁছানোর পর বেলুচ জওয়ানরা ওই জেটির চারদিক ঘিরে রাখে। আর বাঙালি সৈন্যদের নির্দেশ দেওয়া হয় জাহাজ থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ খালাস করার। বেলুচ রেজিমেন্টের জওয়ানদের সঙ্গে কমান্ডার ছিল একজন পাঞ্জাবি মেজর। আর বাঙালি সেনাদের সঙ্গে ছিলেন নায়েব সুবেদার নূরুল ইসলাম ও নায়েব সুবেদার গোলাম সাত্তার।

কয়েকদিন আগে এই জাহাজটি পশ্চিম পাকিস্তান থেকে চট্টগ্রাম বন্দরে ভিড়েছে। বরাবরের মতো বেসামরিক লোকদের জাহাজ থেকে মালামাল খালাস করার কথা। কিন্তু পাকিস্তানি সেনারা তাদের বাধা দেয়। বাধা সরাতে সেনারা জনতার ওপর গুলি ছোড়ে। ফলে জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে জাহাজের কাছ থেকে সরে যায়। সোয়াত জাহাজটি ছিল অস্ত্র ও গোলাবারুদে বোঝাই। বেলুচ রেজিমেন্টের জওয়ানরা যখন জেটির চর্তুদিকে প্রতিরক্ষাব্যবস্থা মজবুত করার জন্য ব্যস্ত, তখন বাঙালি সেনারা সোয়াত থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ খালাসের কাজে। জানা যায়, জেটিতে যাওয়ার পর বাঙালি সেনাদের প্রথম খাবার দেওয়া হয় ২৫ মার্চ বিকালে অর্থাৎ পুরো একদিন পরে। অনেকটা অভুক্ত অবস্থায় বাঙালি সৈন্যরা যখন অস্ত্র খালাসে ব্যস্ত, তখন ব্রিগেডিয়ার আনসারী ও কর্নেল সিগরী বারবার জেটিতে গিয়ে ব্যক্তিগতভাবে কাজের তদারকি করে। এর আগে কখনো জাহাজের অস্ত্র খালাসের সময় কোনো ব্রিগেডিয়ার বা সমপর্যায়ের কেউ স্বয়ং এ ধরনের কাজ করেননি। বাঙালি সেনারা যখন অনাহার আর ক্লান্তিতে দিশেহারা, তখন ব্রিগেডিয়ার আনসারী ও কর্নেল সিগরী বারবার তাগিদ দিচ্ছিল জলদি অস্ত্র খালাসের জন্য।

২৫ মার্চ বেলা প্রায় ১টায় ২৭নং পাঞ্জাব রেজিমেন্টের আরেকটি কোম্পানি এবং ইবিআরসির এক প্লাটুন জেটিতে হাজির হয়। তাদের সঙ্গে আসে মেজর মেহের কামাল (পাঞ্জাবি), ক্যাপ্টেন আজিজ (বাঙালি), সুবেদার আবদুর রব (বাঙালি) ও নায়েব সুবেদার তৈয়ব (বাঙালি)। ২৭ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের জওয়ানরা জেটিতে যাওয়ায় বেলুচ রেজিমেন্টের জওয়ানদের উঠিয়ে নেওয়া হয়। তারপর পাঞ্জাব রেজিমেন্টের জওয়ানরা জেটির চারপাশ ভালোভাবে ঘিরে দাঁড়ায়। দ্বিতীয় দফায় বেঙ্গল রেজিমেন্টের অন্য একটি দল আসার পর বাঙালি সেনাসংখ্যা দাঁড়ায় ১২০ জনে। বাঙালি সেনারা ২৫ মার্চ সারা দিন অস্ত্র খালাসের কাজে ব্যস্ত থাকে এবং ২৬ মার্চ সকাল ১০টায় কাজ শেষ করে।

অস্ত্র খালাস শেষে বাঙালি সৈন্যরা ক্যান্টনমেন্টে ফেরত আসতে চাইলে তাদের আসতে দেওয়া হয় না। পাঞ্জাবিদের কথাবার্তার সুর তখন সম্পূর্ণ পালটে গেছে। পাঞ্জাবিদের ব্যবহার ও চলাফেরায় বাঙালি সৈন্যদের মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়। কেউ কেউ ক্যাপ্টেন আজিজের কাছে গিয়ে তাকে তাদের সন্দেহের কথা জানায়। তার কাছে আশু বিপদ থেকে মুক্তির উপায় জানতে চাইলে ক্যাপ্টেন আজিজ পালটা ব্যবস্থা হিসাবে বাঙালি সৈন্যদের পাঞ্জাবি সৈন্যদের মোকাবিলায় কৌশলগত অবস্থান নিতে আদেশ দেন। উল্লেখ্য, বেঙ্গল রেজিমেন্টের দ্বিতীয় দলটির সঙ্গে তাদের নিজ নিজ হাতিয়ার ছিল।

ক্যাপ্টেন আজিজের আদেশ অনুযায়ী বাঙালি সৈন্যরা যখন পজিশন নিতে যাবে–এমন সময় ব্রিগেডিয়ার আনসারী ও কর্নেল সিগরী সেখানে হাজির হয়। ব্রিগেডিয়ার আনসারীর সঙ্গে আসে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত প্রায় ২০০ নৌসেনা। তার নির্দেশে নৌবাহিনীর লোকেরা জেটিতে আসার সঙ্গে সঙ্গেই পজিশন নেয়। ব্রিগেডিয়ার আনসারী হঠাৎ জওয়ানদের উদ্দেশ করে বলে, 'তোমরা কোথাও যাবে না। তোমরা তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র সব জমা দিয়ে দাও। কারণ রাতে তোমাদের সব হাতিয়ার একসঙ্গে রাখতে হবে।'

হাতিয়ার জমা দেওয়ার কথা শুনে বাঙালি সৈন্যরা হতবাক হয়ে ক্যাপ্টেন আজিজের দিকে তাকায়। জিজ্ঞাসা করে, 'স্যার এখন আমরা কী করব?' ক্যাপ্টেন আজিজ বলেন, 'এখন আর কিছু করার নেই। ব্রিগেডিয়ার যখন হুকুম দিচ্ছে, তখন হাতিয়ার জমা দিতেই হবে আর কোনো উপায় নেই।' ক্যাপ্টেন আজিজ তখনও পাকিস্তানিদের মতলব বুঝে উঠতে পারেননি। তখনও তিনি জানতেন না, ২৫ মার্চের রাত থেকে ওরা হত্যাযজ্ঞ শুরু করে দিয়েছে। ক্যাপ্টেন আজিজ ২৫ মার্চ দুপুরে জেটিতে চলে এসেছিলেন। তাই রাতে কোথায় কী ঘটে গেছে, তা জানার কোনো উপায় ছিল না তার। যদি জানতেন, তাহলে হয়তো বাঙালি সৈন্যদের অস্ত্রসমর্পণ করতে বলতেন না। ব্রিগেডিয়ারের নির্দেশের পরও হাবিলদার আবদুস সত্তার, হাবিলদার আবদুল খালেক, নায়েক নিজামউদ্দীন, ল্যান্স নায়েক আফসারউদ্দীনসহ অনেকে হাতিয়ার জমা দিতে অস্বীকার করেন। তখন ব্রিগেডিয়ার তাদের

সবাইকে অ্যারেস্ট করার হুমকি দেয়। তারপর একরকম বাধ্য হয়েই বাঙালি সৈন্যরা সেদিন হাতিয়ার জমা দেন। বাঙালি সৈন্যদের তখন ভাঁওতা দেওয়ার জন্য পাঞ্জাবি সুবেদারকেও হাতিয়ার জমা দিতে বলা হয়। পাঞ্জাবিরাও ৭-৮টা রাইফেল জমা দেয়। সব হাতিয়ার রাখা হয় একটি রেল ওয়াগনের মধ্যে। তারপর ওয়াগনে তালা দিয়ে ব্রিগেডিয়ার আনসারী চাবিটা নিজের কাছে রেখে দেয়। ওই সময় মেজর মেহের কামালকে একটি স্টেনগান দেওয়া হয়। কিন্তু ক্যাপ্টেন আজিজকে কোনো হাতিয়ার দেওয়া হয়নি। তারপর মেজর মেহের কামাল ক্যাপ্টেন আজিজকে জিপে করে জেটি থেকে নিয়ে যায়।

২৬ মার্চ বিকালে একজন পাঞ্জাবি মেজর এসে বাঙালি চারজন জেসিওকে ডেকে বলে, 'তোমরা কেউ এখান থেকে যাবে না। কারণ আমরা জানতে পেরেছি তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ শেখ মুজিবের অনুচর। তোমরা সেনাবাহিনীর লোক হয়ে শেখ মুজিবের আদেশ শুনতে চাও এবং প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার আদেশের তোয়াক্কা কর না। তোমাদের মধ্যে থেকে ওইসব অবাঞ্ছিত লোকদের খুঁজে বের না করা পর্যন্ত কাউকে এখান থেকে যেতে দেওয়া হবে না। তোমরা এখন জাহাজের (সোয়াত) ভেতর চলে যাও এবং রাতটা সেখানেই কাটাও।' এই বলে পাঞ্জাবি মেজর সেখান থেকে চলে যায়। দুশ্চিন্তা, নৈরাশ্য আর অনাহারে বাঙালি সৈন্যরা সারা রাত না ঘুমিয়ে জাহাজেই কাটায়। পাঞ্জাবি সেনারা সারা রাত জাহাজ পাহারায় রাখে যাতে কেউ বের হতে না পারে।

> স্বাধীনতাসংগ্রামে বহু গৌরবময় ইতিহাসের স্রষ্টা চট্টগ্রাম। একাত্তরে সারা দেশের মতো চট্টগ্রামেও শুরু হয় পরিকল্পিত গণহত্যা। গণহত্যার এই নারকীয়তা চলে দেশ স্বাধীন হওয়ার আগপর্যন্ত। চট্টগ্রাম সেনানিবাস একাত্তরের বর্বরতার প্রথম সাক্ষী

২৭ মার্চ বিকাল ৪টায় বাঙালি সৈন্যদের জেটির প্ল্যাটফরমের ওপর একত্রিত করে তাদের সামরিক কায়দায় দাঁড় করানো হয়। বিনা হাতিয়ারে এভাবে দাঁড় করানোর জন্য জেসিওদের মধ্যে সন্দেহ জাগে। তারা দেখতে পায় তাদের লক্ষ্য করে জাহাজের মধ্যে হালকা মেশিনগান ফিট করা হয়েছে। যেদিকে চোখ যায়–সেদিকেই মেশিনগান। বাঙালি সেনাদের মনে আর কোনো সন্দেহ রইল না। কিন্তু তারা কী করবে? সুবেদার রব নিরুপায় হয়ে পাঞ্জাবি সুবেদারকে জিজ্ঞাসা করে, 'আপনারা এ কী করছেন, আমাদের মেশিনগানের সামনে দাঁড় করিয়ে দিলেন। ব্যাপার কী? আপনাদের উদ্দেশ্য কী? আপনারা কি আমাদের মেরে ফেলতে চান?' পাঞ্জাবি সুবেদার জবাব দিল, 'আমি মেজর সাহেবের নির্দেশে তোমাদের মেশিনগানের সামনে দাঁড় করিয়েছি। অফিসারের নির্দেশ পালন করা আমার দায়িত্ব।' নিরুপায় সুবেদার রব হাত উঠিয়ে বলেন, 'আমরা আত্মসমর্পণ করলাম, আমরা নিরস্ত্র, আপনাদের হাতে বন্দি। এমন অসহায় অবস্থায় আপনারা আমাদের হত্যা করবেন না। আমরা তো আপনাদের মতোই সামরিক বাহিনীর লোক, আমরা তো কোনো অপরাধ করিনি।' সুবেদার রবের কথামতো সব বাঙালি সৈন্য আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু পাকিস্তানিরা সুবেদার রবের কথায় কর্ণপাত করেনি। ওদিকে অর্ডিন্যান্সের পাঞ্জাবি ক্যাপ্টেন সোয়াত জাহাজ থেকে বারবার পাঞ্জাবি সুবেদারকে তাগিদ দেয়, দেরি হয়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি কর। অবস্থা বেগতিক দেখে সুবেদার রব বাঙালি সৈন্যদের বলেন, 'তোমরা যে যেভাবে পার নিজের জীবন বাঁচাও। পাঞ্জাবিরা এখনই আমাদের হত্যা করবে।' এই বলে সুবেদার রব জেটি থেকে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়েন, দ্রুত ডুব দিয়ে জেটির নিচে চলে যান। বাকিরা পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা করতেই শুরু হয় মেশিনগানের গুলি। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে বাঙালিরা জেটির ওপর লুটিয়ে পড়ে। যারা আহত অবস্থায় তখনও এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করছিল, তাদেরও প্রাণ যায় মেশিনগানের গুলিতে। তারপর পাঞ্জাবিরা রক্তাক্ত লাশগুলো একত্রিত করে। এর পরের ঘটনা আরও পৈশাচিক, মর্মান্তিক। যারা গুরুতর আহত হয়ে পড়েছিল, তাদেরকে এক স্থানে জড়ো করা হলো। আহতরা করুণ কণ্ঠে পানি পানি করলেও কেউ এগিয়ে এলো না পানি দিতে। বরং অকথ্য ভাষায় গালাগালি করে তারা। পাঞ্জাবি মেজর আহতদের উদ্দেশে বলে, 'এখন তোদের কে রক্ষা করবে? কোথায় তোদের মুজিব? তোরা বাঙালিরা বেইমান, তোদের আর বিশ্বাস করা যায় না।' এই বলে আহত সবাইকে আবার লাইনে দাঁড় করানোর নির্দেশ দেয়। এর পরের বর্বরতা আরও নির্মম। পাঞ্জাবি মেজর সুবেদারকে ডেকে বলে, 'এই বেইমানগুলোকে মারার জন্য আর একটি গুলিও নষ্ট করবে না, এদের বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মার।

১২০ জন বাঙালি সৈন্যের মধ্যে মাত্র ৬-৭ জন ওখান থেকে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়। তাদের মধ্যে তিনজন পালাতে পেরেছিল মৃত ব্যক্তির ভান করে। শরীরে গুলি লাগার পর যারা মৃতের মতো পড়েছিল, পাঞ্জাবিরা তাদের লাশের স্তূপে ফেলে রাখে। পাঞ্জাবিরা বোঝেনি যে তারা জীবিত। তাই লাশের সঙ্গে তাদেরকেও নদীতে ফেলে দেয়। সেদিন এ কারণে বেঁচে যান ওই কজন।

আমার এই লেখার উপজীব্য নানা সময়ে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসা ব্যক্তিদের বয়ান এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন মিডিয়া ও গ্রন্থে প্রাপ্ত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে লেখা।

পরবর্তী সময়ে একাত্তর সালে সমসাময়িক জাতীয় ও আঞ্চলিক পত্রপত্রিকা, রণাঙ্গনের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের সাক্ষাৎকার, প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্যে চট্টগ্রাম জেলায় গণহত্যায় কমপক্ষে তিন লাখ লোক শহিদ হয়েছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যার মধ্যে শুধু শহরেই প্রায় ২ লাখ ৫০ হাজার। চট্টগ্রাম শহরে ১১৫টি বধ্যভূমিতে গণহত্যা হয়। যার মধ্যে ৭০টি বধ্যভূমি শনাক্ত হয়েছে। বর্তমান সরকার সেগুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে। মুক্তিযুদ্ধপরবর্তী সময়ে সামরিক সরকারের কোপানলে পড়ে আমাদের বীরত্বের বহু গল্পের বিস্মৃত হয়েছে, আত্মত্যাগের অধ্যায় লুপ্ত থেকেছে। সঠিক ইতিহাস থেকে প্রজন্মকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে। চট্টগ্রাম বন্দরের গণহত্যা এর একটি। মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী দল আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকায় আজ সেই দুঃসময়ের অবসান হয়েছে। বিনম্র শ্রদ্ধা সব শহিদের প্রতি।

লেখক: গবেষক, গবেষণা ও তথ্য সংরক্ষণ বিভাগ, পিআইবি

মুক্তিযুদ্ধে নারী

কামনা আক্তার

জগতের যত বড় বড় জয়, বড় বড় অভিযান,
মাতা ভগ্নী ও বধূদের ত্যাগে হইয়াছে মহীয়ান। .....
কোনো কালে একা হয়নি ক' জয়ী পুরুষের তরবারী
প্রেরণা দিয়াছে, শক্তি দিয়াছে বিজয়-লক্ষ্মী নারী।
রাজা করিতেছে রাজ্য শাসন, রাজারে শাসিছে রাণী,
রাণীর দরদে ধুইয়া গিয়াছে রাজ্যের যত গ্লানি।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'নারী' কবিতাটি পুরো বিশ্বের নারীদের মহত্ত্ব ও কাজের অবদানের বিষয়টি স্পষ্ট করে। ইতিহাস বলে, এই পৃথিবীর প্রতিটি মহৎ কাজে নারীর ভূমিকা অনস্বীকার্য। যুদ্ধে জয় এসেছে অথচ নারীর অবদান নেই, বিশ্ব ইতিহাসে তা বিরল। ব্যতিক্রম ছিল না বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধেও। যে যুদ্ধটা প্রকৃত অর্থেই ছিল জনযুদ্ধ। একটি পতাকার জন্য এ দেশের নারী-পুরুষ সম্মিলিতভাবে লড়েছিলেন। সেসময়ের প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পাকিস্তানি বাহিনী কর্তৃক নারীর ওপর নিপীড়ন, ধর্ষণ, লাঞ্ছনা ও সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে বাছবিচারহীনভাবে। নারী ধর্ষিত বা অত্যাচারিত হয়েছেন, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এটা যেমন বড়ো হয়ে উঠেছে, এর চেয়েও বড়ো সত্য–মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে নারীসমাজ লড়াই করেছে। দেশের ভেতরে মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়ে রক্ষা করেছেন, অন্যদিকে রণাঙ্গনে দাঁড়িয়েও বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করেছেন।

সাড়ে সাত কোটি বাঙালি নরনারী জনতার জীবন মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত। প্রায় ২ কোটি নরনারী মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন সময় স্বদেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এই বিপুল জনগোষ্ঠীর সবাই মুক্তিযোদ্ধা (বেগম, ২০০০)। অন্যদিকে বিশাল এক জনগোষ্ঠী ছিল যারা সামরিক ট্রেনিং ছাড়াই মুক্তিযোদ্ধাদের সব কাজে সাহায্য করেছেন, তারা ছিলেন বেসামরিক মুক্তিযোদ্ধা। নারী-পুরুষ, সামরিক-বেসামরিক সব মানুষের সর্বোচ্চ ত্যাগের প্রতিদানেই আজ আমাদের এই স্বাধীনতা।

সিরাজগঞ্জের মনিকা মতিন, টাঙ্গাইলের শুকুরী বেগম, জামেলা বেগম, মাজেদা বেগম সহজসরল ভাষায় বলেছেন, মুক্তিযুদ্ধের সময় নারী জনসংখ্যায় ছিল অর্ধেক। অর্থাৎ ৩ কোটি ৭৪ লাখ নারীই ছিল মুক্তিযোদ্ধা। কোনো নারী রাজাকার ছিল না। রাজাকারের কোনো কাজে সমর্থনও করেনি (বেগম, ২০০০)। বিপুলসংখ্যক এই মহীয়সী নারীর মধ্যে নিম্নে ১০ জন নারী মুক্তিযোদ্ধাকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে:

তারামন বিবি

বাংলাদেশের দুইজন বীরপ্রতীক খেতাবপ্রাপ্ত নারী মুক্তিযোদ্ধার একজন কুড়িগ্রামের তারামন বিবি। যিনি ১৯৫৭ সালে কুড়িগ্রামের চররাজিবপুর উপজেলার শংকর মাধবপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি কুড়িগ্রাম জেলায় নিজ গ্রাম মাধবপুরে ছিলেন। তিনি ১১নং সেক্টরে যুদ্ধ করেছেন, যার সেক্টর কমান্ডার ছিলেন আবু তাহের বীর-উত্তম।

তার বয়স যখন মাত্র ১৩ বা ১৪, তখন তিনি ক্যাম্পে রান্নার কাজ শুরু করেন। তারামন বিবি বলেন, 'একদিন, দিন-তারিখ মনে নেই, জঙ্গলে কচুর মুখি তুলছিলাম। একজন বয়স্ক মানুষ (মুহিফ হালদার) আমাকে বললেন, 'তুমি আমাদের ক্যাম্পে কাজ করবা। ভাত রাইন্ধা দিবা। কি, পারবা না মা?' সেদিন কোথা থেকে যেন একটা শক্তি পেলাম। মনে হলো, এই তো সুযোগ। মাথার ওপর রক্ষা করার মতো কেউ নেই, যার ভরসায় বেঁচে থাকব। মরতে তো হবেই। যুদ্ধ করে বাঁচার চেষ্টা করলে দোষের কী। তাকে বললাম, আফনে আমার মায়ের লগে কথা কন। উনি যাইবার দিলে যাইমু। সেই সন্ধ্যায় তিনি আমার মার কাছে যান। শুধু বিশ্বাসের ওপর আমার মা আমাকে তার সাথে দেন' (রহমান, ২০১৩)। সেদিন থেকেই শুরু হয় তার দেশরক্ষার যুদ্ধ।

পরবর্তী সময়ে তার সাহস ও শক্তির পরিচয় পেয়ে মুহিফ হালদার তাকে অস্ত্র পরিচালনা শেখান। তিনি ১১নং সেক্টরে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিকদের সঙ্গে কুড়িগ্রাম জেলার নদী-তীরবর্তী অঞ্চল মোহনগঞ্জ, তারাবর, কোদালকাটি ও গাইবান্ধা জেলার ফুলছড়িতে অগ্রবর্তী দলের হয়ে কয়েকটি সশস্ত্র যুদ্ধে বীরত্বের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। একই সঙ্গে নির্ভয়ে ও দক্ষতার সঙ্গে গোয়েন্দাবৃত্তির কাজ করেছিলেন। তার ভাষ্য অনুযায়ী, 'একদিন আজিজ মাস্টার বললেন, পাকিস্তানি ক্যাম্পের খবর আনতে হবে। কোনো পুরুষ যেতে পারবে না। যেতে হবে আমাকে, তা-ও নদী পার হয়ে। কথাগুলো শুইনাই কইলজাটা চিনচিন করে উঠল। রাজি হয়ে গেলাম, যা থাকে কপালে! পাগলির বেশে, ছেঁড়া কাপড় পরে যেতাম শত্রুর ক্যাম্পে' (রহমান, ২০১৩)। এভাবেই তিনি মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদান রেখে গেছেন।

তার এমন মহৎ কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ তাকে ১৯৭৩ সালে 'বীরপ্রতীক' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

সিতারা বেগম

১৯৪৬ সালের ৫ সেপ্টেম্বর কিশোরগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন ড. ক্যাপ্টেন সিতারা বেগম। মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অবদান অপরিসীম।

যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার জন্য মেলাঘরে বাংলাদেশ ফিল্ড হাসপাতাল নামে ৪৮০ শয্যার একটি হাসপাতাল ছিল। ঢাকা মেডিক্যালের শেষবর্ষের অনেক ছাত্র সেখানে কাজ করতেন। ড. ক্যাপ্টেন সিতারা বেগম সেক্টর-২ এর অধীনে সেখানের কমান্ডিং অফিসার ছিলেন। তাঁকে নিয়মিত আগরতলা থেকে ওষুধ আনার কাজ করতে হতো। হাসপাতালে একটি অপারেশন থিয়েটার ছিল। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা, বাঙালি ছাড়াও সেখানে ভারতীয় সেনাবাহিনীর লোকজন চিকিৎসাসেবা নিত। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিপুণ পরিচালনার ফলে বিপুলসংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা এবং বাংলাদেশের জন্য যুদ্ধরত ভারতীয় সেনাকে মৃত্যুর মুখ থেকে ছিনিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে।

কাকন বিবি

বীরাঙ্গনা, বীর মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তির বেটি, মুক্তিযুদ্ধের অগ্নিকন্যা ও বীরমাতা নামে খ্যাত অকুতোভয় সংগ্রামী এক নারীর নাম কাকন বিবি। তিনি ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের খাসিয়া পাহাড়ের পাদদেশের নক্রাই গ্রামে এক পাহাড়ি খাসিয়া পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বীরাঙ্গনা কাকন বিবি ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে ৫নং সেক্টরের অধীন সুনামগঞ্জের দোয়ারাবাজার উপজেলার শেলা সাব-সেক্টরের অধীনে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে অসীম সাহসিকতা ও বীরত্বের পরিচয় দেন। প্রথমদিকে তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের গুলির বাক্স এবং মুক্তিযোদ্ধাদের খাবার, ওষুধপত্র বহন ও পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ভিখারিনীর ছদ্মবেশ ধারণ করে পাকিস্তানি সেনাদের কাছ থেকে তথ্য জোগাড় করে মুক্তিবাহিনীর কাছে পৌঁছে দিতেন। একই সঙ্গে ২০টির মতো সম্মুখযুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন। সুনামগঞ্জে যে ভয়াবহ যুদ্ধ হয়েছিল, সেই যুদ্ধে কাকন বিবি মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে ছিলেন। এ যুদ্ধের সময় মুক্তিযোদ্ধারা বোমা মেরে একটি ব্রিজ উড়িয়ে দেয়, দুই রাত ও একদিন তুমুল যুদ্ধের পর মুক্তিবাহিনী জয় লাভ করে এবং 'জয় বাংলা' স্লোগান দিয়ে ওঠেন। কাকন বিবি বলেন, 'জয় বাংলা স্লোগান দিতে দিতে আমরা যখন ওদের ঘিরে ফেলি, তখন আমাকে দেখে এক পাকিস্তানি সৈন্য বলে, আগে বলেছিলাম এই বেটি মুক্তিযোদ্ধা।'

ফোরকান বেগম

রূপগঞ্জের পুটিয়া গ্রামের ফোরকান বেগম ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন। স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের একজন সক্রিয় কর্মী হিসাবে এবং বিভিন্ন পর্যায়ে ছাত্রলীগের সদস্য হিসাবে ১৯৭১-এর ফেব্রুয়ারিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কলাভবনের দোতলায় গেরিলা ট্রেনিং শুরু করেন। ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ কারফিউ ভাঙার পর হাজার হাজার মানুষ গ্রামে আসা শুরু করে এবং অসহযোগের সময় গ্রামের যেসব ছেলেমেয়েকে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছিল, তাদের একত্র করে তিনি যুদ্ধে পাঠিয়ে দেন। ৫০/৬০জন আলবদর, রাজাকারদের মটিভেট করে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে আনেন। মুক্তিযোদ্ধাদের আগরতলায় যাতায়াতের এবং আগরতলা থেকে দেশের ভেতরে প্রবেশের পথ সুগম করেন। এছাড়াও অন্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান, মুক্তিযোদ্ধাদের নার্সিংয়ের কাজ, নারী-পুরুষদের কলেমা শেখানোর কাজ করতেন। এছাড়াও তিনি এবং তার দল পাকসেনাদের জিপে গ্রেনেড চার্জ করে অনেককেই আহত করেন।

আশালতা বৈদ্য

গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া থানার নবম শ্রেণির ছাত্রী আশালতা বৈদ্য বেতারে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ শুনে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের জন্য অনুপ্রাণিত হয়। তিনি মাত্র ১৫ বছর বয়সে যুদ্ধে

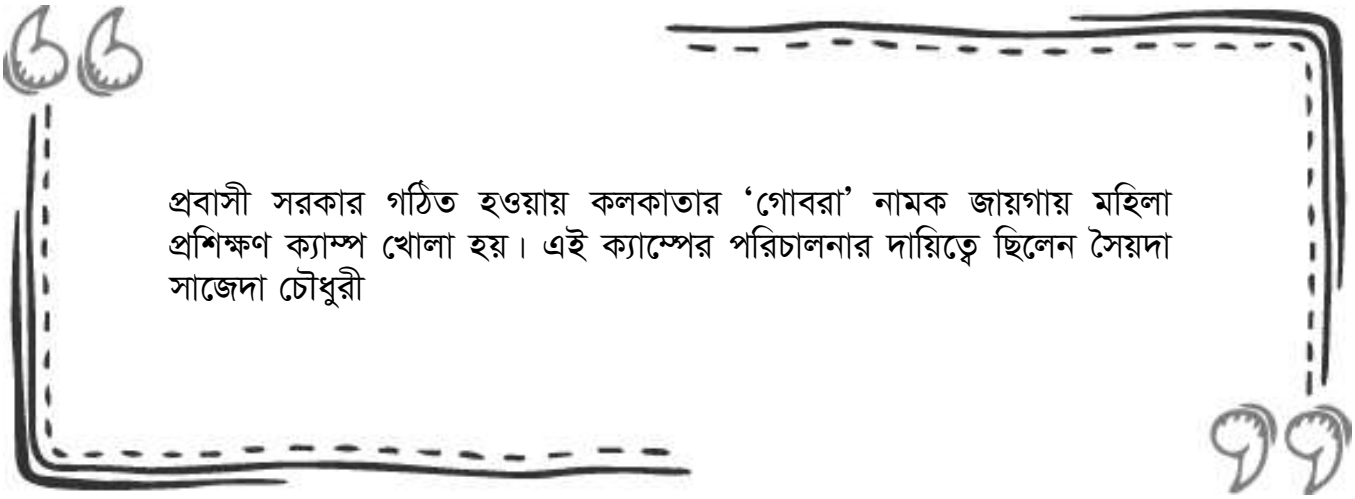

যান। মুক্তিযুদ্ধের সময় নেতৃত্ব দেন ৪৫জনের সশস্ত্র নারী গেরিলা দলকে। ৩৫০জন নারীকে নিয়ে গঠিত একটি মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের নেতৃত্বেও ছিলেন এই সাহসী নারী মুক্তিযোদ্ধা। আশালতা বৈদ্য প্রায় ২২টি যুদ্ধে অংশ নেন। এসব যুদ্ধে সহস্রাধিক রাজাকার ও ৫০ জন পাকসেনা নিহত হয়। তিনি শুধু পাকিস্তানি সেনাদের সঙ্গেই যুদ্ধ করেননি, সেই সঙ্গে করেছেন আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা ও শুশ্রূষা।

শোভা রাণী

বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বর্বরতা প্রতিরোধে গ্রামবাংলার যেসব কুলবধূ অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিলেন, সেসব দুর্জয় নারী সৈনিকদের একজন হলেন শোভা রাণী। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী তার স্বামীকে নির্মমভাবে হত্যা করে, মূলত এর প্রতিশোধ নিতে এবং দেশমাতৃকাকে শত্রুমুক্ত করার দৃঢ়পণ নিয়ে তিনি মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেন। কমান্ডার তারিকের পার্টিতে তিনি যোগ দেন। অনেকবার পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে মুখোমুখি যুদ্ধ করেছেন তিনি। কুড়িয়ানা গ্রামের এই সাহসী নারী, গৃহবধূ বহু হানাদার সৈন্য নিপাতের কৃতিত্বের দাবিদার।

করুণা বেগম

করুণা বেগমের বাড়ি ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের দোয়ারিকা শিকারপুর ফেরিঘাটের সঙ্গে অবস্থিত বাকুদিয়া গ্রামে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী তার স্বামীকে গুলি করে হত্যা করে, স্বামীর মৃত্যুর এক মাস পর তিনি মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেন। বরিশালের মুলাদী থানার কুতুববাহিনীতে তিনি আরও অনেকের সঙ্গে অস্ত্র প্রশিক্ষণ নেন। এ বাহিনীর ৫০ জন নারী যোদ্ধার তিনি কমান্ডার ছিলেন। তিনি মানসিক ভারসাম্যহীন সেজে ছদ্মবেশে শত্রুশিবিরে অপারেশন চালিয়েছেন। পাকিস্তানি বাহিনীর একটা শক্ত ঘাঁটি ছিল মাহিলাড়ায়। করুণা বেগমের নেতৃত্বে এই ঘাটিতে হামলা চালানো হয়।

বীথিকা বিশ্বাস

বরিশালের বীথিকা বিশ্বাস কলেজে পড়ার সময় থেকেই একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন। এপ্রিলের প্রথমদিকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী যখন গানবোট ও হেলিকপ্টারে বরিশালে পৌঁছায়, তখন থেকেই তিনি উদ্‌বিগ্ন হয়ে পড়েন এবং দুই ভাই-বোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ৯ নম্বর সেক্টর তৈরি হওয়ার আগেই মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। যখন তিনি ৯ নম্বর সেক্টরে অন্তর্ভুক্ত হলেন, তখন তিনি একজন প্রতিষ্ঠিত যোদ্ধা।

শিরিন বানু মিতিল ও আলেয়া বেগম

পুরুষের পোশাকে মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানিদের প্রতিরোধ করেছিলেন শিরিন বানু মিতিল ও আলেয়া বেগম। আলেয়া বেগম চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা থানা কমান্ডে ইউনিট কমান্ডার হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। একাধিক সম্মুখযুদ্ধে তাঁর ছিল উজ্জ্বল উপস্থিতি।

তাঁরা প্রত্যেকেই একেকটা উজ্জ্বল নক্ষত্র এবং আমাদের জন্য অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব।

মুক্তিযুদ্ধে নারীর অবদান

সহস্র নারী প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধ করেছেন, বিভিন্ন কৌশলে মুক্তিযোদ্ধাদের গোপনে সহায়তা করেছেন, খাদ্য ও আশ্রয় দিয়েছেন, আহতদের সেবা করেছেন, সংবাদ আদানপ্রদান করেছেন। বিভিন্ন ধাপে তারা ভূমিকা রেখেছেন। সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয়ে তারা গুরুত্বসহকারে অবদান রেখেছেন:

১. প্রত্যক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ: তৎকালীন সময়ে বাংলাদেশের নারীসমাজের পক্ষে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে অনেক বাধাবিপত্তি ছিল। এরপরও একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী প্রত্যক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। স্বাধীনতাযুদ্ধের প্রাক্‌কালে আওয়ামী লীগ নেত্রী সাজেদা চৌধুরীর ইন্দিরা রোডের বাড়িতে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে অনেক নারী এতে যোগ দেন। পরে প্রবাসী সরকার গঠিত হওয়ায় কলকাতার 'গোবরা' নামক জায়গায় মহিলা প্রশিক্ষণ ক্যাম্প খোলা হয়। এই ক্যাম্পের পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী। অস্ত্র চালনা, সিভিল ডিফেন্স ও নার্সিং শেখানো হতো এই ক্যাম্প থেকে। এতে প্রায় ৪০০ নারী যুদ্ধের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে যারা সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি, তারা আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবাদানসহ মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধের প্রস্তুতিমূলক কাজে সহায়তা করেছেন (খান ও অন্যান্য, ২০১৪)।

আগরতলা লেম্বুচোরা ক্যাম্পে মহিলা গেরিলা স্কোয়াডে আধুনিক অস্ত্র পরিচালনার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এখান থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আটজন নারী গেরিলা গণবাহিনীতে যোগদান করেন। এই দলের নেত্রী ছিলেন মিসেস ফোরকান বেগম। ফরিদপুর ও বরিশাল জেলায়

হেমায়েত বাহিনীতে ২৪ জন নারী মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। ৫নং সেক্টরের অধীনে ৫০ জন নারীকে নিয়ে মহিলা মুক্তিফৌজ গঠিত হয়।

রণাঙ্গনে অস্ত্র হাতে যারা যুদ্ধ করেছেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন–বরিশালের করুণা বেগম, শোভা রাণী, বীথিকা বিশ্বাস, শিশির কণা, সাহানা, শোভা, গোপালগঞ্জের আশালতা বৈদ্য, মেহেরুন নেছা, পটুয়াখালীর মনোয়ারা বেগম, যশোরের সালেহা বেগম, সুনামগঞ্জের পেয়ার চাঁদ, কুড়িগ্রামের তারামন বিবি প্রমুখ। মুক্তিযুদ্ধে নারী শক্তির অন্যতম নাম তারামন বিবি বীরপ্রতীক। আলমতাজ বেগম ছবি গেরিলা যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন।

প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে নারীদের অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য।

২. জেলায় জেলায় নারীসমাজের প্রতিবাদী সভা ও মিছিল: একাত্তরের উত্তাল মার্চের ৭ তারিখে তৎকালীন রেসকোর্স, বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যখন ঘোষণা দিলেন, 'আর একটি যদি গুলি চলে...প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল'। সেই সময়েও ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার কাজে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন নারীরা। ফলে দেখা যায়, ঢাকা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ফরিদপুর, খুলনা, ঈশ্বরদী, পাবনা, সিলেট, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, ময়মনসিংহ–সব জেলায় নারীসমাজের প্রতিবাদী সভা ও মিছিল হয়েছে। এ সময় তারা জেলায়, শহরে-শহরে, এলাকায়-এলাকায় সংগঠিত হয়ে কুচকাওয়াজ ও অস্ত্র চালনার ট্রেনিং শুরু করেন। এছাড়াও ৯ মার্চ বাড়িতে বাড়িতে কালো পতাকা উড়তে দেখা যায়। আর এই কাজে নারীসমাজ প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল (ইসলাম, ১৯৯৭)।

৩. মুক্তিযোদ্ধাদের তথ্য ও অস্ত্র সরবরাহ: মুক্তিযুদ্ধের সময় এমন অনেক নারী ছিলেন, যারা সামরিক প্রশিক্ষণের অভাবে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। কিন্তু দেশমাতৃকার জন্য তারা নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগী হিসাবে কাজ করেছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে গোলাবারুদ পৌঁছে দেওয়া, বাংকারে খাবার পৌঁছে দেওয়া, অস্ত্র পরিষ্কার করে দেওয়া প্রভৃতি কাজ করেন। ত্রিপুরার কাকন বিবি, পাবনার ভানু নেছা, গোপালগঞ্জের আমেনা বেগম, মোমেনা বেগম প্রমুখ যুদ্ধক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগী হিসাবে কাজ করেছেন। মুক্তিযুদ্ধে তথ্য প্রদানের কাজটি ছিল ঝুঁকিপূর্ণ। এ কাজটি অনেক নারীরা বেশ সফলতা ও দক্ষতার সঙ্গে পালন করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় গোপনে লিফলেট, পত্রিকা প্রভৃতি ছাপানো এবং এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার কাজেও নারীরা অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া রাজাকারদের অবস্থান, গোপন আস্তানার খবর, তাদের পরিকল্পনা, সৈন্যসংখ্যা এমনকি যুদ্ধসংক্রান্ত জরুরি কাগজপত্র ও ম্যাপ মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে আদানপ্রদানের ক্ষেত্রে নারীসমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৪. মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়দান ও অস্ত্রশস্ত্র সংরক্ষণ: গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনার কারণে মুক্তিযোদ্ধারা দেশের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়েছিল। নিরাপদ আশ্রয়, খাদ্য সংগ্রহ এবং অস্ত্র সংরক্ষণ করা তাদের জন্য ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এ সময় বাংলার নারীসমাজ বিশেষভাবে এগিয়ে আসে। নিজেদের জীবন বিপন্ন করে তখন নারীরা মুক্তিযোদ্ধাদের নিরাপদ আশ্রয়দানের ব্যবস্থা করে। অনেক ক্ষেত্রে নারীরা নিজেদের শোয়ার ঘর, গোয়াল ঘরে মুক্তিযোদ্ধাদের লুকিয়ে রেখে পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকার-আলবদরদের হাত থেকে রক্ষা করেন। আশ্রয়প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের খাবারের ব্যবস্থা করেছেন নারীরা। অস্ত্র সংরক্ষণের মতো গুরুদায়িত্বও নারীরা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পালন করেন। মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্রশস্ত্র গোপনে লুকিয়ে এবং যথাসময়ে তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কাজ করেছেন নারী। বাংলাদেশের মহিলা পরিষদের তৎকালীন সভানেত্রী সুফিয়া কামাল যুদ্ধের দীর্ঘ ৯ মাস পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নজরদারিতে নিজ বাড়িতেই ছিলেন। ওই অবস্থায়ও তিনি নানা কৌশলে মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করেছেন। আর এসব সময় তিনি তার দিনলিপিতে লিখেছেন, যা বর্তমানে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে।

৫. মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রূষা: আহত মুক্তিযোদ্ধাদের গোপনে চিকিৎসা ও সেবা দিয়ে সুস্থ করে তুলতে নারীরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে সীমান্ত অঞ্চল ও মুক্তাঞ্চলগুলোয় সেবা ক্যাম্প ও হাসপাতাল গড়ে তোলা হয়েছিল। এসব হাসপাতাল ও সেবা ক্যাম্পে নারীরাই নার্সিং ও সেবার কাজ করতেন। মুজিবনগর সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের তত্ত্বাবধানে কলকাতার পার্ক সার্কাসে বাংলাদেশ নার্সিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা হয়। এ কেন্দ্র থেকে প্রায় ৫০ জন নারী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে বিভিন্ন সেবা ক্যাম্পে নিয়োজিত হন। চিকিৎসা কাজে এদেশের কয়েকজন নারী চিকিৎসক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। কুমিল্লা সিএমএইচে কর্মরত ক্যাপ্টেন সিতারা বেগম মুক্তিযুদ্ধের ২নং সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত বিশ্রাগঞ্জ ফিল্ড হাসপাতালে যোগ দেন এবং বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বীরপ্রতীক খেতাব পান। ডা. মাখদুমা নার্গিস রত্না, ডা. নুরুন্নাহার জহুর, ডা. রেণুকণা বড়ুয়া, ডা. যোবায়দা প্রমুখ মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসাসেবা দান করেন। মেডিক্যাল কলেজে অধ্যয়নরত ছাত্রীরাও এ কাজে এগিয়ে এসেছিলেন।

৬. জনমত গঠন: দেশের অভ্যন্তরে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠনে অনেক স্বাধীনতাকামী নারী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যা, নারী নির্যাতন ও পাশবিকতার কথা প্রচার করে নারীসমাজ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গড়ে তোলে। দেশের অভ্যন্তরে এবং বাইরে বাঙালি নারীসমাজের প্রতিনিধিরা এবং বিভিন্ন মহিলা সংগঠন যেমন: বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, লন্ডনস্থ বাংলাদেশ মহিলা সমিতি, ভারতীয় মহিলা ফেডারেশন বিভিন্ন সভা-সেমিনার আয়োজন করে পাকিস্তান বাহিনীর গণহত্যা ও পাশবিকতার চিত্র তুলে ধরেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় মিসেস নুরজাহান মোর্শেদ এমএনএ পার্লামেন্টারি বোর্ডের সদস্য হিসাবে ভারতের বিভিন্ন স্থানের পার্লামেন্টের সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় করে পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বরতা সম্পর্কে অবহিত করেন। এ সময় বেগম বদরুন্নেছা আহমেদ এমএনএ, বেগম মতিয়া চৌধুরী, মহিলা পরিষদের সাধারণ সম্পাদিকা মালেকা বেগম, আয়েশা খানম, চট্টগ্রামের মুশতারী শফী, পাবনার শিরিন বানু মিতিল, সুনামগঞ্জের দীপালী চক্রবর্তী, নেত্রকোনার রেখা সাহা প্রমুখ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত সংগঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন (খান ও অন্যান্য, ২০১৪)।

৭. অনুপ্রেরণা দান: এদেশের নারীসমাজই মুক্তিযোদ্ধাদের দেশের হয়ে লড়াই করার উৎসাহ জুগিয়েছেন। মা হিসাবে, বোন হিসাবে, স্ত্রী হিসাবে আত্মত্যাগ ও উৎসাহ না জোগালে এ দেশের জন্য লাখ লাখ লোক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করত কি না সন্দেহ। অনেক মা তার ছেলেকে যুদ্ধে পাঠিয়েছেন। শহিদজননী জাহানারা ইমাম তার বড়ো ছেলে রুমিকে মুক্তিযুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন। যুদ্ধে রুমি শহিদ হয়েছিলেন, যা অনুপ্রেরণার সবচেয়ে বড়ো দৃষ্টান্ত। ১৯৬৯-এর ২০ জানুয়ারি পুলিশের গুলিতে শহিদ হন আসাদুজ্জামান। এরপর শিবপুরের গ্রামের বাড়ি থেকে আসাদের মা ছাত্রনেতাদের কাছে বাণী পাঠালেন, "আমার আসাদের মৃত্যু হয়নি। আমার আসাদ বলত, 'মা, আগামী ১০ বছরের মধ্যে এই মাতৃভূমি নতুন জীবন পাবে।' আমার আসাদের এই স্বপ্ন তোমরা সার্থক করো" (দৈনিক আজাদ, ২৬ জানুয়ারি ১৯৭০)। আসাদের মায়ের এই বাণীর মধ্য দিয়ে তার যে পরিচয় আমাদের কাছে উন্মোচিত হয়, তা অবশ্যই একজন মুক্তিযোদ্ধার।

৮. সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা: সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দেশের জন্য আত্মোৎসর্গ হতে অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ জোগানোর কাজে বাংলাদেশের নারীসমাজ সবার আগে এগিয়ে আসে। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, মুক্তিসংগ্রামী শিল্পী সংস্থাসহ বিভিন্ন সংগঠনের বহু নারী শিল্পী মুক্তিকামী জনতাকে উদ্বুদ্ধ করতে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নেন। বেতারে দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন, নাটক, কথিকা ও সংবাদ পাঠে দেশের নামকরা অনেক মহিলা শিল্পী, নাট্যকর্মী ও সংবাদ পাঠিকা অংশগ্রহণ করেছেন। সংবাদ পাঠিকার মধ্যে পারভিন হোসেন ও জারিন আহমেদ; নাট্যশিল্পীদের মধ্যে সুমিতা দেবী, মাধুরী চট্টোপাধ্যায়, লায়লা হাসান ও করুণা রায়; সংগীতশিল্পীদের মধ্যে সন্‌জীদা খাতুন, কল্যাণী ঘোষ, শেফালী ঘোষ, নমিতা ঘোষ ও ঝুমু খান এবং কথিকা পাঠিকা হিসাবে বেগম মুশতারী শফী, আইভি রহমান, ডা. নুরুন্নাহার জহুর প্রমুখ অন্যতম। এ সময় মুক্তিযুদ্ধের তহবিল সংগ্রহের জন্যও অনেক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়েছে। এক্ষেত্রেও নারীরা পালন করেছেন অগ্রণী ভূমিকা। সন্‌জীদা খাতুনের নেতৃত্বাধীন মুক্তিসংগ্রামী শিল্পী সংস্থার নারীরা শরণার্থীশিবিরে সংগীত পরিবেশন করে শরণার্থীদের উজ্জীবিত করতেন। গণমুক্তি শিল্পী সংস্থার নারীরাও মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে ক্যাম্পে গিয়ে গান পরিবেশন করে মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখেন।

রক্তঝরা একাত্তরে নারীদের এই সক্রিয় কর্মকাণ্ডই ছিল তাদের মুক্তিযুদ্ধ।

সীমাবদ্ধতার জায়গা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নারীসমাজের ত্যাগ ও অবদানের কথা ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমরা যে বিজয় পেয়েছি, এ বিজয়ের পথ নারীরা রচনা করেছেন তাদের রক্ত দিয়ে, অশ্রু দিয়ে, পুত্র দিয়ে, স্বামী দিয়ে, পিতা-ভাইকে বলি দিয়ে; কিন্তু তাদের আত্মোৎসর্গের কথা সবার কাছে পৌঁছাতে এবং তাদের সর্বোচ্চ ত্যাগের স্বীকৃতি পেতে সময় লেগেছে বা লাগছে। সুফিয়া কামাল বলেছেন, 'মেয়েরা মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছেন, তারা সংগ্রাম করেছেন। তারা সাহসের সঙ্গে মোকাবিলা করেছেন শত্রুকে। কিন্তু যুদ্ধের পর কেউ তাদের ডাকেনি। এটা তাদের দুঃখ ও ক্ষোভের বিষয়' (বেগম, ২০০০)। নারী মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে খেতাবপ্রাপ্ত মাত্র দুজন। তাঁদের মধ্যে একজন তারামন বিবি, তাঁর খেতাবপ্রাপ্তির কথা জেনেছেন প্রায় ৩০ বছর পর। তবে স্বাধীনতার দীর্ঘ সময় পর মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে প্রত্যক্ষ অবদানের স্বীকৃতি পেতে শুরু করেছেন নারীরা। প্রকাশিত হচ্ছে নারী মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে বিভিন্ন বই। সেখানে তাঁদের মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোর ভয়ংকর অভিজ্ঞতা আমরা শুনতে পাই।

একুশ শতকের একটা জোরালো দাবি–যেসব নারী মুক্তিযুদ্ধে বীরবিক্রমে যুদ্ধ করেছেন প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে, তাঁদেরকে মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে দৃশ্যমান করে তোলা হোক।

সামগ্রিকভাবে বলতে হয়, নারী সম্মুখসমরে ছিল, ছিল নেপথ্যের শক্তি-সাহসে। মুক্তিযুদ্ধে নারীর ভূমিকা ছিল ঈর্ষণীয়, যা যুদ্ধজয়ের ইতিহাসে গৌরবোজ্জ্বল হয়ে আছে। মুক্তিযোদ্ধা তারামন বিবি মাছরাঙা টেলিভিশনে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'আমি যদি যুদ্ধে গিয়ে মারাও যাই, আমার মা বলতে পারবে আমার মেয়ে যুদ্ধে গিয়ে মারা গেছে।' তিনিসহ সব মহীয়সী নারী যোদ্ধাকে এমন দৃঢ়বক্তব্য, তাঁদের সাহসিকতা সংগ্রামী নারীসমাজে আজও প্রেরণার উৎস, যা আমাদের যুগ যুগ দেশকে রক্ষার অনুপ্রেরণা জোগাবে। তাঁদের অভিজ্ঞতার বিবরণের মধ্যে আমরা শুনতে পাই সাহসী প্রতিরোধের পদধ্বনি, যা

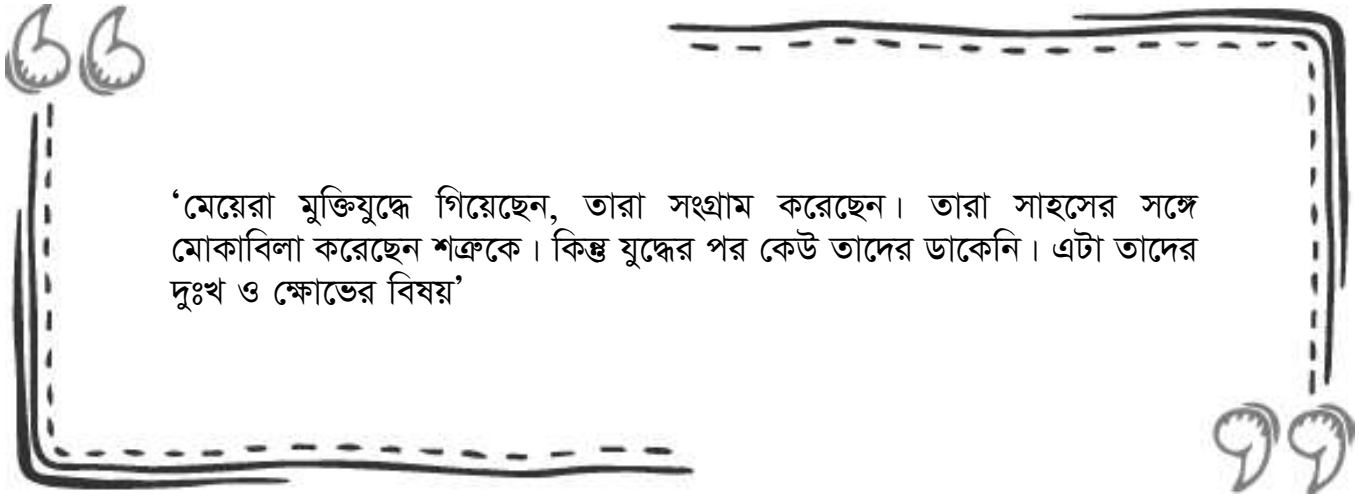

থেকে এই সত্য আরও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে স্পষ্ট হয় যে, নারীসমাজের সাহায্য ছাড়া বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চালানো সম্ভব ছিল না। কৃতজ্ঞচিত্তে বাঙালি কখনো ভুলবে না তাঁদের আত্মোৎসর্গের এ অমর স্মৃতি।

তথ্যসূত্র

১. ইসলাম, জহিরুল (১৯৯৭), একাত্তরের গেরিলা, ঢাকা, প্রকাশক মিলন নাথ।

২. রহমান, মতিউর, (২০১৩) একাত্তরের বীরযোদ্ধা: খেতাব পাওয়া মুক্তিযোদ্ধার বীরত্বগাথা, দ্বিতীয় খণ্ড, ঢাকা, প্রথমা প্রকাশন।

৩. খান ড. একেএম শওকত আলী ও অন্যান্য (২০১৪), স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস, ঢাকা, দিকদর্শন প্রকাশনী।

৪. বেগম, মালেকা, মুক্তিযোদ্ধা: প্রেক্ষিত নারী, ২০০০, নিরীক্ষা, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)।

লেখক: সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থী, গবেষক

আমাদের বিজ্ঞাপন কি বলছে মুক্তিযুদ্ধের কথা

আকিল উজ জামান খান

'বাবু বেঁচে থাকলে ওর বয়স হতো পঁয়তাল্লিশ। ওই বয়সের কাউকে দেখলে আমি তাকিয়ে থাকি। বাবুকে খুঁজি। ওর চেহারা কেমন হতো? ও সিঁথি কোনদিকে করত? ওর কি গোঁফ থাকত? ওর কি বিয়ে হতো? বাবুর বাবুটা কেমন হতো...!' টিভির পর্দায় ভেসে ওঠা বিজ্ঞাপনের দৃশ্য আর বর্ণনা দর্শকমাত্রই ফিরিয়ে নিয়ে গেছে একাত্তরের স্বাধীনতাসংগ্রামের সেই উত্তাল দিনগুলোয়। একটি স্বাধীন দেশের আশায় সৃষ্টি সুখের উল্লাসে অকাতরে প্রাণ দিয়েছে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ। কিছু প্রতিশ্রুতি আর অঙ্গীকারকে সামনে রেখে প্রাণের বিনিময়ে অর্জন করেছে স্বাধীন বাংলাদেশ। বিজ্ঞাপনটি মনে করিয়ে দিয়েছে কতটা মূল্য আমরা দিয়েছি একাত্তরে আমাদের মুক্তিসংগ্রামে।

বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য যদি হয় ভোক্তার আবেগ স্পর্শ করে পণ্যের প্রচার, তাহলে বলাই যায়–প্রচারের আগেই বিজ্ঞাপনটির সাফল্য নিশ্চিত ছিল। কারণ যারা বাংলাদেশে বিশ্বাস করেন, দেশকে ভালোবাসেন; তাদের কাছে এখনো সর্বোচ্চ আবেগের জায়গা মুক্তিযুদ্ধ। মনে রাখতে হবে–মূলধারার বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয় পণ্যের বাজারজাতকরণের স্বার্থে। বিনিয়োগকারী বিজ্ঞাপনে বিনিয়োগ করেন ব্যাবসায়িক বিবেচনায়। সামাজিক ও ঐতিহাসিক দায়বদ্ধতার স্থান এখানে কোথায়, সেটি ভিন্ন প্রসঙ্গ। সে বিবেচনায় না গিয়েও মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে প্রচারিত বিজ্ঞাপনগুলোর বাণিজ্যিক সাফল্য বিচারে বলা যায়, বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু হিসাবে মুক্তিযুদ্ধ উপেক্ষা করার নয়। আর সে সাফল্য সামনে রেখেও একটি প্রশ্নের সম্মুখে আজ আমাদের দাঁড়াতে হবে–গণমাধ্যমের সবচেয়ে শক্তিশালী অংশ বিজ্ঞাপনে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ কতটা এসেছে বা এলেও তা কীভাবে? মুক্তিযুদ্ধের যে প্রতিশ্রুতি, অঙ্গীকার ছিল–সেকথা কতটা বলছে আমাদের বিজ্ঞাপন?

পণ্যের বিজ্ঞাপনের ইতিহাস সুপ্রাচীন, এককথায় সভ্যতার সমান্তরাল। প্রাচীন মিশরেও প্যাপিরাসে ছেপে বিজ্ঞাপনের প্রচলন ছিল। চর্তুদশ শতকে জার্মানিতে গুটেনবার্গ ও ইংল্যান্ডে ক্যাক্সটনের ছাপাখানা বিজ্ঞাপন শিল্পে যোগ করে নতুন মাত্রা। ১৪৭৭-এ ক্যাক্সটনের ছাপা 'দ্য পাইস অব সলিসবুরিকে' বলা হয় ইংল্যান্ডে ছাপা প্রথম বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপনশিল্পকে নতুন রূপ দেন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে ফ্রান্সে জুলেস সেরেত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থমাস জে ব্যারেট ও অ্যালবার্ট ল্যাস্কার।

টেলিভিশন আবিষ্কারের পর আরেকবার বদলে যায় বিজ্ঞাপনজগতের চালচিত্র। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৪১ সালের ১ জুলাই 'বুলোভা ওয়াচ'-এর বিজ্ঞাপনটি টেলিভিশনের ইতিহাসে প্রচারিত প্রথম বিজ্ঞাপন। আর যুক্তরাজ্যে প্রথম ১৯৫৫ সালে গিবস এসআর টুথপেস্টের, আইটিভিতে। ততদিনে আমাদের এ অঞ্চলেও বিজ্ঞাপন-শিল্প প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেতে শুরু করেছে। ঢাকাকেন্দ্রিক প্রথম বিজ্ঞাপনী সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন গুলাম মহিউদ্দিন ১৯৪৮ সালে। এছাড়াও স্টার অ্যাডভার্টাইজিং বা জহির রায়হানের নবংকুরসহ আরও কিছু সংস্থার হাত ধরে এগিয়েছে মুক্তিযুদ্ধপূর্ব এ অঞ্চলের বিজ্ঞাপন-শিল্প।

রাজনৈতিক প্রচার-প্রচারণা বিজ্ঞাপনে রূপলাভ করে অ্যালবার্ট ল্যাস্করের হাত ধরে। সে ছবিটি আমরা দেখেছি মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন। সেসময় প্রবাসী বাংলাদেশিরা নানাভাবে স্বাধীন বাংলাদেশের পক্ষে পোস্টার-লিফলেট কিংবা প্রবাসী সরকারের তহবিল গঠনের জন্য বিজ্ঞাপনী প্রচার চালিয়েছেন। পিছিয়ে ছিলেন না আমাদের মুক্তিযুদ্ধের মহান সুহৃদ বিদেশি বন্ধুরাও। এখানে জর্জ হ্যারিসন, রবি শংকর আয়োজিত 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ'-এর বিজ্ঞাপনী প্রচার আমাদের স্বাধীনতার পক্ষে বিশ্ব জনমত গঠনে যে ভূমিকা রেখেছে, তা স্মরণ করতে হয় কৃতজ্ঞতার সঙ্গে।

অপরদিকে নিশ্চুপ ছিল না হানাদার পাকিস্তানিরাও। তাদের গণমাধ্যম ছেয়ে যায় মুক্তিযুদ্ধবিরোধী বিজ্ঞাপনে। ধর্মের অপব্যাখ্যা করে তথাকথিত 'জিহাদে' অংশগ্রহণ আর জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে অনুদানের আহ্বান জানিয়ে মেতে ওঠে বিজ্ঞাপনী প্রচারণায়। মুক্তিযুদ্ধবিরোধী বিজ্ঞাপন প্রচার করে পাকট্রাক, রিজভী ব্রাদার্স, স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক, আফতাব কামার শফিক অ্যান্ড ব্রাদার্স, মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড, ইউনাইটেড ব্যাংকের মতো বহু প্রতিষ্ঠান। তাদের এই প্রচার-প্রচারণা এমনকি ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। সঙ্গে পাকিস্তান সরকারের পরিকল্পিত প্রোপাগান্ডা তো ছিলই।

যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে ধ্বংসপ্রাপ্ত অন্যান্য খাতের মতোই বিজ্ঞাপনশিল্পও পুনর্গঠিত যাত্রা শুরু করে। শুরুটা রশিদ আহমেদের কারুকৃতের হাত ধরে। সঙ্গে যোগ হয় কবি ফজল শাহাবুদ্দিনের নান্দনিক, ইস্ট এশিয়াটিক, অ্যাডকমের মতো প্রতিষ্ঠান। এছাড়া সরকারও কিছু বিজ্ঞাপনী সংস্থা অধিগ্রহণ করে, যার মধ্যে কোহিনুর অন্যতম। সেসময় ইলেকট্রনিক মাধ্যমের এতটা প্রসার না থাকায় বিজ্ঞাপন মূলত ছিল পত্রপত্রিকা, লিফলেট, পোস্টার, নিয়ন সাইননির্ভর। শিল্পপ্রতিষ্ঠান তেমনভাবে গড়ে না ওঠায় এবং ব্যাবসাবাণিজ্যের সীমাবদ্ধতার কারণে বিজ্ঞাপনের তেমন প্রসারও ঘটেনি।

মুক্তিযুদ্ধ হয়ে ওঠে দিবসভিত্তিক বিজ্ঞাপনের বিষয়। বিশেষ দিবস যেমন: স্বাধীনতা বা বিজয় দিবসে মুক্তিযুদ্ধকে স্মরণ করে বিজ্ঞাপন প্রচারের যে ধারা শুরু হয়, এখনো আমরা সেখান থেকে কতটা বেরিয়ে আসতে পেরেছি–সে প্রশ্ন করাই যায়। পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে হত্যার পর শুরু হয় ইতিহাস বিকৃতির নতুন অধ্যায়। বলাই বাহুল্য, বিজ্ঞাপনের মতো একটি শক্তিশালী মাধ্যম রেহাই পায়নি ইতিহাস বিকৃতির খলনায়কদের হাত থেকে। মিথ্যা সংবাদে তিতিবিরক্ত Thomas Jefferson-এর বিখ্যাত উক্তি 'The most truthful part of a newspaper is the advertisement'-কে প্রহসনে পরিণত করে, সরকারি বিশেষ দিবসগুলোর ক্রোড়পত্র যেন মেতে ওঠে স্বাধীনতার নতুন ঘোষক প্রতিষ্ঠায়। সঙ্গে যোগ দেয় কিছু বেসরকারি প্রতিষ্ঠান।

ইতিহাসের সেই অন্ধকার অধ্যায়ে বিজ্ঞাপনে মুক্তিযুদ্ধ বলতে এসেছে কিছু খণ্ডিত চিত্র। এও সত্য যে, কোনো ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে রাষ্ট্রশক্তির প্রভাবের বাইরে যাওয়া তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোয় দুষ্কর। এর মাঝেই পরিবর্তিত সময়ের সঙ্গে বদলে গেছে বিজ্ঞাপনজগতের চিত্র। প্রযুক্তি এবং নতুন প্রজন্মের একঝাঁক নতুন নির্মাতা এই পরিবর্তনের নিয়ামক শক্তি। পত্রপত্রিকা, টেলিভিশন, রেডিয়ো পেরিয়ে আমরা প্রবেশ করেছি ইন্টারনেট যুগে। অন্যদিকে গলির মোড়ে পুরোনো স্টিলবোর্ড বা নিয়ন সাইনের বদলে এসেছে ডিজিটাল বোর্ড। সড়কের পাশাপাশি বিজ্ঞাপন ঠাঁই করে নিয়েছে বাসাবাড়ির ছাদে। একাধিক রেডিয়ো, টিভি চ্যানেল, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, অনলাইন গণমাধ্যমে বিকশিত হয়েছে বিজ্ঞাপন বাজার। ব্যাবসাবাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে পরিধি। এই শিল্পের বাজার ছাড়িয়ে গেছে হাজার কোটি টাকা। সরকারের পাশাপাশি পিছিয়ে নেই বেসরকারি খাত।

বহুজাতিক বিজ্ঞাপনী সংস্থাগুলো আমাদের বাজারে পা রেখেছে সেই আশির দশকে লিভার ব্রাদার্সের হাত ধরে। বিকাশমান বিজ্ঞাপন-শিল্পের বর্তমান পরিস্থিতি আশাজাগানিয়া হলেও এ প্রশ্ন উঠতেই পারে–এখানে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ কতটা প্রতিফলিত। অন্তত মূলধারার বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনে? সরকারি বিজ্ঞাপনে মুক্তিযুদ্ধ এখনো বিশেষ দিবসভিত্তিক। ইতিহাস বিকৃতির নায়ক বা তার দোসররা ক্ষমতায় থাকতে তাদের কাছে খুব বেশি প্রত্যাশা ছিল না। তাদের ছত্রছায়ায় বেড়ে ওঠা সুবিধাভোগী বৃহৎ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলো প্রকৃত অর্থে বিজ্ঞাপনে মুক্তিযুদ্ধের কথা বলবে, তাও দুরাশা। কিন্তু আজ যখন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষশক্তি ক্ষমতায়, তখন এটুকু আশা কি আমরা করতে পারি না যে প্রতিটি সরকারি বিজ্ঞাপনে 'আসুন মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ি' স্লোগানটি যোগ হবে?

সরকারের গতানুগতিক ধারার বিজ্ঞাপন ছেড়ে আসি বেসরকারি বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন প্রসঙ্গে। মূলধারার বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনে আমরা মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কিছু সুনির্মিত বিজ্ঞাপন দেখেছি বিগত কিছুদিনে। তুলনামূলক বিচারে বলা যায়, হাতেগোনা কয়েকটি বিজ্ঞাপন বাদে এক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধের উপস্থিতি আশাপ্রদ নয়। কেন এই দৈন্য? যে মুক্তিযুদ্ধের ওপর দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ, বিজ্ঞাপন নির্মাতার কাছে এর চেয়ে কাম্য বিষয় আর কী হতে পারত? একটি উত্তর হতে পারে–ইতিহাস বিকৃতি বা খণ্ডিত ইতিহাস এখানে প্রভাব ফেলেছে। এদেশেরই একশ্রেণির মানুষ আজ মুক্তিযুদ্ধকে করে তুলেছে বিতর্কিত। বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলো সে বিবেচনায় বিষয়টি এড়িয়ে চলে। বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে দ্বিতীয় প্রশ্নটি সামনে আনলে। মহান শহিদদের ত্যাগের প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান রেখেই বলছি–মুক্তিযুদ্ধ কি কেবল আত্মত্যাগেই সীমাবদ্ধ? সে আত্মত্যাগের পেছনে কিছু অর্জনের প্রত্যাশা কি ছিল না?

অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক একটি রাষ্ট্র নির্মাণ–যেখানে থাকবে আইনের শাসন, সবার জন্য শিক্ষা, মানুষে মানুষে থাকবে না প্রভেদ–তা কি মুক্তিযুদ্ধের অঙ্গীকার ছিল না? আজ সরকারি-বেসরকারি উভয় বিজ্ঞাপনে তাকিয়ে দেখুন, এখনো বিষয়টি

'বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলিতে' সীমাবদ্ধ। কেন আমরা বিজ্ঞাপনে মুক্তিযুদ্ধের সেই অঙ্গীকারের ছবি দেখি না? এখানেই বিজ্ঞাপনদাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর মনস্তাত্ত্বিক বিষয়টি সামনে আসে। তারা বাজার জরিপ করেন। এখানে জাতীয় নির্বাচনের একটি চিত্র হয়তো তারা বিবেচনায় নেন। এখনো ইতিহাস বিকৃতির খলনায়ক ও স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির রয়েছে বড়ো একটি ভোট ব্যাংক।

কাজেই মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস ছায়ায় রেখে 'বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি'তে সীমাবদ্ধ থেকে বিজ্ঞাপনদাতারা যেমন ভোক্তার আবেগ ব্যবহার করেন বাণিজ্যিক স্বার্থে, তেমনই সামাজিক ও ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনের আত্মতুষ্টিতে ভোগেন। আরেকটি বিষয়–যে বা যারাই ক্ষমতায় থাকুক, মুক্তিযুদ্ধের অঙ্গীকার ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, আইনের শাসন, সবার জন্য একমুখী শিক্ষা, মানবাধিকার, সামাজিক সাম্য প্রভৃতির প্রতি তাদের আস্থা এখনো প্রশ্নাতীত নয়। সে বিবেচনায় বিজ্ঞাপনদাতা ও নির্মাতারা হয়তো বিতর্কিত হতে চান না, পড়তে চান না কোনো শ্রেণির রোষানলে। যদি সেটাই সত্য ধরে নিই, ভাবতে কষ্ট হয় মুক্তিযুদ্ধের ওপর দাঁড়ানো বাংলাদেশে এটা সম্ভব!

সময় বদলেছে। নতুন প্রজন্মের বিজ্ঞাপন নির্মাতাদের কাছে ইতিহাসের দাবি–আজ বিজ্ঞাপনে মুক্তিযুদ্ধের যথাযথ প্রতিফলন এবং তা কেবল 'বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি'তে সীমাবদ্ধ থাকা যথেষ্ট নয়। ধর্মনিরপেক্ষ এক অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র ছিল মুক্তিযুদ্ধের অঙ্গীকার। আমরা দেখতে চাই–জেগে ওঠা মৌলবাদী দানবের বিরুদ্ধে কথা বলছে আমাদের বিজ্ঞাপন। বিষয়টি হতে পারে এমন–রাজধানীসহ প্রতিটি শহরের মোড়ে উড়বে একটি বেলুন। যার বিজ্ঞাপনের ভাষা হবে: 'ধর্মনিরপেক্ষ, অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ আমাদের মুক্তিযুদ্ধের অঙ্গীকার। আসুন সে অঙ্গীকার পূরণে সবাই মিলে প্রতিরোধ করি মৌলবাদ।' যে বিজ্ঞাপন ছেয়ে যাবে রেডিয়ো, টিভি, অনলাইন, বিলবোর্ড, পোস্টার, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ সবখানে।

এভাবেই আমাদের বিজ্ঞাপনকে বলতে হবে মুক্তিযুদ্ধের প্রতিটি অঙ্গীকারের কথা। এভাবেই সম্ভব মহান মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ হারানো শহিদদের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা নিবেদন। নতুন প্রজন্মের বিজ্ঞাপন নির্মাতাদের কাছে এটা আজ ইতিহাসের দাবি, মুক্তিযুদ্ধের কাছে এ তাদের দায়।

লেখক: সহ-সম্পাদক, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

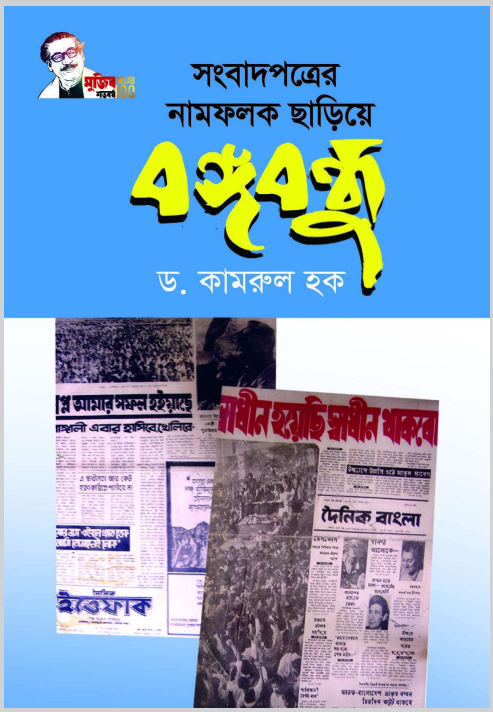

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

৭ মার্চের ভাষণ: সংবাদপত্রের বিশ্লেষণ

জাফর ওয়াজেদ

১৯৭১ সালের ৭ মার্চের জনসভার প্রচার-প্রচারণা আগে থেকেই জোরেশোরে শুরু হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু রেসকোর্স ময়দানে ভাষণ দেবেন এবং গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখবেন–এ বিষয়টি সবার মুখে মুখে। দেশবাসী এই ভাষণের জন্য অপেক্ষা করছিল। দেশবাসী আশা করেছিল বঙ্গবন্ধু এ ভাষণে গুরুত্বপূর্ণ নীতিনির্ধারণী সিদ্ধান্ত দেবেন। যে সিদ্ধান্তে বাঙালি একটি স্বাধীন জাতি হিসাবে স্বাধীন সত্তা লাভ করবে। এর আগে পাকিস্তানের সামরিক জান্তা শাসক ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালের ১ মার্চ পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করে। তখন সারা দেশ গর্জে ওঠে। এই গর্জে ওঠাটা কেউ আলোড়িত করেছে বলে নয়, স্বতঃস্ফূর্তভাবে জনগণের মাঝে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছিল এবং ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশে জনগণ ঘর থেকে রাজপথে নেমে আসে। উত্তাল সেই সময়ে ছাত্র সংগঠনগুলো সামরিক প্রশিক্ষণ নেওয়া শুরু করে দিয়েছে। তারা রাজপথে মিছিল করছে। সারা দেশে একটা উত্তাল অবস্থা। এর পাশাপাশি ক্রমেই পেশাজীবীরাও রাস্তায় নেমে আসেন। সেনাবাহিনীর সাবেকদের একটি সংগঠন, তারাও রাস্তায় এসে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে অবস্থান নিয়েছে এবং বঙ্গবন্ধুর পক্ষে ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়ার দাবি তুলতে থাকে। পরবর্তীকালে দেখা গেল, পূর্ব পাকিস্তান পুলিশ এবং পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস (ইপিআর) তারাও শেখ মুজিবের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছে এবং শেখ মুজিবের নির্দেশকে বাস্তবায়নে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এমন পরিস্থিতিতে সংবাদপত্রগুলোর বাঙালি জাতীয়তাবাদের আন্দোলনবিরোধী অবস্থান নেওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না। এসব সংবাদপত্রের বেশির ভাগই বাঙালির আন্দোলন-সংগ্রামের মূলস্রোতে মিশে যায়।

১ মার্চের পরেই আমাদের সংবাদপত্রগুলোর অবস্থানগত পরিবর্তন আসে। প্রকৃতপক্ষে কোনো কোনো সংবাদমাধ্যমে এই পরিবর্তনটার শুরু ১৯৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিপুল বিজয়ের পর থেকেই। তখনকার সংবাদপত্রগুলোয় বাঙালি জাতীয়তাবাদ, বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলন প্রভৃতি বিষয় পত্রিকার পাতায় বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ছাপা হতো। তখন সরকারের ট্রাস্টের পত্রিকা দৈনিক পাকিস্তান, মর্নিং নিউজের পলিসিতেও বেশ পরিবর্তন এসেছে। দৈনিক পাকিস্তান সরকারের ট্রাস্টের পত্রিকা হলেও তারা বাঙালির অধিকার আন্দোলনের সংবাদগুলো যথাযথভাবেই ছেপেছে। তবে মর্নিং নিউজ কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিরূপ ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৬৯ সালে মর্নিং নিউজের কার্যালয় জনতা একবার পুড়িয়ে দিয়েছিল। তবে দৈনিক পাকিস্তানের ক্ষেত্রে তা হয়নি। তারা জনগণের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিষয়গুলোকে সামনে এনেছে। পাকিস্তান সরকারের বক্তব্যও ছেপেছে আবার বাঙালির অধিকারের বিষয়ে খবরও ছেপেছে। আবার পাকিস্তানি প্রভাবশালী ব্যক্তিদের পত্রিকা পূর্বদেশ, অবজারভার প্রভৃতি পত্রিকাও বাঙালির জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে তখন থেকেই সমর্থন করা শুরু করেছে। বিশেষত বাংলা সংবাদপত্র পূর্বদেশ প্রচুর ফিচার নিউজ করেছে। তুলনায় মুজাফফর ন্যাপের পত্রিকা বা ওয়ালী ন্যাপের কাগজ দৈনিক সংবাদের অবস্থান শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে ছিল না। সেসময় আন্দোলন-সংগ্রামের অনেক গুরুত্বপূর্ণ খবর সংবাদ সংবাদপত্রটি ছাপেনি। হয়তো মূল কারণ ছিল, সংবাদ তখন মুজাফফর ন্যাপ-ওয়ালী ন্যাপের মুখপত্র। ১৯৭০-এর নির্বাচনেও তারা আওয়ামী লীগের বিরোধিতা করেছিল। বহু জায়গায় শেখ মুজিবুর রহমানের সমালোচনা করেছিল। অবশ্য ৭ মার্চের পর সংবাদের গুণগত পরিবর্তন আসে বাঙালির মুক্তি আন্দোলনে। কারণ, ইতোমধ্যে ওয়ালী ন্যাপ শেখ মুজিবের আন্দোলন-সংগ্রামের প্রতি সমর্থন দেয়। শুধু তাই নয়, যেসব পত্রিকা ফেব্রুয়ারিতেও একটু ধীরগতিতে এগোচ্ছিল, তারাও ১ মার্চে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করা হলে সংবাদপত্রগুলোর গুণগত পরিবর্তন দেখা যায়। সংবাদপত্রই তখন মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। বিশেষ করে ২ মার্চের পর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এবং অবাঙালিরা বিভিন্ন স্থানে বাঙালির ওপর হামলা চালায়। ১ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত বহু বাঙালিকে হত্যা করা হয়। ঢাকা, সৈয়দপুর, চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন জায়গায় চলে এই হত্যাকাণ্ড। বিক্ষোভ মিছিলে আর্মিরা গুলি চালিয়েছে, বহু মানুষ মারা গেছে। বঙ্গবন্ধু তাঁর ৭ মার্চের ভাষণে সেসব শহিদের কথা বলেছিলেন।

৭ মার্চের ভাষণের আগে সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনের ভাষাও পালটে যায়। ৩ ও ৪ মার্চ থেকে পত্রিকার পাতায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসহ বিমা ও ব্যাংকের যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হতো, সে বিজ্ঞাপনের ভাষায় বাঙালির স্বাধিকার, বাঙালির অধিকার, বাঙালির জাতীয়তাবাদ, শেখ মুজিব–এসব প্রসঙ্গ চলে আসে। এমনকি রবীন্দ্রনাথের কবিতাও বিজ্ঞাপনে উদ্ধৃত হতে দেখা যায়। 'বাংলার মাটি, বাংলার জল পুণ্য হউক'–এই কবিতা দিয়েও অনেক বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে। বিজ্ঞাপনের পাশাপাশি বাংলাদেশে পাকিস্তান অরিয়েন্টেড প্রতিষ্ঠানগুলোর যেসব শাখা রয়েছে, তারাও তাদের বিজ্ঞাপনে বাঙালির জাতীয়তাবাদের পক্ষে অবস্থান নেয়। সংবাদপত্রগুলোর সম্পাদকীয় ভাষাও পালটে যায়। সম্পাদকীয়তে বাঙালির করণীয়, শেখ মুজিবের নির্দেশ, শেখ মুজিবের করণীয় প্রভৃতি বিষয় উঠে আসে। একই সঙ্গে আওয়ামী লীগের নির্দেশনাবলি গুরুত্বের সঙ্গে প্রথম পৃষ্ঠায়ই ছাপা হয়েছে। আবার যারা উপসম্পাদকীয় লিখেছেন, তারা পাকিস্তানের সামরিক জান্তা শাসকের বিরোধিতা করেছেন। কী কারণে এবং কেন পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করা হলো, সে বিষয়ে লেখালেখি হয়েছে। যে আজাদ পত্রিকা মুসলিম লীগের পত্রিকা হিসাবে চিহ্নিত ছিল এবং বিভিন্ন সময়ে রক্ষণশীল ভূমিকা পালন করেছে, সেই আজাদ পত্রিকাও ১৯৭১ সালে বাঙালির স্বাধিকারের পক্ষে অবস্থান নেয়। সাবেক গভর্নর মোনেম খানের পত্রিকা 'পয়গাম' ১৯৬৯ সাল থেকেই চরিত্র পালটাচ্ছিল। ১৯৭১-এর ওই সময়টায় পয়গাম পত্রিকার চেহারাও পালটে যায়। জামায়াতে ইসলামীর মুখপত্র 'সংগ্রাম'-এ জামায়াতে ইসলামীর বিবৃতিগুলো বড়ো করে ছাপা হতো। শেখ মুজিবের সংবাদও থাকত, আবার পাকিস্তানি জান্তা শাসকদের সংবাদও থাকত। তারা একটা ব্যালেন্স করার চেষ্টা করত।

৭ মার্চের জনসভার বিষয়ে সব সংবাদপত্র ও ঢাকা বেতার থেকে আগেই ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল। সেই খবরগুলোয় বলা হয়েছিল, আগামীকাল ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিকাল ৩টায় রেসকোর্স ময়দান থেকে ভাষণ দেবেন, সেই ভাষণ রেডিয়োতে সরাসরি সম্প্রচার করা হবে। সারা দেশের মানুষ ভাষণ শোনার জন্য উদ্‌গ্রীব। প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষজন যারা সমাবেশে সরাসরি ভাষণ শুনতে আসতে পারেননি, তারাও রেডিয়োতে ভাষণ শোনার অপেক্ষায় ছিলেন। বেলা আড়াইটা পর্যন্ত রেডিয়োতে ঘোষণা আসছিল যে ভাষণ প্রচার করা হবে। কিন্তু যখন ভাষণ শুরু হলো, তখন দেশের মানুষ হতবাক হয়ে গেল। রেডিয়ো ডেড সাইলেন্ট। কোনো সাড়াশব্দ নেই। এতে মফস্‌সল অঞ্চলের মানুষের মধ্যে দুশ্চিন্তা বেড়ে গিয়েছিল। তাদের চিন্তা ছিল, কী হলো? রেডিয়ো বন্ধ কেন? তাহলে কি জনসভা হচ্ছে না? বঙ্গবন্ধুর ওপর কি আক্রমণ হলো? মোট কথা, সারা দেশে একটা অস্থির অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। নানা রকম গুজবের ডালপালা ছড়িয়ে যাচ্ছিল। পাকিস্তান টেলিভিশন এই সমাবেশ রেকর্ড করেনি কারিগরি ব্যবস্থা না থাকায়। টেলিভিশন এ সংক্রান্ত কোনো কিছু সম্প্রচারও করেনি। ভিডিয়ো করেছিল পাকিস্তান সরকারের ডিএফপি ও ঢাকার একটি রেকর্ড কোম্পানি। বেতার রেকর্ডিং করেছে; কিন্তু সরাসরি সম্প্রচার করতে পারেনি। এদিকে যখন বঙ্গবন্ধু শুনলেন তাঁর ভাষণ রেডিয়োতে প্রচার হচ্ছে না, তখন তিনি ঘোষণা দিলেন, যদি বেতার ও টিভিতে এই ভাষণ এবং আমাদের খবর প্রচার না করে, তাহলে আপনারা বেতার ও টিভিতে যাবেন না। তিনি কিন্তু এ কথা জনসভায় ভাষণের মধ্যেই বললেন। আমরা দেখলাম এরপর বেতার-টিভি থেকে কর্মচারীরা বেরিয়ে গেলেন। তারা অনুষ্ঠান সম্প্রচার বন্ধ করে দিলেন। এতে পাকিস্তানি শাসকদের মধ্যে এক ধরনের আতঙ্ক তৈরি হয়েছিল। তারা চেষ্টা করতে থাকে কীভাবে আবার রেডিয়ো চালু করা যায়। শেষ পর্যন্ত সমঝোতা হলো। পরের দিন (৮ মার্চ ১৯৭১) সকালে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ সম্প্রচার করা হলো। রেডিয়ো কর্মচারীরা এর মাধ্যমে কাজে ফিরলেন। এটা আমাদের জন্য বিশাল অর্জন ছিল। কারণ আমি মনে করি, ওই বিদ্রোহটাই বাংলাদেশের জন্য বড়ো ঘটনা ছিল।

ঢাকা বেতারের এই পরিবর্তন সাধারণ মানুষের মনে এক ধরনের আশার আলো দেখায়। বাংলাদেশ স্বাধীন হতে যাচ্ছে–এমন ধারণা আরও জোরালো হয়। রেডিয়ো পাকিস্তান ঢাকা বেতার থেকে রেডিয়ো পাকিস্তান নামটা মুছে গেল। চার মার্চ থেকে নতুন নাম হলো 'ঢাকা বেতার কেন্দ্র'। চট্টগ্রাম বেতারও তাই করল। অন্যান্য আঞ্চলিক বেতারগুলোও যার যার নামে চলে গেল। পাকিস্তান নামটা থাকল না। শুধু রাত ৮টার খবর, পাকিস্তান থেকে সম্প্রচার করা হতো, সেটিই কেবল প্রচার হতো। ৪ মার্চের পরে সেটিও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পাকিস্তানি শাসকরা রেডিয়োর ওপর আর নিয়ন্ত্রণ নিতে পারল না। ইতোমধ্যে ৩ মার্চের পর থেকে সারা দেশে অসহযোগ আন্দোলন চলছিল।

সংবাদপত্রগুলো কিন্তু আগেই অসহযোগ আন্দোলনের পক্ষে নেমে গেছে। সাংবাদিক ইউনিয়ন থেকে আনুষ্ঠানিক ঘোষণাও দেওয়া হয়েছে। তবে ৭ মার্চের ভাষণের পর ৮ মার্চ ঢাকা থেকে যে পত্রিকাগুলো বের হলো, তাতে আমরা দেখি–অনেক পত্রিকাই বঙ্গবন্ধুর ভাষণ ঠিকঠাক বুঝতে পারেনি। 'সংবাদ' শিরোনাম করেছিল, '*এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম*'। যেটা খুবই যথাযথ ছিল। আবার 'আজাদ'ও ভালো ট্রিটমেন্ট দিয়েছিল। কিন্তু 'ইত্তেফাক' হেডিংটা করেছিল এমন, '*পরিষদে যাইবার পারি যদি...*'। 'পিপল' পত্রিকাটি তখন নতুন এসেছে। শেরাটন হোটেলের উলটোদিকে ছিল পিপল পত্রিকার অফিস। পিপলের সম্পাদক ছিলেন আবিদুর রহমান। তিনি বঙ্গবন্ধুর খুব কাছের লোক ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তার ভালো সম্পর্ক ছিল। 'পিপল' পত্রিকাটি জনগণের মুখপত্র হয়ে উঠল। ইংরেজি দৈনিক 'দ্য পাকিস্তান অবজারভার' হামিদুল হকের পত্রিকা। স্বভাবতই এটি পাকিস্তানপন্থি সংবাদপত্র। 'মর্নিং নিউজ' ছিল পাকিস্তান সরকারি ট্রাস্টের পত্রিকা। সেখানে পিপল এসেই প্রো-পিপল অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের পক্ষে সংবাদ প্রকাশ শুরু করে। এ রকম একটি পত্রিকা বের করার জন্যই বঙ্গবন্ধু আবিদুর রহমানকে বলেছিলেন। মূলত বঙ্গবন্ধুর প্রেরণাতেই আবিদুর রহমান 'দ্য পিপল' বের করেন। যেহেতু বিদেশিদের কাছে চলমান আন্দোলন-সংগ্রামের প্রকৃত খবর পৌঁছানো দরকার, সেজন্য পিপল পত্রিকা ওই সময় বাংলার যৌক্তিক স্বাধিকার আন্দোলন নিয়ে প্রচুর আর্টিক্যাল ছেপেছিল। নিবন্ধগুলো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, শেখ মুজিবের ৬ দফা প্রভৃতি বিষয় ছিল। রেহমান সোবহানের লেখাও পিপল ছাপত। এ সময় আবিদুর রহমানের 'সাপ্তাহিক গণবাংলা' আরেকটি পত্রিকা ছিল। যেটি পিপল ভবন থেকে বের হতো। ওই কাগজটিতে কবি নির্মলেন্দু গুণ কাজ করতেন। ওই কাগজটি বাঙালির স্বাধিকার ও স্বাধীনতার বিষয়ে অনেক লেখা ছেপেছিল। পত্রিকাটি বিশেষ ক্রোড়পত্রও বের করেছিল। ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধুর মুক্তি পাওয়া উপলক্ষ্যে আবিদুর রহমান দুটি গান লিখেছিলেন। তার একটি গান পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত শিল্পী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া 'বঙ্গবন্ধু তুমি ফিরে এলে, তোমার স্বাধীন সোনার বাংলায়'। গানটি সুরকার ছিলেন সুধীন দাশগুপ্ত। অপরদিকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুর করা একটি গানও আছে 'বাংলার দুর্জয় জনতা'। গানটি আবিদুর রহমান নিজের অর্থেই রেকর্ড করিয়েছিলেন। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চে রাতেই পিপল অফিস পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেদিন সংবাদপত্রটির কয়েকজন স্টাফ মারা যান। এরপর সংবাদপত্রটির সাংবাদিক ও সম্পাদক কলকাতায় গিয়ে প্রাণ রক্ষা করেছিলেন। এদিকে ক্র্যাকডাউনের কয়েকদিন পর 'সংবাদ' অফিস পুড়িয়ে দেওয়া হলে আগুনে সাংবাদিক শহীদ সাবের শহিদ হন।

৭ মার্চের ভাষণ সংবাদপত্রের স্টাফ রিপোর্টাররা নিজেদের ভাষায় প্রকাশ করেছে। পুরো ভাষণটি কেউ ছাপেনি। কারণ তখন এত সুবিধা ছিল না। পরদিন পত্রিকায় আলাদাভাবে অনেকগুলো আইটেম হয়েছিল ভাষণ নিয়ে। বর্তমানকালে যে কোনো ভাষণ পত্রিকায় যেভাবে পুরোটা ছাপা যায়, তখন সেটি সম্ভব হয়নি। সেদিনের পত্রিকায় 'তিনি বলেন, আরও বলেন' এভাবে রিপোর্ট ছাপা হয়েছিল। পুরো ভাষণটি ছিল ১৯ মিনিটের বেশি। রেডিয়ো পুরো ভাষণটি রেকর্ড করেছিল, যেটি এডিট হয়নি। কিন্তু গ্রামোফোন রেকর্ড কোম্পানি সম্পাদনা করে। যার টাইমিং ছিল ১৪ মিনিটের কাছাকাছি। বাকি অংশ তারা ফেলে দিয়েছিল। যেমন ওখানে আছে, আমাদের সংগ্রাম, মুক্তির সংগ্রাম। এই কথাটি মূল ভাষণে দুইবার আছে। বক্তৃতার মাঝখানে একবার আর শেষের দিকে একবার।

বর্তমানকালে যে কোনো ভাষণ পত্রিকায় যেভাবে পুরোটা ছাপা যায়, তখন সেটি সম্ভব হয়নি। সেদিনের পত্রিকায় 'তিনি বলেন, আরও বলেন' এভাবে রিপোর্ট ছাপা হয়েছিল। পুরো ভাষণটি ছিল ১৯ মিনিটের বেশি

৭ মার্চের পর পত্রিকার চেহারা তো এমনিতেই অনেক পরিবর্তিত হলো। সংবাদপত্র তখন নিজেরাই আন্দোলনকে অনেকটা এগিয়ে নিয়ে গেল। ন্যাশনাল ট্রাস্টের পত্রিকা 'দৈনিক পাকিস্তান'-এর ভূমিকাটা খুব প্রগতিশীল ছিল। তারা পাকিস্তানি সামরিক জান্তাদের নিউজ ছাপার পাশাপাশি বাঙালিদের নিউজও ছেপেছে। সে তুলনায় 'মর্নিং নিউজ', 'দ্য পাকিস্তান অবজারভার' এদের অবস্থা খুব খারাপ ছিল। আর পূর্বদেশে যেহেতু বেশকিছু প্রগতিশীল সংবাদকর্মী ছিল, তাই তাদের কলামে, সম্পাদকীয়তে অন্তত বাংলাদেশের স্বাধিকার, স্বাধীনতা নিয়ে লেখা হতো।

লেখক: মহাপরিচালক, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) ও একুশে পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক